কাঞ্চনপুরের ছেলে

নবেন্দু ঘোষ

মডার্ণ পাবলিশার্স
৬, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

নারায়ণ, প্রসাদ, কানু, সুবল, পার্থপ্রতিম ও
জয়প্রকাশকে-

ভূমিকা

ছোটদের জন্য লেখার ইচ্ছে বরাবরই ছিল কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। ছেলেরা নাকি ভূত প্রেত দৈত্য দানব, ডাকাত ও ডিটেক্‌টিভের রোমাঞ্চকর কাহিনী ভালবাসে এমনি একটা বিশ্বাসই সাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল দেখেছি। আমি তা বিশ্বাস করিনা। আমার মনে হয় যে বাস্তব জীবনও কম রোমাঞ্চকর নয় এবং চিত্তাকর্ষক করে ছোটদের জন্য বোধগম্য করে সব কিছু নিয়েই লেখা যায়। অবাস্তব, রোমাঞ্চকর ও বিভীষিকাময় কাহিনী যে তরুণ মনকে কতদূর বিকৃত করে তা কারো অবিদিত নয়। এই সব কথা স্মরণ করেই ছোটদের জন্য কিছু লিখব স্থির করেছিলাম অনেকদিন আগে। বন্ধুবর শান্তি রায়ের অনুরোধে ও সহায়তায় এই গ্রন্থ-রচনা সম্ভব হয়েছে। আমি কেমন লিখেছি তা বলতে পারব না—যাদের জন্য লিখেছি তারাই তা বলতে পারবে। 'কাঞ্চনপুরের ছেলে'—বীরুর জীবনকাহিনীর একটা খণ্ড মাত্র। বীরু বড় হবে, বীরুর জীবনে নানা ঝড়ঝাপ্‌টা আসবে, প্রতিকূল সমস্ত অবস্থার বিরুদ্ধে সে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে। সে কাহিনী অন্যগ্রন্থে প্রকাশিত হবে কোনোদিন। আগে বীরু বড় হোক।

কাঞ্চনপুরের ছেলে

—এক—

চোরের মত পা টিপে টিপে বাড়ী ঢুকল বীরু। আশঙ্কায় ওর বুকটা টিপ টিপ করছে, নিঃশ্বাস থেমে যাচ্ছে, ভয়ার্ত্ত খরগোশের মত দুটো চোখের তারা এদিক ওদিক সন্ধানী দৃষ্টি ফেলছে। বাবার ভয়। বাবার সামনে মুখোমুখী দাঁড়াবার ইচ্ছে ওর নেই—তার ফলটা নেহাৎই অপ্রীতিকর ও অশুভ হবে। কারণ আর কিছুই নয়— সে খুব দেরী করে বাড়ী ফিরেছে বলেই এই ভয়। কথা ছিল তাড়াতাড়ি ফিরে বাবার কাছে আজ পড়া দিতে হবে। বাবাকে নাকি অঙ্কের মাষ্টার ধনঞ্জয়বাবু বলেছেন যে, সে আজকাল পড়া-শোনায় ভারী ফাঁকি দিচ্ছে। সকাল বেলায় বাবা যখন একথা বলছিলেন তখন তাঁর চোখে আগুনের শিখাকে সে জ্বলতে দেখেছিল। ভুল নয়, চোখের বিভ্রম নয়, বাবার রাগ শুধু তাঁর চোখেই নয়, তাঁর কণ্ঠস্বরেও প্রকাশ পেয়েছিল।

কিন্তু কি যেন হয়, কেমন করে যেন দেরী হয়ে যায়, ইচ্ছে করলেও নিয়মের সোজাপথ দিয়ে বীরু চলতে পারে না। খেলার মাঠ থেকে অনেক আগেই সে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল কিন্তু কয়েক পা এগোতেই কি রকম যেন মনটা দুর্ব্বল হয়ে এসেছিল, ডানদিকে ফিরে তাকিয়েছিল। তখন সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল। শীতশেষের

সন্ধ্যা, বরেন্দ্রভূমির অসমতল প্রান্তরের ওপর হাল্‌কা কুয়াসার পাৎলা পর্দ্দা ছড়িয়ে পড়ছিল, মহানন্দার ওপারের বনজঙ্গলের আড়ালে লাল সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল। গাছপালার প্রাচীরান্তরালে একটা রক্তাক্ত আভা —মনে হচ্ছিল যেন জঙ্গলে আগুন লেগেছে। আকাশে হাল্‌কা মেঘ, সোনালী, বেগুনী আর লাল রংয়ের। শীত শেষ হয়ে এল, মহানন্দার জলে টান ধরেছে, স্থির বাতাসে তার ঢেউগুলো তখন শান্ত, বিনীত। তার ওপর আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ ও রঙীন আলো। ওপারে যেখানে তীরটা একটু খাড়া হয়ে উঠেছে সেখানে জলের ধারে একদল বক তখনো বসে ছিল। যোগীর মত একাগ্র ওদের দৃষ্টি, তন্ময় ওদের মন।

কি যেন হয়েছিল। অদ্ভুত একটা আনন্দে বীরুর মনটা ভরে উঠেছিল। কে যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। অজ্ঞাত কিছু একটা সামনের প্রান্তরের ওপারে, মহানন্দার পরপারে, ওপারের মসীকৃষ্ণ জঙ্গলের নিষ্কম্প প্রাচীরেরও অনেক দূরে, দূর দিগন্তেরও পেছনে, কোথায় যেন একটা বিচিত্র, রোমাঞ্চকর দেশ আছে। সেই দেশে তার মত যারা আছে তারা যেন তাকে ডাকছিল। বাতাসের শিরা বেয়ে বেতারের মত ভেসে এসেছিল সেই ডাক 'বীরু, বীরু, বীরু'। সেই অপরূপ, অনাবিষ্কৃত দেশের সঙ্গে যেন এই মাঠ, মহানন্দা, ওই বন আর আকাশের সঙ্গে একটা যোগাযোগ আছে। একেবারে রূপকথা নয় সে দেশটা, পৃথিবীর বাইরে নয়।

কি যেন হয়েছিল। সম্মোহিতের মত মহানন্দার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বীরু। তার বারো বছরের জীবনে এমন বিস্ময় বোধ কমই হয়েছে। চুপচাপ সে বসে পড়েছিল। তখন তাকে দেখলে তার স্কুলের ধনঞ্জয়বাবু বা আর কোনো মাষ্টার চিনতেই পারতেন না,

তাঁরা তখন নিশ্চয়ই ভাবতেন যে ক্যাত্যায়নী হাইস্কুলের ক্লাস সেভেনের দুষ্ট ছাত্র ও দস্যি ছেলে বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই মুগ্ধ ও নির্ব্বাক ছেলেটির একটুও মিল নেই। অবাক হয়ে তাঁরা নিশ্চয়ই মনে মনে প্রশ্ন করতেন যে দূর দিগন্তে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে যে ছেলেটি এখন স্তব্ধ হয়ে বসে, সেই কি গরীব পুরুত ও মহামায়া পাঠশালার পণ্ডিত অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুরন্ত ছেলে বীরু? জোর করে বলতে পারি যে তখন তাঁদের ভুলই হত। তখন বীরুকে দেখলে চেনাই যেত না যে সে স্কুল থেকে পালায়, খেলার মাঠে মারামারি করে, পরের বাগানের ফুলফল চুরী করে, সারা গাঁয়ে ঝড়ের মত উদ্দামগতিতে ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

কি যেন হয়েছিল। তখন বীরুর ডাগর ডাগর চোখের তারায় নিঃসীম আকাশের একটুকরো এসে আশ্রয় নিয়েছে, তার ওপর জলের পরদার মত কাঁপছে একটা স্বপ্নের ছায়া, তার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখখানা তখন অস্তগামী সূর্য্যের আলোয় কমলানেবুর মত টকটকে হয়ে উঠেছে আর কোঁকড়ানো চুলের একটা গোছা এসে চকচকে কপালের ওপর এলিয়ে পড়ছে। সামনে মহানন্দার জলরাশি এসে বালুতটের ওপর আছড়ে পড়ছে, কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ একটা শব্দ উঠছে, ক্ষুরধার বেগে নদী বয়ে যাচ্ছে কত দূরে—দূরে—দূরে। ঘাটের ঘাটে তখন লোকজন বেশী নেই, নৌকোগুলো বাঁধা রয়েছে, দুলছে। বাঁধা রয়েছে মহাজনী নৌকোগুলো, তার ওপরে পশ্চিমা মাঝিরা বসে তামাক টানছে। পেছনকার মাঠে যে গরুগুলি একটু আগেও চরে বেড়াচ্ছিল সেগুলো তখন আর ছিল না। অতি দ্রুত একটা অখণ্ড নিঃশব্দতা, একটা অপরূপ মৌন শান্তি নেমে আসছিল চারদিকে আর পূর্ব্বদিকের নদীর ভেতর থেকে পূর্ণিমার গোল চাঁদটা একটা

সোনার থালার মত উঠে আসছিল। ক্রমে ওপারের জঙ্গলের আগুনটা ফিকে হয়ে এসেছিল, শেষে একসময়ে নিবে গিয়েছিল তা, সূর্য্য একেবারে অদৃশ্য হয়েছিল, সন্ধ্যা হয়েছিল। তবু বসে ছিল বীরু। তার অশান্ত, দুরন্ত প্রকৃতিটা হঠাৎ যেন কিসের ছোঁয়াচে মূক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ কি একটা আবেগ বোধ করছিল সে, পাহাড়ের মত মাথা তুলে দাঁড়াতে ইচ্ছে হয়েছিল, একজন প্রতাপশালী সম্রাটের মত মনে হয়েছিল নিজেকে। অনেকক্ষণ ধরে আচ্ছন্নের মত বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার খেয়াল হয়েছিল যে বাড়ী বলে একটা জায়গায় তাকে ফিরতেই হবে যেখানে তার বাবা বসে আছেন তার পড়া নেবার জন্য। বাবার কথা মনে পড়তেই সে প্রায় এক দৌড়ে বাড়ীতে ফিরে এসেছিল।

যাক্ সে বাড়ী ফিরেছে কিন্তু এখন? কি করা যায়?

রান্নাঘরে মায়ের হাতে খুন্তী নড়ছে, একটা শব্দ হচ্ছে। বাইরে ঝি-ঝি পোকার ডাক, লাউ মাচায় গিরগিটির খস্‌খস্ আওয়াজ। আর জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে সব, লুকিয়ে লুকিয়ে ভেতরের ঘরে যাবার উপায় নেই।

মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ানোই ভাল। মাকে সহায় পেলে বিপদটা একটু কেটে যাবে, মা ভারী লক্ষ্মী মেয়ে।

রান্নাঘর।

"কে রে?" পেছনে মৃদু পায়ের শব্দ শুনে সুমতি চমকে উঠলেন।

"বাঃ—আমি।"

"তুমি!"

"হ্যাঁ"

কিন্তু সুমতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন, গলার সুরটা একটু তাতিয়ে

তিনি বললেন, "কোথায় থাকিস্ বল্‌তো—তোর কি কোনো কিছুতেই চৈতন্য হবে না বীরু? কখন সন্ধ্যে হয়েছে আর কখন তুই বাড়ী ফিরছিস্ বল্‌তো—তোকে নিযে যে কি করা যায় তা তো আর ভেবে পাইনা।"

বীরুর মুখে চোখে রাগ, অভিমান আর কাকুতি একসঙ্গে ফুটে উঠল, "মা"—

"কি?"

"আস্তে কথা বলো"

"কেন? আস্তে কথা বলব কেন রে?"

শেষ পর্য্যন্ত সেই বিপর্য্যয়ই ঘটল। বাবার ডাক শোনা গেল।

"বীরু"—

অসহায় দৃষ্টি মেলে একবার মায়ের দিকে তাকাল বীরু। মর্ম্মভেদী সেই দৃষ্টি, মাকে যেন ভস্মীভূত করার চেষ্টা করল সে। তার দুচোখে রাগ আর অভিমানের একটা মিশ্রন ঘটে মেঘের সৃষ্টি করল, সেই মেঘ গলে ক্রমে জলের আকার ধারণ করল। কিন্তু গড়াতে পারল না তা, নিজেকে দমন করল বীরু। মা রাক্ষুসীর কাছে কেঁদে ফেললে আরো বিশ্রী ব্যাপার হবে। অনুকম্পা সে সহ্য করতে পারে না, ছিচকাদুনে আখ্যাটাকে সে ঘৃণা করে। তার চোখের জল আবার বাষ্প হয়ে উড়ে গেল এইজন্য যে বাবার গম্ভীর ডাকটা আবার ভেসে এল।

"বীরু"—বাবার গলাটা এবার আরো ভারী আরো থম্‌থমে। ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটবে এবার। আর উপায় নেই।

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি মেলে সুমতি তাকালেন তার দিকে, বললেন তিরস্কার

করে, "কেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন? দস্যিগিরি করার সময় তোমার খেয়াল থাকে না যে বাড়ীতে বাবা আছেন? এখন তাঁর ডাক শুনে আমার আঁচলের নীচে এসে দাঁড়ালে কি হবে? আমি তোমায় একটুও বাঁচাব না—যাও"—

ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত ছিট্‌কে দরজার কাছে সরে গেল বীরু, বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মত গলা কাঁপিয়ে বলল, "তোমার আঁচলের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়েছি আমি!"

"হ্যাঁ"—

"আমার বয়ে গেছে—কেন, আমি কি কাউকে ভয় পাই?"

"পাস্ কি না পাস্ তা তুই জানিস। ভয়ই যদি না পাস্ তবে তোর বাবার কাছে যাচ্ছিস্ না কেন?

"যাচ্ছি তো।"

"যা।"

"যাচ্ছি—আমি কি বাবাকে ভয় করি নাকি?"

"আমায় বলে কি হবে তা—ওঁকেই বলগে।"

"বলবই তো—দেখো"

"আমাকে জ্বালাস না তো বীরু—যা"—

"তুমি কি জানো মা?"

"না।"

"তুমি একটা ইয়ে"—

"মানে?"

"তুমি একটা রাক্কুসী"—

"বীরু"—

দরজার নীচে একলাফে সরে দাঁড়াল বীরু তারপরে মায়ের দিকে

তাকিয়ে দুপাটি দাঁত বের করে ভেংচাল তারপর ছুটে বড় ঘরটার দিকে চলে গেল।

সুমতি হাসলেন নিজের মনে। বীরুটার বয়সই হয়েছে শুধু, আসলে ও সেই ছ'বছরের ছেলেটিই রয়ে গেছে। রাগলে, অভিমান করলে ঠিক অমনিভাবেই ভেংচি কাটত বীরু। মাগোমা, এমন পাগল ছেলে নিয়ে কি করবেন তিনি? বেঁচে থাক, অক্ষয় বটের মতো ওর পরমায়ু হোক, হে মা মঙ্গলচণ্ডী, আমার বীরুকে তুমি রাজরাজেশ্বর করো, দিগ্বিজয়ী মহাবীর করো, তার মঙ্গল করো।

মালতী ছোট ঘরে বসে লক্ষ্মীপুজোর উপকরণ সাজাচ্ছিল। আজ বৃহস্পতিবার, তায় পূর্ণিমা, লক্ষ্মীপুজোর চমৎকার দিন। নৈবেদ্য সাজাতে সাজাতে সে শুনতে পেল ভাইয়ের পদশব্দ। তার কৌতূহল হলো, তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে ফেলে সে পাশের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে একটু অন্ধকারে দাঁড়াল। বাবা যখন কাউকে শাসন করেন তখন অন্য কারো উপস্থিতি তিনি পছন্দ করেন না।

ঘরের মধ্যে কেরোসিনের ডিবাটা জ্বলছে; শিখাটা মোটা, তা থেকে তীব্র গন্ধযুক্ত ধোঁয়া বেরুচ্ছে। লাল কেরোসিন। গরীবের সংসার সেই ম্লান আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেছে। মাটির দেয়াল, বাঁশ আর তালগাছের ছাদের ওপর খড়ের ছাউনি। হাঁড়ি আর জালা, তাতে ধান চাল সঞ্চিত রয়েছে। দে'য়ালে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি, দক্ষিণা কালীর পট, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ আর গান্ধীজীর ছবি, একটা ছবিওয়ালা পুরোনো ক্যালেণ্ডার। একটা কাঠের বাক্সের ওপর অনেকগুলি পুঁথি আর কয়েকটা পুরোনো পঞ্জিকা। একপাশে একটা তক্তাপোষ তাতে শাড়ীর পাড় দিয়ে হাতে তৈরী কাঁথা বিছানো। দারিদ্র্য আছে কিন্তু

পরিচ্ছন্নতা আর রুচি; শুচিতা আর সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় চারদিকে ছড়ানো আছে।

সেই ঘরে, দরজার কাছে বীরু এসে দাঁড়িয়েছে আর মেঝের ওপর একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসে আছেন অনন্ত, তাকিয়ে আছেন ছেলের দিকে। বীরুর দৃষ্টি নীচের দিকে। ঠিক এমনি মুহূর্ত্তে মালতী এসে দাঁড়াল অন্তরালে।

বীরু অস্বস্তি বোধ করছে, বেশ বোঝা গেল। বাবার কাছে দাঁড়াবার পরও কোনো কথা বলছেন না তিনি। চুপ করে তাকিয়ে ছেলেকে পর্য্যবেক্ষণ করছেন। রাশভারী লোক, অযথা কথা বলেন না তিনি। কিন্তু বীরুর কাছে তা একটা দুর্লক্ষণ বলেই মনে হল। গতিক সুবিধের নয়, বকুনীর চেয়েও খারাপ এই চুপ করে তাকিয়ে থাকাটা বিশ্রী। একটু নড়ে উঠল সে।

"বীরু"—এতক্ষণে অনন্ত কথা বললেন।

"উঁ?"

"আজ সকালে কি বলেছিলাম তা মনে ছিল?"

"হুঁ"—

"তাহলে আজ ফিরতে দেরী হল কেন?"

বীরু চুপ।

"চুপ করে আছিস্ যে? কখন সন্ধ্যে হয়েছে তা মনে পড়ে?"

বীরু সাহস সঞ্চয় করে বলল, "এইতো—এই—একটু আগে—"

"একটু আগে!" অনন্ত ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, "তোমার সময় জ্ঞানটা খুব টনটনে দেখছি। যাক—ও কথা থাক, জবাব দে, দেরী হল কেন?"

বাবার কণ্ঠস্বরে যে কাঠিন্য ধ্বনিত হল তা বীরু অনুভব করল। না বাবা, জারিজুরি চলবেনা।

আম্‌তা আম্‌তা করে সে বলল, "নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম।"

"তাতে এত দেরী হয় ?"

"কি রকম যেন ভালো লাগল তাই চুপ করে বসেছিলাম।"

"সঙ্গে কে ছিল ?"

"কেউ না।"

"মিথ্যে কথা বলছিস্।"

"বাঃ—তাহলে সত্যি কথা কি হবে ?" বীরু একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল, মিথ্যাবাদী এই দুর্নামটা তার খুব ভালো লাগে না।

"বটে ! চুপচাপ বসেছিলি নদীর ধারে ! তাহলে তুই তো একজন কবি মানুষ এ্যাঁ ?" অনন্তের মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল, তার আড়ালে একটু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ।

বাইরে মালতী হাসল। বাবার কথা শুনে তার হাসি পেল। চৈত্র মাসে, কালীতলায় গম্ভীরা গানের যে আসর বসে তার কথা মনে পড়ল মালতীর। বাবার কথাতে হঠাৎ সে কল্পনা করল যে সেই গানের আসরে বেলফুলের মালা গলায় তার ভাই বীরু যেন গান গাইছে—নিজের রচনা। ভাবতে বেশ মজা লাগে, হাসি পায়।

বাবার ঠোঁটের কোনে যে হাসি রেখায়িত হয়ে উঠেছিল তার দিকে আড়নয়নে, সন্দিগ্ধভাবে তাকাল বীরু। উহুঁ, বাবাকে সে চেনে।

ঠিক তাই।

অনন্ত বললেন, "সব তো শুনলাম, তুই যে সত্যি কথাই বলছিস্ তাও না হয় বিশ্বাস করলাম, কিন্তু তবু তোকে ক্ষমা করা যায় না, বুঝলি ?"

চুপ করে রইল বীরু, কেনো জবাব দেওয়াই এখন উচিত নয়।

"বীরু"—অনন্ত মেরুদণ্ড সোজা করে বসলেন।

"উঁ ?"

"তুই যে গরীবের ছেলে তা জানিস্ ?"

মাথা নাড়ল বীরু। বাবার প্রশ্নের ভঙ্গীতে এটাই বোধ হয় তার করা উচিত এমনি অনুভূতি জন্মাল তার মনে। গরীব কিসে হয় মানুষ সে সম্বন্ধে আব্ছা আব্ছা ধারণা তার আছে, কিন্তু সেটা নেহাৎই অস্পষ্ট। তবে এটুকু বোঝে সে যে গরীব হলে ভালো খাওয়াপরাটা জোটে না, ঘরে বেশী ধান চাল থাকে না, ইচ্ছেমত শশী ময়রার দোকান থেকে ক্ষীরমোহন আর রসকদম্ব খাওয়া যায় না।

"আমরা যে কত গরীব তা কি জানিস বীরু ?" বাবার প্রশ্ন আবার শুনতে পেল বীরু। সে তাকাল।

অনন্ত বললেন, "দারিদ্র্য দূর করতে গেলে যা করতে যাবি তুই তাতেই শিক্ষার দরকার হবে—কিন্তু তুই কি করছিস বল্তো ? বামুনের ঘরের কলঙ্ক তুই, একটা গোমুখ্যু।"

বাইরে মালতী মুখে আঁচল চাপা দিল। আহা, মাগো, বেচারা বীরুর মুখ চোখ কেমন কালো হয়ে গেছে! কি রকম মায়া লাগে দেখলে!

"কোনো কথাই শুনিস্ না তুই"—অনন্তের গলায় উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে, চোখ রক্তিম হয়ে উঠেছে, "দিনরাত টোটো করে হন্যের মতো ঘুরে বেড়াস্, তোর দস্যিপনায় সারা গাঁ অস্থির, অনবরত এর ওর কাছে তোর বদ্নাম শুনতে পাই আমি—তোকে নিয়ে কি করা যায় বল্তো ?"

এ প্রশ্নের জবাব বীরু কি করে দেবে ?

"তোকে শাস্তি পেতে হবে"—দণ্ডধারী বিচারকের মতই বাবার চেহারাটা নির্ম্মম হয়ে উঠল, "নে, নাকে খৎ দে"—

বীরু ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, যেন কথাটা তার কানেই যায়নি।

"আমার কথা শুনতে পেলি ?"

"কি কথা বাবা ?" মৃদুকণ্ঠে পালটা প্রশ্ন করল বীরু।

"নাকে খৎ দে"—

কি অপমান জনক প্রস্তাব ! উঃ ! "নাকে খৎ দেব !"

"হ্যাঁ"

হাঁটু গেড়ে বসল বীরু, দুই করতলের ওপর ভর দিয়ে, উবু হয়ে মেঝের গোবর নিকানো শক্ত মাটির ওপর নাকটা ছোঁয়াল সে। লজ্জায়, অপমানে, দুঃখে তার দু'চোখ জ্বালা করছে, শরীরটা কাঁপছে।

বাইরে মালতী তখন আঁচলটা কষে চেপে ধরেছে মুখের ওপর। ষোল বছর বয়স তার তবু ছেলেমানুষী যায়নি, ভাইকে দেখে মায়া হচ্ছে তবু হাসি পাচ্ছে তার। মাঝে মাঝে মালতীর এমনি কাণ্ড দেখে বীরু ক্ষেপে যায়।

অনন্ত ছেলের দিকে তাকালেন, "ওকি হোল ? ভালো করে নাকে খৎ দে"—

"দিলাম তো"—বিদ্রোহ ধূমায়িত হয়েছে বীরুর গলায়।

অনন্ত মাথা নাড়লেন, অটল তার গাম্ভীর্য, "উহু, হোল না, তিনহাত মেপে মেপে খৎ দিবি"—

গোঁজ হয়ে বসে রইল বীরু।

"দে নাকে খৎ—তিন হাত মেপে"—

মাকে রাক্ষুসী বলা যায়, ভেংচানো যায় কিন্তু বাবা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। বিশেষ করে অনন্তের মত পাঠশালার পণ্ডিত বাবা। মনের মধ্যে একটা বিদ্রোহ চাড়া দিয়ে উঠছে বটে তবু তাকে প্রকাশ করার মত দুঃসাহস সে কল্পনাও করতে পারে না।

অতএব ? এ নির্য্যাতন তাকে সহ্য করতেই হবে, এ শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে।

হাত দুয়েক নাকে খৎ দিয়েই থেমে গেল বীরু। নাকের ডগাটা তার জ্বালা করছে, তাতে মেঝের মাটির একটু ছাপ পড়েছে, যেন তিলক কেটেছে সে। আর নাকের দু'পাশে যে চোখ দুটো তাতে যেন জল আর আগুন একসঙ্গে দেখা দিয়েছে।

"থামলি যে—তিন'হাত হল কৈ ?" অনন্ত সাংঘাতিক লোক, ছেলের ওপর যেন একটুও মায়া নেই তাঁর।

"হয়েছে তো"—গলাটা কেঁপে উঠল বীরুর।

"হয়নি, আরো একহাত বাকী।"

"নাকে লাগছে।"

"লাগুক, তা নইলে শিক্ষা হবে না তোর।"

তিনহাত নাকে খৎ দেওয়া হোল। কিন্তু এতো সবে শুরু। এখনো পড়া দেওয়ার পর্ব্বটা একেবারে আস্ত পড়ে আছে।

কিন্তু শাস্তির পালা যে তখনো শেষ হয়নি তাকি আর বীরু জানত ?

অনন্ত প্রশ্ন করলেন, "নাকে লাগছে ?"

"হুঁ"—

"তাহলে আর কখনো দেরী করে বাড়ী ফিরবি না তো ?"

"না।"

"বেশ তাহলে এবার দু'হাতে দু'কান ধর, জিভ বার কর তারপরে একপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়া।"

প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম করল বীরু, "বাঃ, নাকে খৎ তো দিলামই—"

"তুই যা অপরাধ করেছিস তাতে ওটা যথেষ্ট নয়—নে—যা বললাম তাই কর—"

বাবার চোখের দিকে তাকাল বীরু। না, এই অপমানজনক আদেশকেও পালন না করে উপায় নেই, বাবার চাউনি ভালো নয়, ভাবটা সন্দেহজনক।

শেষ পর্য্যন্ত তাই করতে হল। একপায়ে ভর দিয়ে, দু'হাতে দু'কান ধরে, জিভ বার করে দাঁড়াল বীরু আর লজ্জায় অপমানে চোখ বুজে রইল। শান্ত গাম্ভীর্য্য নিয়ে যে বাবা দূরে দূরেই থাকেন, শাস্ত্রগ্রন্থ পড়েন, যজমান বাড়ীতে পৌরহিত্য করেন, তাঁর কাছে এ ধরণের ব্যবহারটা মোটেই আশা করেনি বীরু।

বাইরে মালতী আর পারল না, মুখ চেপে ধরেও হাসিকে সে চাপতে পারল না, আঁচলের এক ফাঁক দিয়ে তার কয়েকটুকরো ছিটকে এল বাইরে। মা গো মা, বীরুকে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে!

বীরু চোখ বুজেও বুঝতে পারল ব্যাপারটা। দিদি হতভাগী হাসছে। আরো দুঃখ, আরো অভিমান হল তার। এ পৃথিবীতে কেউ কারো নয়, সবাই তার শত্রু, তার বিপক্ষে। দিদি হাসছে!

চোখ বুজেই সে সানুনাসিক সুরে বলল, "দিদি হাসছে বাবা!"

অনন্ত বললেন, "তাতে কি হয়েছে?"

"আমায় দেখে হাসছে"—

"তাতো হাসবেই—হাসুক"—

অবশ্য মালতীর হাসি আর শোনা গেল না, সেখান থেকে সে ছুটে পালাল, কিন্তু তবু বীরু যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল। তার মনে হল যে পায়ের নীচেকার মেঝেটা যেন হঠাৎ ফেটে যাচ্ছে,

দেখা দিচ্ছে একটা অতলস্পর্শী গহ্বর আর তারি মাঝে সে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে।

পড়া দেওয়ার পর্ব্বটা একটা বিভীষিকার মধ্যেই শেষ হল। তারপরে একসময়ে রাত গভীর হল। রান্নাঘরের কাজ শেষ করে মা বড় ঘরে গেলেন, শুয়েও পড়লেন। ছোট ঘরে বিছানার ওপর বসে বসে বীরু পড়া করছিল। মালতীর তখনো ঘুম আসে নি, এপাশ ওপাশ করছে সে। বীরু তার সঙ্গে কথা বলবেনা আর। যারা যারা তাকে বিপৎকালে পরিত্যাগ করেছিল তাদের সবার বিরুদ্ধে সে অসহযোগিতা ঘোষণা করেছে।

"বীরু"—

বীরু চুপ।

"এই বীরু"—

না, কোনো জবাব দেওয়া হবে না।

"কি বই পড়ছিস্ রে ?"

হুঁ হুঁ বাবা, সে একমাত্র বীরুই জানে। কি চমৎকার রূপকথার বই সেটা, কিন্তু মালতীর ভাগ্যে সেটা আর পড়া হয়ে উঠবে না।

"কথা বলবি না ?"

বীরু পড়াতে এত মগ্ন হযে গেছে যে তার কানে কোনো কিছুই পৌছুচ্ছে না।

"আচ্ছা, দেখা যাবে তেঁতুলের আচারের জন্য আমার পেছন পেছন দৌড়োও কিনা কাল"—

বয়ে গেছে। বীরু আর তেঁতুলের আচার খাবে না। কিন্তু

বললে কি হবে তেঁতুলের আচারের নামটা কানে আসতেই জিভে জল এসে গেল বীরুর। না জিভকে শায়েস্তা করতে হবে।

মালতী কি ভেবে নিজের মনে হাসল, তারপর হাই তুলল, বিড়বিড় করে বলল, "না বললি কথা—তোর মত হতভাগার সঙ্গে কে কথা বলবে—যাঃ"—

অপমান! তবু না, বীরু চুপ করেই থাকবে।

শেষ পর্য্যন্ত মালতী ঘুমিয়েই পড়ল।

বীরু দিদির দিকে তাকাল। হঠাৎ কেমন যেন মায়া জন্মাল তার মনে। আহা দিদিটাকে কেমন বেচারী বেচারী দেখাচ্ছে, আহা, কথা বলার জন্য কি কাকুতিটাই না করছিল রাক্ষুসিটা। আচ্ছা আচ্ছা, কাল সকালেই সে দিদির সঙ্গে কথা বলবে।

রূপকথায় মন দিল বীরু। তার প্রাণের বন্ধু পলটু তাকে বইটা দিয়েছে। বইয়ের নাম 'রূপকথার গল্প'। বিচিত্র বিচিত্র কাহিনী আছে। অনেক অনেক দিন আগেকার কাহিনী। এক যে ছিল রাজপুত্র। সেই রাজপুত্র একদিন মৃগয়ায় বেরোল। ঘোর অরণ্য, দিন সেখানে রাত হয়ে গেছে, এমনি ঘুট্‌ঘুট্টি অন্ধকার সেই অন্তহীন অরণ্যে। সেখানে সাপ আর অজগর, বাঘ আর ভালুক, অশরিরী প্রেতদের নিরবিচ্ছিন্ন উৎসব চলেছে। আর সেই অরণ্যেই পথ হারিয়ে ফেলল রাজপুত্র। রাজপুত্র মলয়কুমার। ছুট্-ছুট্-ছুট্। তার ঘোড়া কেশর দুলিয়ে ছুটছে তো ছুটছেই, তবু অরণ্যের শেষ নেই, পথ নেই তার কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার। সমস্ত অরণ্যটা এবং অরণ্যচর সমস্ত জীবজন্তুরা যেন রাজপুত্র মলয়কুমারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু কাহিনী বিচিত্র। একসময়ে সেই অরণ্যের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে বেরোল রাজপুত্র। তারপরে এক অপরিচিত নির্জন

প্রান্তর দিকচিহ্নহীন। তেপান্তরের মাঠ। ধূ ধূ করছে তা, তার বিশালতার দিকে তাকিয়ে মাথার উপরকার নীল সমুদ্রের মত বিস্তীর্ণ আকাশটা কাঁপছে—সে কাঁপুনি বোঝা যাচ্ছে নক্ষত্রদের আলো দেখে। আর ভয়ে চাঁদ উদিত হয়নি। আবার ছুট্-ছুট্-ছুট্। তারপরে এক বিচিত্র রাজ্য। সেখানকার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, গাছে হীরার ফুল আর মুক্তোর ফল, ঘাসে সোনার গুঁড়ো আর তারি মাঝে সাতমহলা একটা স্ফটিকের রাজপ্রাসাদ যার চূড়োগুলো মেঘ-লোককেভেদ করে আকাশকে ছুয়েছে। সিংহদ্বার পার হয়ে ভিতরে গেল রাজপুত্র। দ্বারে দ্বারী আছে, প্রহরী আছে, কিন্তু নিস্পন্দ সবাই। রাজসভায় রাজা আছেন, তার পাত্র মিত্রেরা রয়েছে কিন্তু সবাই পাথরের মত নির্ব্বাক। এত বড় রাজ্য, এত বড় রাজপ্রাসাদ, এত লোকজন, কিন্তু প্রাণ নেই, মৃত্যুর নিঃশ্বাস পড়েছে এখানে—তাই সব থাকতেও আনন্দ নেই, ডাক নেই, সাড়া নেই, শব্দ নেই। প্রাণ, প্রাণ নেই কারো—সবাই পাথর হয়ে গেছে।

বীরুর সমস্ত শরীরটা হাল্‌কা হয়ে উঠল বই পড়তে পড়তে। বিচিত্র, বিচিত্র এই কাহিনীটা। তার ললাটের শিরাগুলো তখন দপ্‌দপ্ করছে, আগ্রহে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, দু'চোখের সামনেকার সব কিছু যেন ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। তারপর? তারপর?

তারপর অন্দরমহলে গেল রাজপুত্র মলয়কুমার। কুবেরের ভাণ্ডার লুট করে যেন নির্ম্মিত হয়েছে সেই অন্তঃপুর। বহুবর্ণের মণিমাণিক্য-যুক্ত দেয়াল থেকে ইন্দ্রধনুর মত সপ্তবর্ণের আলো বেরিয়ে আসছে। দেবরাজ ইন্দ্রের অন্তঃপুরও যেন এর কাছে হার মানে আর তারি মাঝে গজদন্তখচিত এক পালঙ্কের ওপর রয়েছে একটা বিস্ময়। ঘুমন্ত রাজকন্যা মধুমালতী, কুঁচবরণ কন্যা সে, শ্রাবনমেঘের মত নিবিড়

কালো তার সুদীর্ঘ চুলের রাশি। স্বর্ণচাপার মত গায়ের ওপর যেন জ্যোৎস্নার আবীর মাখানো, কুন্দকলির মত দুটো পাৎলা ঠোঁট আর দুটো ডাগর ডাগর নিমীলিত চোখে যেন কার স্বপ্নের ছায়া। কিন্তু অমন সুন্দর রাজকন্যারও প্রাণ নেই। মৃত্যুর নিঃশ্বাস পড়েছে এখানে। অভিশপ্ত এ রাজ্য, এ রাজপুরী, রাজপরিবার আর প্রজামণ্ডলী। এদের প্রাণ দিতে হবে। খুঁজতে খুঁজতে সোনার কাঠিটাকে পেয়ে গেল রাজপুত্র মলয়কুমার। তা ছুঁইয়ে সেই রাজকন্যাকে সে বাঁচাল। কিন্তু রাজকন্যা তাকে সাতঙ্কে বলল যে সবাইকে বাঁচিয়ে কোনো লাভ নেই, যারা রাজ্য ও প্রজাদের এমন অবস্থা করেছে সেই সব অত্যাচারী রাক্ষসদের বিনাশ না করলে এ প্রাণ পেয়েও তা রক্ষা করা যাবে না। অতএব? রাজপ্রাসাদের উত্তর কোনে যে নীলসায়র রয়েছে তার ভেতরে নেমে একটা স্তম্ভ পাবে, সেই স্তম্ভ চূর্ণ করে তার ভেতর পাবে একটা সোণার কৌটো—তাতে আছে একটা কালো ভ্রমর। রাক্ষসদের প্রাণ। সেই ভ্রমরকে পিষে মারলেই রাক্ষসেরা সবাই মারা যাবে। আর সব কিছুই করতে হবে এক নিঃশ্বাসে। সব শুনল রাজপুত্র মলয়কুমার। এতগুলো মানুষকে বিপদ থেকে মুক্ত করা ও বাঁচিয়ে তোলার ব্রত তার ওপর পড়ল—আর রাজকন্যা মধুমালতীর মায়া। ঝাঁপিয়ে পড়ল সে নীলসায়রের জলে। ঝড়ের মত মাটি আর আকাশকে কাঁপিয়ে সাতহাজার সাতশো সাতটা রাক্ষস মাটিতে আছ্‌ড়ে পড়ে মারা গেল শেষে। রূপনগরে শান্তি এল, প্রাণ এল, উৎসব আরম্ভ হল। আর যা সবাই চাইছিল তাই হলো, রাজপুত্র মলয়কুমার আর রাজকন্যা মধুমালতী যা চাইছিল তাই ঘটলো—রাজপুত্র আর রাজকন্যার বিয়ে হল। আমার কথাটি ফুরোলো—

কিন্তু কোথায় ফুরোলো সে কথা? বীরুর মনে তখনি তো কথা আরম্ভ হল। কে সে? সে কি শুধু মহামায়া পাঠশালার পণ্ডিত অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে বীরু! মোটেই না। কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক বীরু জানে সে কে। সে-ই তো সেই রাজপুত্র মলয়কুমার। এখুনি তো আরম্ভ হবে এই রূপকথার দিব্য, আশ্চর্য্য কাহিনীটা। চোখ খুলে ভালো করে দেখলে সবাই দেখতে পাবে যে মাটি আর খড়ের এই কুঁড়েঘরটাই একটা রাজপ্রাসাদ—রাজপুত্র মলয়কুমারের বাড়ী—আর ঐ যে মেয়েটি ঘুমোচ্ছে সে কে জানো? মলয়কুমারের বোন রাজকন্যা মালতীমালা। এখুনি, এখুনি আরম্ভ হবে, সেই মৃগয়া-অভিযান। কোথায় অশ্বপাল, তেজী একটা ঘোড়া আনো। নেই? থাক্, তবে রাজপুত্র পদব্রজেই রওনা হবে।

আচ্ছন্নের মত ঘর থেকে বেরোল বীরু। রাজপুত্র মলয়কুমার মৃগয়ায় বেরোল।

রাত তখন কটা? এগারোটা, বারোটা? মোটেই নয়, রাত তখন একটা, সারা গ্রাম ঘুমে অচেতন। সাড়া নেই, শব্দ নেই। রাত গভীর। তখন চারদিকে সেই মুহূর্ত্তই ঘনিয়ে এসেছে যখন আকাশ থেকে নেমে আসেন দেব-দেবীরা, নেমে আসে পরীর দল, যখন অঘটন ঘটে, ইন্দ্রজাল সংঘটিত হয় মানুষের চোখকে ফাঁকি দিয়ে।

বীরু এগোল রাস্তাটা ধরে। একটু শীতবোধ হয়। হোক্। পায়ের নীচে শিশির-ভেজা মাটি, তার ক্ষীণ একটা গন্ধ পায় সে। মোষের গাড়ীর চাকা রাস্তার দু'পাশে খাদের মত যে গভীরতার সৃষ্টি করেছে, তার দু'পাশে করাত আর কাঁটা মনসার ঝোপ। রাস্তার মাঝখানটা উঁচু, তাতে জায়গায় জায়গায় ঘন বিন্না ঘাস। উত্তরে বাতাসে কোত্থেকে যেন বাতাবী লেবুর ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। ঝিঁঝিঁ

পোকাদের ডাক এবার বেড়ে গেছে। সারা গ্রামে যে নিঃশব্দতা ছড়িয়ে পড়েছে তারি একটা শব্দময় পটভূমি যেন এই শব্দে গড়ে উঠেছে। দূরে, মাঠের মাঝখানে, ঘনসন্নিবিষ্ট তালবীথি যেন গ্রামের প্রহরীর মত স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে অতি দূর থেকে কয়েকটা কুকুরের ডাক ভেসে আসছে, ভেসে আসছে মহানন্দার ওপারের জঙ্গল থেকে শেয়ালদের কোলাহল।

বীরু সামনের দিকে তাকাল। জ্যোৎস্নায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। কে যেন একটা সাদা রেশমের চাদর ছড়িয়ে দিয়েছে সমস্ত চরাচরের ওপর। কিন্তু একি! রূপকথার কাহিনীটা তো মিথ্যা নয়। এই তো রূপকথার দেশ, কাঞ্চনপুরের সঙ্গে যেন রূপকথার দেশের কোনোই পার্থক্য নেই। আর কোথাও নয়, পৃথিবীর বাইরে নয় সে দেশ, এই কাঞ্চনপুরেই যেন আছে সেই দিকচিহ্নহীন তেপান্তরের মাঠ, মহানন্দার ওপারের বনটাই যেন সেই অন্তহীন অরণ্য, রূপনগরের স্ফটিকের রাজপ্রাসাদ যেন কাঞ্চনপুরেরই কোথাও লুকোনো আছে। কেবল খুঁজে নিতে হবে। এইরকম জ্যোৎস্না-রাত্রের গভীর মূহূর্ত্তেই যেন সেই সব অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাগুলো ঘটে।

হঠাৎ বীরু থম্‌কে দাঁড়াল। দিনের বেলাকার কাঞ্চনপুরটা যেন হঠাৎ অপরূপ এক মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে—অপরূপ ঐশ্বর্য্যে আর সৌন্দর্য্যে তা যেন অনির্ব্বচনীয় হয়ে উঠেছে। বীরুর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল এই উপলব্ধিতে। রূপকথা মিথ্যে নয়, তা সত্যি, ভয়ঙ্কর সত্যি। তাই থমকে দাঁড়াল বীরু। আর ঠিক তেমনি সময়ে কাছাকাছি কোথায় যেন একদল শেয়াল চীৎকার করে উঠল, চারদিকের অখণ্ড নিঃশব্দতা তাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। চমকে উঠল বীরু। হঠাৎ তার কেমন যেন ভয় হল, মনে হল

যেন আজ আর মৃগয়া-অভিযানে না বেরোনোই ভাল। সে ফিরে দাঁড়াল, দৌড়োতে আরম্ভ করল, এক ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে কপাট বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হল। না, আর ভয় নেই। ঐ তো দিদি ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু নতুন একটা উপলব্ধি হল বীরুর। ওর অল্প বুদ্ধি দিয়ে ও আবছা আবছা বুঝতে পারল যে রূপকথার দেশটা বাইরে নয়, তা এই পৃথিবীর সর্ব্বত্র এমন কি এই কাঞ্চনপুরেও আছে। রূপকথার কাহিনী মিথ্যে নয়, অবাস্তব নয়, সে বুঝতে পারল যে মানুষের জীবনেও রূপকথার কাহিনী ঘটে। কিন্তু একটা প্রশ্ন কাঁটা হয়ে বিঁধতে লাগল তার মনে। আজ বাবা কয়েকবার বলেছিলেন যে তারা গরীব। গরীব হওয়াটা ভালো নয়, তাতে শশী ময়রার দোকান থেকে যে ইচ্ছেমত ক্ষীরমোহন আর রসকদম্ব খাওয়া যায় না তা বীরু জানে। তবে? মানুষ কেন গরীব হয়? রূপকথার মানুষদের সঙ্গে তো তাদের কোনো অমিল নেই। এই তো সে নিজে। রাজপুত্র মলয়কুমার আর সে তো অভিন্ন। তবে? রূপকথার রাজ্যে তো গরীব হওয়ার দুঃখ নেই, সেখানে সবাই রাজা, রাজপুত্র, সেনাপতি আর মন্ত্রী। তবে? তারা গরীব কেন? মানুষেরা গরীব কেন?

এর বেশী আর ভাবতে পারল না বীরু। মনের ভেতরে যে প্রশ্নগুলো দেখা দিল তাদের জবাবও সে পেল না। এর জবাব একদিন অবশ্য সে পেয়েছিল। সে অনেক পরের কথা। অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনার পরই সে একদিন জেনেছিল যে মানুষ কেন গরীব হয়। কিন্তু সে কথা এখন থাক, পরের কথা পরেই বলা যাবে। আজ ঐ পর্য্যন্তই ভাবতে ভাবতে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল বীরু। আর ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখল। দেখল যে জেগে থেকে

যে মৃগয়া-অভিযান সে শুরু করেও শেষ করতে পারেনি তাই সে স্বপ্নের মধ্যে শেষ করছে। রূপকথার বাকী কাহিনীটা সেদিন স্বপ্নের মধ্যেই শেষ হল।

—দুই—

কাঞ্চনপুর গ্রামটা খুব ছোট নয়। স্কুল আছে, পোষ্ট অফিস আছে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অফিস আছে, আছে একটা চালের কল। মহানন্দার ধারে বলে আর রেলষ্টেশন থাকায় ধানচালের এটা একটা বড় ব্যবসার জায়গা। সেজন্য কাঞ্চনপুরের খুব নাম।

আর কাঞ্চনপুরের কাত্যায়নী হাই ইংলিশ স্কুলটার বয়স নেহাৎ কম নয়, পনেরো বছর আগে ওটা গ্রামের সদাশয় জমিদার হরবল্লভ চৌধুরী মশাই তৈরী করে দিয়েছিলেন। তবে এরি মধ্যে স্কুলটার চেহারা খারাপ হয়ে পড়েছে। হরবল্লভবাবুর ছেলে আর তেমন খরচ করেন না ওর পেছনে, ভয়ানক কঞ্জুষ লোক তিনি। ফলে অল্প বয়সেই বুড়িয়ে গেছে স্কুলটা। দেয়ালের চুনকাম খসে পড়েছে, দরজা জানালাগুলো নড়বড়ে হয়ে এসেছে, কাঞ্চনপুরের ডানপিটে ছেলেদের দাপটের কাছে স্কুলটা নিঃশব্দে হার মেনেছে।

স্কুলটা একতলা, ইংরাজী 'এল্' অক্ষরের মত দেখতে, তার চারদিকে দেয়াল আছে। ক্লাস সেভেনটা কোনাকুনি জায়গায়। সে কামরার পেছনের জানালাটা উড়ে গেছে, হাওয়া আর আলো সেখান দিয়ে অবাধগতিতে ঘরে ঢোকে। শীতকালে তা মন্দ লাগে না কিন্তু গরমের দিনে তা অসহ্য মনে হয়। তবু ছেলেরা খুব আপত্তি করে না। পলায়ন-তৎপর ছেলেদের কাছে ওর বিশেষ দাম আছে।

তখন বেলা এগারোটার কাছাকাছি। সেকেণ্ড পিরিয়ড চলছে। অঙ্কের ক্লাশ।

ধনঞ্জয়বাবু অঙ্ক পড়ান। বেশ কড়া মেজাজের লোক, বেঁটে, কালো, ভয়ানক মোটা, চলার ভঙ্গী দেখলে হাসি পায়। মনে হয় যেন দেহের বোঝাটা বয়ে বেড়ানো তাঁর বরদাস্ত হচ্ছে না। চোখ দুটো বড় বড়, তাতে দু' একটা লাল্‌চে শিরা উঁকি মারছে। রেগে যখন তিনি চোখ পাকান তখন একটা বুলডগের কথাই মনে পড়ে সবার। যখন তখন ছেলেদের মাথায় গাট্টা মেরে ভাঙ্গা গলায় বলেন, "কেমন লাগছে? কড়া পাকের সন্দেশ খেতে কেমন লাগছে রে, এঁ্যা?"

ধনঞ্জয়বাবু একটা অঙ্ক লিখে দিলেন বোর্ডে। তারপর চেয়ারটাতে ধপ্ করে বসে পড়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, "পাঁচ মিনিট—পাঁচ মিনিটের মধ্যে আঁকটা করে ফেলতে হবে তোদিকে—যে না পারবে তার মাথাটা গাট্টার চোটে থাট্টা করে দেব—হুঁ।"

ছেলেরা আঁক কষতে আরম্ভ করল। হঠাৎ সবাই অতিমাত্রায় নিঃশব্দ হয়ে পড়ল। কিন্তু তবু ধনঞ্জয়বাবু শুনতে পেলেন যে কারা যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে চলেছে।

ব্যাপার কি জানো?

সবার পেছনে বসে বীরু তার প্রাণের বন্ধু পল্টুর সঙ্গে গল্প করছিল। পল্টুর ভালো ডাক নাম পল্টন আর ভালো নাম পরেশ। বীরুর চেয়ে সে দু'তিন বছরের বড়ই হবে, ক্লাশ সেভেনে পরপর দু'বছর ধরে ফেল করেছে। নাকটা চ্যাপ্টা, চোখ দুটো নেপালীদের মত ছোট ছোট, মুখে কয়েকটা জলবসন্তের দাগ আর তেজী চেহারা। পল্টু নানাকারণে বীরুর প্রাণের বন্ধু হয়েছে এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ এই যে সে প্রায়ই বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। কয়েকদিন ধরে সবাই তাকে দেখে যেই

নিশ্চিন্ত হয়ে আসে অমনি সে একদিন উধাও হয়, বেশ কয়েকদিন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে আবার হঠাৎ একদিন ফিরে আসে। বকুনী, মার, ওসব ওর কাছে পুরোনো, মামুলী ও ছেলেমানুষী ব্যাপার। কি যেন ওকে সারাক্ষণ অস্থির রাখে, মাঝে মাঝে বাড়ী ছাড়িয়ে বিদেশে, দূর পথে টেনে নিয়ে যায়। ফিরে এসে বীরুর কাছে সে সবই খুলে বলে, খুলে বলে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য নানা কাহিনী। কেমন করে সে টিকিট চেকারদের ফাঁকি দেয়, জয় করে, কেমন করে একটা পয়সা পকেটে না নিয়েও সে উপোস করে না, চারদিক বেড়িয়ে আসে।

আজো সবার পেছনে বসে পল্টু বীরুকে গল্প শোনাচ্ছিল। এই কিছুদিন আগে সে যে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিল তার কথা। সে বলছিল মুর্শিদাবাদের রাজপ্রাসাদের কথা, আলিবর্দ্দী, সিরাজ আর মিরজাফরের কথা। সে বলছিল কেমন করে ইংরেজরা চক্রান্ত করে বাংলা দেশকে জয় করে নিয়েছিল, কেমন করে বাংলার স্বাধীনতাকে কেড়ে নিয়েছিল।

মুগ্ধ হয়ে শুনছিল বীরু। শুনতে শুনতে সে ভুলে গিয়েছিল যে সে ক্লাশে বসে আছে। ভুলে গিয়েছিল যে সামনেই ধনঞ্জয় মাষ্টার বসে আছেন এবং টেবিলের ওপর তার বেতটা একটা অশুভ ভবিষ্যতের ঘোষণা করছে।

মুগ্ধকণ্ঠে সে ফিস্‌ফিস্ করে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা পল্টু ?"

"উঁ ?"

"তোর একা বেড়িয়ে বেড়াতে ভয় করে না ?"

"না। ভয় করলে কি এসব হয় ? পৃথিবীকে দেখতে গেলে কি ভয় করলে চলেরে গাধা ?"

"হুঁ। আমারো যেতে ইচ্ছে করছে।"

"চল্‌না"—

"কোথায়?"

"চল্ এবার একেবারে দিল্লী চলে যাই"—

"দিল্লী কি রকম রে?"

"ভারতবর্ষের রাজধানী কতদিনকার পুরোনো—সেই পাণ্ডবদের আমল থেকে তা আমাদের দেশের রাজধানী হয়ে আছে- পৃথিবীর সেরা সহর—"

"আর কলকাতা?"

"কলকাতাও বড় সহর তবে দিল্লীর কাছে কি তা লাগে রে পাগল। দিল্লী হল রাজরাজ্‌ড়া উজীর বাদ্‌শাদের জায়গা, সেই যে কথায় বলে না 'দিল্লীকা লাড্ডু'? তবে? হুঁ—"

বীরু চুপ করে রইল। চোখের সামনেকার সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে একটা সুদীর্ঘ ধূসর পথ ভেসে উঠল। বীরু চলেছে। একা। না, একা নয়, সঙ্গে পল্টুও আছে।

বাইরে কড়া রোদ, দূরে কিষণলাল মাড়োয়ারীর চালের কলের চোঙ্ দিয়ে হাল্‌কা ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ভিতরে ধনঞ্জয়বাবুর লাল্‌চে চোখদুটোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি যেন দেখছেন। বাইরে পশ্চিমা বাতাসে ধূলো উড়্‌ছে। দু'একটা শালিকের কিচির মিচির শব্দ ভেসে এল। ভিতরে মণ্টু বলে ছেলেটা পেন্‌সিল মুখে দিয়ে ভাবছে অর্থাৎ অঙ্কটা তার মাথায় ঢুকছে না। বাইরে একটা উদাস, মন্থর ভাব, মনটা খাঁ খাঁ করে, কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে। কোথায় যাবে সে? দিল্লী, কলকাতা? আবার সেই সুদীর্ঘ ধূসর পথটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। কে যেন

ডাকছে। আয়, আয় বীরু। শুধু তাই নয়, অদেখা যত গাছ-পালা, অরণ্য, পর্ব্বত, প্রান্তর, ভবন, দেশবিদেশের অচেনা যত আকাশ আর মানুষেরা যেন তাকে হাতছানি দিয়ে সস্নেহে ডাকছে। আয়, আয় বীরু, আয়।

"কিরে বীরু যাবি ? চল্ কালকেই যাই"—পল্টু বল্ল।

"কালকেই ?"

"হ্যাঁ।"

না, এত তাড়াতাড়ি যাবার জন্য তৈরী নেই বীরু।

"উহুঁ"—সে মাথা নাড়ল।

"কেন ?"

"তৈরী নেই।"

"তৈরী আবার কি হবি রে বোকা ? দু'তিনটে জামা আর দুটো কাপড়, ব্যস্"—

"উহুঁ"—আবার মাথা নাড়ল বীরু, "পরে হবে—কবে তা তোকে পরে বলব।"

পল্টু জবাব শুনে খুব খুশী হল না। একা একা অনেক বেড়িয়েছে সে। এখন আর তা ভালো লাগে না। একজন সঙ্গী থাকলে খুব মজার হত আর বিশেষ করে বীরুর মত দোস্ত্।

ঠিক এমনি সময়ে অঘটন ঘটল।

ধনঞ্জয় তাঁর ছোট্ট পাহাড়ের মত বা রোলারের মত শরীরটাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তারপর এগিয়ে এলেন বীরু আর পল্টুর কাছে।

"দেখি তোরা আঁকটা কদ্দুর করলি"—হাত বাড়িয়ে থেমে গেলেন তিনি।

মুহূর্ত্তমাত্র। অন্যান্য ছেলেরা সকৌতুকে তাকাল তাদের দুজনের দিকে। সবাই কামনা করছে যে ওরা দু'জনে একটু 'কড়াপাকের সন্দেশ' খাক্, অপমানিত হোক।

পল্টু চোখ পিট্‌পিট্ করতে করতে বলল, "আঁকটা ভারী কঠিন মাষ্টার মশাই"—

"চেষ্টা করেছিলি রে হারামজাদা?"

"আজ্ঞে না মাষ্টারমশাই—কঠিন বলেই করি নাই।"

"বটে!"

"আজ্ঞা হ্যাঁ মাষ্টারমশাই"—

"চুপ্"—ধনঞ্জয়বাবুর শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল, তাঁর ভিতরকার রাগ যেন তরঙ্গের মত তাঁর গায়ের থলথলে মাংসের ওপর দিয়ে বয়ে গেল।

"পাজী, শুয়ার, গাধা, গিদ্ধোড়"—ধনঞ্জয়বাবুর গর্জ্জন ধ্বনিত হল। সে গর্জ্জন তাঁর চেহারার মতই ওজনে সমান ভারী। একেবারে যাকে বলে নাদধ্বনি।

গালিগালাজগুলো যেন থান ইঁটের মত পল্টুর মুখের ওপর গিয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু নির্ব্বিকারভাবেই সে সেগুলোকে সহ্য করতে লাগল, খালি তার ছোট ছোট চোখদুটো একটা চাপা উত্তেজনার ফলে সমানে পিট্‌পিট্ করতে লাগল। আর মাঝে মাঝে সে ধনঞ্জয়বাবুর টেবিলের ওপরকার লিকলিকে বেতটার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছিল।

"নন্তু"—হঠাৎ ধনঞ্জয়বাবু একটি ছেলেকে ডাকল।

নন্তু মানে নিশীথ, তেরো চোদ্দ বছরের একটি গাট্টাগোট্টা ছেলে, বর্ত্তমান জমিদার প্রিয়বল্লভ চৌধুরীর আদুরে ছেলে। আদুরে এবং

বদমায়েসও বটে। জমিদারের ছেলে বলে, গায়ে শক্তি এবং মাথায় কুবুদ্ধির জট আছে বলে ছেলেদের ওপর সে বেজায় সর্দ্দারী করে। কেবল তার তোয়াক্কা করেনা বীরু ও পল্টু। শুধু তাই নয়, জমিদার-পুত্র বলেই বেশীর ভাগ মাষ্টারদের কাছেই তার সাত খুন মাপ হয়, তার দোষটা গুণ হয়ে ওঠে।

"নশু"—

"আজ্ঞে"—নশু উঠে দাঁড়াল।

"কাছে এসো"—

নশু তাঁর কাছে গেল।

"তোমার আঁকটা হয়েছে ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"বেশ এই শয়তানটার কান মলে দাও তো"—

নশুর ঠোঁঠ নড়ে উঠল, হাসি দেখা দিল তার কোনে, চোখের তারায় ঝিলিক মারল একটা আত্মতৃপ্তি ও গর্ব্বের ভাব। সে এগিয়ে গেল পল্টুর দিকে।

পল্টুর ছোট ছোট চোখে এবার আগুন জ্বলল, সে বলল, "না মাষ্টারমশাই"—

"না কিরে উল্লুক ?"

"এ অপমান আমি—"

কথাটা তার শেষ হল না, ধনঞ্জয়বাবুর গর্জ্জন তাকে স্তব্ধ করে দিল।

"অপমান! বটে! নশু, দাও ছুঁচোটার কান মলে।"

নশু এগোল, হাত বাড়াল।

"খবরদার নশু"—পল্টু শাসাল।

ধনঞ্জয়বাবু আর সইতে পারলেন না, ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি

পল্টুর ওপর, খট্ খট্ শব্দে তাঁর গাট্টা পড়তে লাগল ছেলেটার মাথার ওপর, 'কড়াপাকের সন্দেশ'। আর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বীরু মুহূর্ত্তগুলোকে গুণতে লাগল, এবার তো তার পালা।

ধনঞ্জয়বাবু মেরে চললেন পল্টুকে আর বকতে লাগলেন, "এতবড় আস্পর্দ্ধা তোর—বটে! আজ তোকে মেরেই ঠাণ্ডা করে দেব—আমাকে চিনিস্‌নি তুই!" তারপরে ডাকলেন নণ্ডকে, "নাও, এবার কাণ মলে।"

মার খেয়ে পল্টু তখন একটু কাহিল হয়ে পড়েছে, সে বুঝতে পারল যে আর বিদ্রোহকে বাড়ানো চলবে না, নিঃশব্দে আজ এই অপমানটুকু তাকে সহ্য করতেই হবে। তাই নণ্ডর আঙ্গুলগুলো যখন তার কানটাকে বেশ মুচ্‌ড়ে দিল তখন সে শুধু একটা অসহায় শ্বাপদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, অপমানে তার চোখে তখন শুধু একটু জল টলমল করে উঠল, আর কিছু নয়। কিন্তু কেউ যদি ভালো করে দেখত তাহলে সে বুঝতে পারত যে তার ললাটের রেখায় একটা কুটিল শপথ ঘোষিত হল আর দাঁতগুলো তার কড়মড় শব্দ করে উঠল।

"ষ্ট্যাণ্ড্ আপ্ অন দি বেঞ্চ্—বেঞ্চির ওপর দাঁড়া—ষ্ট্যাণ্ড আপ্"—

বেঞ্চের ওপর নিঃশব্দে দাঁড়ালো পল্টু।

নণ্ড গিয়ে নিজের জায়গায় বসল।

এবার বীরু।

"তুই! তুই কেন আঁক কষিস্‌নি?"

"বড় কঠিন মাষ্টারমশাই"

"কঠিন! তবে 'কড়াপাকের সন্দেশ' খাও।"

শুরু হল গাট্টার পালা।

"কেমন লাগছে রে গুণ্ডা, এঁ্যা? বল্, কেমন লাগছে। নিশ্চয়ই ভালো, বল্—বল্"—

কি বলবে বীরু ?

আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করতে করতে সে মাথা নাড়ল, "ভালোই লাগছে—"

ধনঞ্জয়বাবু সগর্জ্জনে হাসলেন, "ভালো! বটে! তাহলে নে, আরো কয়েকটা খা—"

উঃ, মাথাটা বোধ হয় এবার ফেটে যাবে।

"আর নয় মাষ্টারমশাই—আর নয়—"

"কেন? যখন ভালো লাগছে তখন আর খেতে আপত্তিটা কি?"

"না, আর ভালো লাগছে না মাষ্টারমশাই"—

"ভালো লাগছে না! কি বলিস্ তুই! 'কড়াপাকের সন্দেশ' কি কখনো খারাপ লাগতে পারে? নে, আরো কয়েকটা খেয়ে দেখ্"—

না, কিছু না বলাই ভালো। চুপ করেই রইল বীরু কিন্তু রাগে সে প্রায় পাগলের মত হয়ে উঠল ভিতরে ভিতরে।

"ষ্ট্যাণ্ড্ আপ্ অন দি বেঞ্চ্—ওঠ্, ওঠ্—"

দুই বন্ধু বেঞ্চের ওপর পাশাপাশি দাঁড়াল, পরস্পরের দিকে তাকাল। ধনঞ্জয়বাবু নিজের গজ-বিনিন্দিত দেহটি নিয়ে চেয়ারে গিয়ে আবার বসলেন। অন্যান্য ছেলেরা মিটিমিটি হাসছে দুইবন্ধুর দিকে চেয়ে। আর জমিদারপুত্র নন্তুর তো কথাই নেই।

"দেখি—আঁক—দেখি এক এক করে নিয়ে এসো"—ধনঞ্জয়বাবু বেতটা তুলে আস্ফালন করলেন।

ছেলেরা একজনের পর একজন উঠে আসতে লাগল। অঙ্ক দেখিয়ে প্রায় প্রত্যেকেই একটু আধটু করে 'কড়াপাকের সন্দেশ' খেয়ে নিজের নিজের সীটে ফিরতে লাগল।

হঠাৎ একসময়ে ধনঞ্জয়বাবুর নজর পড়ল শেষ বেঞ্চগুলোর দিকে।

এ কি ! বীরু কোথায় ? একি ভোজবাজী নাকি ?

"বীরু—বীরে"—হাঁকলেন তিনি।

না, বীরু ক্লাশে নেই।

"বীরু কোথায় রে পল্‌টু ?—"

"জানিনা মাষ্টারমশাই।"

"জানিস্‌না কিরে শুয়ার, তোর পাশেই তো ছিল !"

"ছিল কিন্তু আমি যে সামনের দিকে তাকিয়েছিলাম—"

নশু উঠে দাঁড়াল, "আমি দেখেছি স্যার—"

"তাই নাকি ? কোথায় হনুমানটা"—

"হনুমানটা পেছনের জানালা দিয়ে পালিয়ে গেল—এইমাত্র"—

ধনঞ্জয়বাবুর রক্তাক্ত দৃষ্টি আরো রক্তাক্ত হয়ে উঠল, তিনি পল্‌টুর দিকে তাকালেন, "তুই ওকে যেতে দেখিস্‌নি কিরে চাল-কুম্‌ড়ো ?"

পল্‌টু উত্তেজিত হয়ে উঠল, "সত্যি দেখি নাই—আপন গড্‌ বলছি।"

"বটে !" একটু ভাবলেন ধনঞ্জয়বাবু, "আচ্ছা তুই যা, ওকে ধরে নিয়ে আয়—তুই ওর বন্ধু—তুই-ই জানিস্‌ ও কোথায় কোথায় যায়। যা, কিন্তু খবরদার, ওকে ধরে আনা চাই।"

"আচ্ছা"—

পল্‌টু একটু চিন্তিত মুখেই বেরিয়ে গেল ক্লাশ থেকে। না, বীরু ব্যাপারটা ভালো করল না। সে মানা করেছিল কিন্তু বীরুটা এমনি গোঁয়ার যে তার কথায় কানই দেয়নি।

তখন বীরু বসে আছে চৌধুরীদের আমবাগানের শেষপ্রান্তে অবস্থিত মজা পুকুরটার এক কোণে। বহুদিনের মজা পুকুর; শ্যামা

ঘাস আর কচুরী পানায় ভর্ত্তি, কিন্তু লোকে বলে যে তাতে নাকি বেশ মাছ আছে। সেই পুকুরটারি এক কোণে নধর ঘাস আর বনকলমীর পুরু বিছানার ওপর দিব্যি আরামে বসে বীরু তখন মাছ ধরছিল। হ্যাঁ, মাছই ধরছিল। বঁড়শিযুক্ত ছিপ দিয়েই বটে। স্কুল পালিয়ে এসে মাঝে মাঝে এখানে সে মাছ ধরে বলে ছিপটাকে এখানেই লুকিয়ে রেখে যায়। ফাৎনা অবশ্য নড়ছিল না, মাছ ধরা পড়বার কোনো সুলক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। তবু তার ভঙ্গীটা এমন গুরুতর ছিল যেন সে একটা রুই কাৎলা পেল বলে।

আমবাগানটায় তখন লোকজন নেই। মজা পুকুরের ধারে আঁশ্‌শ্যাওড়া আর কুলগাছের জঙ্গল, নানা আগাছার ঝোপ। লোকজন সেখানে বড় একটা আসে না। পশ্চিমা বাতাসের ঢেউ এসে বাগানের গাছপালার পাতায় আর ডালে আছ্‌ড়ে পড়ছে, হা হা একটা শব্দ হচ্ছে, ধূলো আর শুক্‌নো পাতা উড়ছে। দূরে কয়েকটা ছাগল আর গরু চরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে তাদের অস্ফুট ডাক শোনা যাচ্ছে। হাওয়ায় মজা পুকুরের জল দুলছে, কচুরীপানার রাশি পুকুরের পূবদিকে সরে যাচ্ছে। বেশ লাগছে বীরুর।

হঠাৎ ফাৎনাটা দুলে উঠল। মার্ টান। কোথায়, কিচ্ছু না। তবে? ওঃ—হাওয়া, নিজের মনে হি হি করে হেসে উঠল বীরু।

"এই"—

বীরু চম্‌কে উঠল, পেছন দিকে তাকাল। পল্টু।

পল্টু পাশে এসে বসে পড়ল, তিরস্কারের সুরে বলল, "তখন মানা করলাম কথা শুনলি না তো গোঁয়ার"—

"কেন কি হয়েছে?"

"ধনামাষ্টার আমায় পাঠিয়েছে তোকে খুঁজে নিয়ে যেতে"—

"কে বলল যে আমি পালিয়ে এসেছি ?"

"নণ্ড"—

বীরু দাঁত কিড়মিড় করল, "আচ্ছা প্যাচাটাকে দেখে নেব এবার—আর সহ্য হয় না ভাই"—

পল্টু সায় দিল, "যা বলেছিস্ ভাই—আমায় আজ কি অপমানটাই না করল! আমি কি ওকে ছেড়ে দেব ভেবেছিস্? মোটেই না—জমিদারের ছেলে বলেই ওকে আমি ছাড়ছি না"—

"জমিদার তো কি হয়েছে? কচু। আমরাও জমিদারের ছেলে"—

"নিশ্চয়ই। কিন্তু এবার স্কুলে চ'"—

"না, ওই হাতীটার ওপর আমার ভয়ানক রাগ হয়েছে"—

"আচ্ছা বেশ, ওকেতো একদিন জব্দ করব, দেখিস। এখন চল, এতে লাভ নেই, ব্যাপারটা গোলমেলে হবে।"

"গিয়ে কি হবে? হাতীটা আমায় আবার মারবে, তার চেয়ে না গিয়ে মার খাওয়াই ভালো। নে, তুইও আর যাস্‌নে, আমার মাছধরা দেখ্"—

"না না, চল তুই, ওঠ্, আর অত ভাবছিস্ কেন?" পল্টু আশ্বাস দিয়ে বলল, "আমার কথামত চললে তোর কিচ্ছু হবে না।"

"মানে ?"

"গিয়ে বলবি যে পেটটা একটু ইয়ে হয়েছিল"—

"অমন মিথ্যে কথা বলব ?"

"বলবি না তো কি—ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হলে গাট্টার চোটে মাথাটা তোর খাট্টা হয়ে যাবে। নে নে, চল্"—

অগত্যা তাই। দুই বন্ধু উঠল। কিন্তু বীরুর মনটা তাতে খুব শান্তি পেল না। দূর, পল্টুটা সব ভেস্তে দিল।

ওদিকে হাওয়া বইছে, পাতা উড়ছে, শালিক ময়নারা ডাকছে, মজা পুকুরের ধারে বনমোরগেরা ছুটোছুটি করছে। শীতশেষের নাতিশীতোষ্ণ মধ্যাহ্নটি মন্থরতার আমেজে ভরপুর হয়ে উঠেছে।

আবার স্কুল।

ধনঞ্জয়বাবুকে তখন বুনো মোষের মত দেখাচ্ছে।

"কোথায় গিয়েছিলি ?

"পেটটা একটু মোচড় দিচ্ছিল তাই বাইরে গিয়েছিলাম।" অম্লানবদনে বন্ধুর উপদেশ মত মিথ্যে কথা বলল বীরু।

"পেট! শুয়ার, তোর মিথ্যে কথা বলতে ভয় করছে না" ?—

"মিথ্যে কথা তো বলছি না।"

"বটে!"

"হ্যাঁ।"

"আমায় জিজ্ঞেস না করে পালালি কেন ?"

"আপনি চটে ছিলেন বলে ভয় হচ্ছিল।"

"হাত পাত্"—

পাতল হাত বীরু।

সপাং সপাং। বেতটা গর্জ্জে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল বীরু।

ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হল না। টিফিনের সময় হেডমাষ্টারের কাছ থেকে তলব পড়ল।

হেডমাষ্টার মুনিঋষির মত লোক, দেখতেও অনেকটা তেমনি,

দাড়ি আছে। খদ্দর পরেন, অল্প অল্প কথা বলেন হেসে হেসে, তাকে দেখলে ভয় করে না, শ্রদ্ধা হয়।

"বীরু"—হেডমাষ্টার বললেন।

"আজ্ঞে"—থম্‌থম্‌ করছে বীরুর মুখ। আরো কি আছে কে জানে। আচ্ছা সে ছেড়ে কথা কইবে না।

"তুমি পালিয়েছিলে?"

বীরু চুপ।

"সত্যি কথা বলবে বীরু।"

"হ্যাঁ মাষ্টারমশাই—পালিয়েছিলাম।"

"কেন?"

"অঙ্কের মাষ্টারমশাই গাট্টার চোটে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন।"

"কিন্তু তুমি কেন অঙ্কটা করোনি?"

বীরু চুপ।

"আর কখনো এমন করবে না।"

"না।"

"আজ তোমায় ছেড়ে দেওয়া হোল। ছিঃ বীরু, ভালো ছেলে হও। জানো তোমার কত বড় বড় কাজ করার আছে?"

"না মাষ্টারমশাই।"

"তবে বোস।"

বীরু অবাক হয়ে বসল। তার দ্বারা কি কাজ হবে? বড় কাজ? মন দিয়ে শুনল সে হেডমাষ্টারমশায়ের কথাগুলো। কথা নয়, গল্প। বিদ্যাসাগর, ওয়াশিংটন, আর লেনিনের গল্প। অদ্ভুত সব গল্প। তাঁরা নাকি এককালে বীরুর মতই ছোট ছিলেন, সাধারণ ছিলেন। কিন্তু নানা কর্ম্মের ভিতর দিয়ে তাঁরা আজ

অসাধরণত্বের পংক্তিতে গিয়ে পৌঁছেচেন, প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছেন। বীরুকেও তেমনি হতে হবে। তার দেশ ভারতবর্ষ নাকি পরাধীন, তার দেশের কোটি কোটি লোক নাকি উপোস করে, ন্যাংটো হয়ে থাকে। আজ তার মত ছেলেরা নাকি দেশ এবং দেশবাসীদের মুক্ত ও সুখী করার ব্রত নিয়েছে—সে ব্রত বীরুকেও নিতে হবে।

হেডমাষ্টারমশাইয়ের দু'চোখ জ্বলছে একটা প্রখর দীপ্তিতে। তাঁর দিকে তাকিয়ে। তাঁর কথা শুনে বীরুর খুব ভালো লাগল। সে অভিভূত হয়ে পড়ল। তার মনে অঙ্কুরের মত একটা কামনা জাগল যে সেও ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর মুক্তি-সাধনের কাজে অংশগ্রহণ করবে, সেও পেছনে পড়ে থাকবে না, সেও মহৎ হবে।

কিন্তু ক্লাশে গিয়ে নগুকে দেখেই বীরুর সব মহৎ আকাঙ্ক্ষা এখন কর্পূরের মত উড়ে গেল। থাক্, ওসব কাজ পরে হবে। নগুকে শায়েস্তা করাটাই হবে সবচেয়ে বড় কাজ। জমিদারের ছেলে বলেই কি ধরাকে সরা জ্ঞান করবে! না, তা অসহ্য।

"পল্টু"—প্রাণের বন্ধুকে ডাকল বীরু।

"উঁ ?"

"কি করা যায় ?"

"কিসের কি ?"

"নগু শুয়ারটাকে ঢিট্ করতে হবে।"

"রইলাম তক্কে তক্কে—একদিন না একদিন ঠিক খোঁড়া করে দেব ওকে"—

ক্লাশের ছেলেরা তাদের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে কি সব যেন বলাবলি করছে। আচ্ছা করুক। চাকা একদিন ঘুরে যাবে।

সুযোগটা শিগ্‌গীরই পাওয়া গেল একদিন। খেলার মাঠে।

ফুটবল খেলা হচ্ছিল।

মাঠের একধারে ছিল একটা ছোট্ট ডোবা মত। হঠাৎ বলটা তার মধ্যে গড়িয়ে গিয়ে বেশ খানিকটা কাদাযুক্ত হয়ে গেল। বীরু পল্টুর বিপক্ষে খেলছিল নণ্ডু, ব্যাক থেকে। সে বলটা নিয়ে এগোচ্ছিল। মণ্টু বলে ছেলেটি তার কাছে যেতেই সে বলটা তুলে নিয়ে মণ্টুর গায়ে ছুঁড়ে মারল। মণ্টুর ধবধবে জামায় বেশ বড় একটা কাদার ছাপ পড়ল। নণ্ডু হো হো করে হেসে উঠল।

মণ্টু প্রতিবাদ করল, "বারে, তুমি এমন করলে যে!"

"চোপ্‌"—নণ্ডু চোখ পাকিয়ে ধমক দিল।

বীরু আর পল্টু স্থির হয়ে দাঁড়াল। বাঃ, একি অন্যায়!

মণ্টু নণ্ডুর ধমকে একটুও মিইয়ে গেল না, তার পরিষ্কার জামাটা ময়লা হয়ে যাওয়ায় সে ক্ষেপে গেছে, সমানভাবেই সে বলল, "না, চুপ করব না, কেন, কেন তুমি আমার জামাটাকে নোংরা করলে?"

"করেছি, বেশ করেছি, আমার ইচ্ছে"—মণ্টুকে সজোরে একটা ধাক্কা দিয়ে নণ্ডু বলল, "যা যা, সরে যা—"

নণ্ডুর ধাক্কায় নিজেকে সাম্‌লাতে পারল না মণ্টু, সে চিৎ হয়ে ছিট্‌কে পড়ল, বেশ চোট লাগল তার কোমরে।

বীরুর আর সহ্য হল না।

"ওকে কেন মারলে নণ্ডু?" সে কঠিনকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

"যা যা"—

"কথার জবাব দাও। আমি মণ্টুর মত যাব্‌ড়াবার পাত্র নই।"

আস্তে আস্তে সব ছেলেরা এসে দাঁড়াল তাদের কাছে। তাদের মধ্যে নগুর ভক্তদের সংখ্যাই বেশী।

"কথার জবাব দাও নগু"—একটুও ভয় না পেয়ে বলল বীরু।

"কথার আবার জবাব কিরে—মেরেছি, বেশ করেছি"—

"না, তোমার এসব অত্যাচার আমরা সইব না।"

"কে, কে সইবে না? এঁ্যা?" নগু তাকাল সবার দিকে। সবাই নিঃশব্দ রইল।

"আমি"—বীরু বলল।

নগু হাসল, "ইস্, কি করবি?"

"আবার যদি এমনভাবে তুমি জুলুম করো তবে তোমায় ঠাণ্ডা করে দেব।"

নগু এগিয়ে এল, এক হাত দিয়ে বীরুর বুকে ঠেলা দিয়ে বললে "কি; কি করবি রে উল্লুক?"

"গাল দিস্‌না নগু"—বীরুর রক্তস্রোত তখন বর্ষাকালের মহা-নন্দার মত উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, দু'চোখের ভিতর দিয়ে আগুনের হল্‌কা বেরোচ্ছে।

"দেবই তো, একশোবার দেবরে শুয়ার"—নগু টক্‌টকে দাঁত মেলে হাসল। নিজের শক্তি সম্বন্ধে তার কোনো সন্দেহ নেই, নিজের ভক্তদের সংখ্যাধিক্যও তার বেশ ভালো আছে তাই পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে আবার একটা ধাক্কা দিল সে বীরুকে।

পল্টু উত্তেজিতকণ্ঠে বলল, "মার্—মার্ ব্যাটাকে"—

বীরু মাথা নাড়ল, "দাঁড়া।" সবার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "শোন্ তোরা। কার দোষ তা তো দেখলি তবু উলটে আমাকে ও চোখ রাঙাচ্ছে, ধাক্কা মারছে। কিন্তু আমি তা আর সইব না। আমি নগুর সঙ্গে লড়ব"—

হো হো করে হেসে উঠল নণ্ড। অনেকগুলো ছেলে যোগ দিল তার সঙ্গে।

নণ্ড নিজের ডানহাতের পেশীটাকে ফুলিয়ে শক্ত করে সে বলল, "তোর সাহস তো কম নয়, তুই আমার সঙ্গে লড়বি?" 'আমার' কথাটার ওপর সে খুব জোর দিল।

বীরু স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে, মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, লড়ব। কিন্তু"—অন্যান্য ছেলেদের দিকে তাকিয়ে সে বলল,—"কিন্তু কেউ তোরা যোগ দিবি না আমাদের লড়াইয়ে, মাকালীর দিব্যি রইল তোদের ওপর। এ লড়াই শুধু আমার আর নণ্ডর"—

ব্যঙ্গভরে তাল ঠুকে নণ্ড বলল, "বেশ বেশ খোকাবাবু—এস লড়বে এসো"—

বীরুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে পল্টু বলল, "ওর গায়ে কিন্তু জোর আছে বীরু, তুই থাক্, আমি লড়ে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি ওকে।"

বীরু কটমট করে তাকাল বন্ধুর দিকে, বলল, "পাগল না ছাগল তুই? তাহলে কি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব।"

"কিন্তু তুই কি পারবি?"

"পারব। মরে যাই সেও স্বীকার কিন্তু ওই ব্যাটা নবাবপুত্তুরকে আজ আমি গোড় দেখাব।" 'গোড় দেখানো' মানে মজা দেখানো।

"কিরে, কি ফুসুরফাসুর করছিস্! ভয় হচ্ছে?" নণ্ড হাসল।

"না, তোর মোড়লী এবার থামিয়ে দেব।" বীরু জবাব দিল।

"তবে আয়রে শালা"—নণ্ড গাল দিল।

"চোপ্ শুয়োরের বাচ্চা"—বীরুও গর্জ্জে উঠল এবার।

তিন চার হাত ব্যবধান রেখে মুখোমুখী দাঁড়াল দুজনে। সবাই তাকাল তাদের দিকে। সবাই নিঃসন্দেহ যে নণ্ড বীরুকে

পিষে মারবে। বীরুর চোখ মুখ তখন উত্তেজনায় লাল টকটকে হয়ে উঠেছে, শরীরটা কাঁপছে একটা বন্য আবেগে। বহুদিনের সঞ্চিত রাগ, নণ্ডর কাছে থেকে পাওয়া বহুদিনের বহু ব্যঙ্গবিদ্রূপ আর অপমানের জ্বালা যেন আগুন হয়ে বেরিয়ে আসছে দেহের প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে। নণ্ডর গায়ে বেশী জোর? আচ্ছা দেখা যাক। আজ যদি বীরু হারে, তবে যে অন্যায়ের জিৎই হবে। তা হতে পারে না। না বীরু ঠিক জিৎবে।

হঠাৎ নণ্ড এক লাফ দিল বীরুর ওপর। বীরু সামলাতে পারল না, পড়ে গেল মাটিতে আর সেই অবসরে নণ্ড বেশ কয়েকটা কিল ও ঘুষি লাগাল তাকে।

যেন আগুনে ঘি পড়ল। দুরন্ত রাগে জ্ঞান হারাল বীরু। প্রাণপণে সে নণ্ডকে আঁকড়ে ধরল, শরীরের সমস্ত শক্তিকে প্রয়োগ করে সে উঠে দাঁড়াল। হাড়ের ভেতরটা যেন মট্‌মট্‌ করে উঠল কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করল না একটুও। নণ্ডর কিল ঘুষি তার গায়ে এসে পড়ছে কিন্তু কোন বেদনাই সে বোধ করল না। কেবল একটা মাত্র হিংস্র কামনা তার চেতনায় দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল যে নণ্ডকে আজ কাৎ করতে হবে।

ওদিকে পল্টুর হাত নিস্‌পিস্‌ করছে, ছোট চোখ বড় হয়ে উঠেছে সবাই নিরুদ্ধনিঃশ্বাসে লক্ষ্য করছে, নিঃশব্দে।

শুধু কিল চড় আর ঘুষির শব্দ শোনা যেতে লাগল। শোনা যেতে লাগল দাঁতে দাঁতে ঘসার আওয়াজ আর অস্ফুট গালিগালাজ।

প্রথমে মনে হচ্ছিল যে বীরু হেরে যাবে। কিন্তু হঠাৎ মনে হতে লাগল যে নণ্ড হাঁপিয়ে পড়েছে। প্রথম দিকে নণ্ডই মারছিল বীরুকে, শেষে দেখা গেল যে বীরুই মারছে বেশী। নণ্ড এলো-

পাগাড়ি মারবার চেষ্টা করছে, চেষ্টা করছে দেহের ভরে বীরুকে কাবু করার, কিন্তু বীরু ঢের ক্ষিপ্র, সে যখন হাত চালাচ্ছে তখন সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে না।

নাক, দাঁতের গোড়া, ঠোঁট আর চোয়াল থেকে রক্ত পড়ছে দু'জনের।

পল্টুর চোখে আনন্দের উত্তেজনা। মনটু সোৎসাহে দুলছে।

অন্যান্য ছেলেরা যেন মুষড়ে পড়েছে।

হঠাৎ দেখা গেল যে নণ্ড টলছে।

"হার মানলি তো?" বীরু হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করল।

"না-না-শালা"—নণ্ড কদর্য্য মুখভঙ্গী করল।

আরো কয়েকটা ঘুষি। পরে নণ্ডকে জাপটে ধরে মাটিতে ফেবলে চেপে ধরল বীরু।

"এবার?" সে আবার প্রশ্ন করল।

"না"—কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল নণ্ড, প্রাণপণে চেষ্টা করল বীরুকে ঠেলে উঠবার জন্য। কিন্তু পারল না, লোহার সাঁড়াশীর মতই বীরু তাকে জাপটে চেপে ধরেছে। কে জানত যে তার গায়ে এত ক্ষমতা আছে! নণ্ডও জানত না, তার দাপটে অবনত ভক্তরাও তা জানত না।

শেষ চেষ্টা করে নণ্ড একেবারে নিস্পন্দ হয়ে পড়ল।

পল্টু সোৎসাহে বলে উঠল, "সাবাস বীরু—সাবাস ভাই।"

"এবার? হার মানলি তো?" হাঁপাতে হাঁপাতে জড়িতকণ্ঠে বলল বীরু। এতক্ষণে সে নিজের ক্ষতবিক্ষত দেহের বেদনার্ত্ত প্রতিবাদকে অনুভব করছে।

নণ্ড কোন জবাব দিল না, ক্ষতবিক্ষত মুখটা তুলে একবার সে

বীরুর দিকে তাকাল, একবার তাকাল আর সবার দিকে, তারপরে আকুল কণ্ঠে সে কেঁদে উঠল। পরাজয়, পরাজয়ের অপমানে আর দুঃখে তার বুকটা বোধ হয় ফেটে যাবে।

বীরু তাকে ছেড়ে দিল, মৃদুকণ্ঠে বলল, "কাঁদছিস্ কেন?"

পল্টু বলল, "কাঁদুক না—তোর কি?"

বীরু মাথা নাড়ল, "বাঃ, কাঁদবে কেন? ব্যাটা ছেলেকে কাঁদলে ভালো দেখায় না।" আবার সে নণ্ডুর দিকে তাকিয়ে বলল, "খুব লেগেছে নাকি নণ্ডু?"

নণ্ডু তার হাতটা ঘৃণাভরে সরিয়ে দিল, কান্নায় বিকৃত কণ্ঠে বলল, "আজ না হয় হারলাম কিন্তু তারপর? বাবাকে বলে তোকে আমি জেলে দেওয়াব—তোকে তোর বাপশুদ্ধ তাড়াব এই গাঁ থেকে"—

বীরু হাসল, "তোর বাপই কি পৃথিবীর বড়কর্ত্তা নাকি রে? থাক্ থাক্—বাজে কথা বলে মাথা খারাপ করিস্ না ভাই, এখন থেকে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাক। নে, হাতে হাত দে"—

লাফিয়ে উঠল নণ্ডু, "তোর হাতে কুট হোক তুই মর্, ওলাওঠায় মর"—

বীরু শুধু শক্ত হয়ে দাঁড়াল, কিছু বলল না।

পল্টু চটে গেল, "আবার মার খাবি নাকি রে নণ্ডু! এবার কিন্তু আমার পালা"—

নণ্ডু একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে তাকাল পল্টুর দিকে তারপরে তাকাল আর সবার দিকে। তার চোখেমুখে একটা উগ্র প্রত্যাশা ফুটে উঠল যদি অন্য ছেলেরা তাকে সমর্থন করে, তার পেছনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু না, ওরা সবাই চুপ করেই রইল, কিছু

বলল না। হতাশ হয়ে, ভগ্নহৃদয়ে নণ্ড বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। তার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট, তার নেতৃত্বের মুকুটটা আজ ধুলোকাদায় খসে পড়েছে, সে মুকুট আজ অন্যের মাথায়, একটা ভিখিরী বামুনের ছেলের মাথায়। অপরিসীম দুঃখে, নিদারুণ লজ্জায়, অক্ষম ক্রোধে, দারুণ অপমানে এবং প্রচণ্ড এক জ্বালায় তার মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে হল, ইচ্ছে হল বীরু আর পল্টুর কাঁচা মাথা দুটো চিবিয়ে খেতে, তা নিয়ে ফুটবল খেলতে।

নণ্ড চলে যেতে বীরু তাকাল সবার দিকে, বলল, "কি? আমি কি অন্যায় করেছি?"

সবাই এতক্ষণ চুপ করে ছিল। বিস্ময়ে অবাক হয়ে তারা ভাবছিল যে জমিদারের ছেলেকেও জব্দ করা যায় এবং তাদেরি মত একটি ছেলে তা পারে। এতদিন তারা নণ্ডর বাবার ক্ষমতা এবং নণ্ডর দৈহিক ক্ষমতার ভয়ে চুপ করে ছিল, তাকে সর্দ্দার বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু আর তার দরকার নেই। তারা আজ থেকে বীরুকেই সে আসন দেবে, কারণ শুধু বীরুর গায়ের জোরই নয়, কারণ বীরুর সাহস, ন্যায়ের জন্য শক্তিমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার দুঃসাহস।

ছেলেরা সবাই সমস্বরে বলল, "ঠিক করেছিস্। ঠিক করেছিস্ ভাই।"

যাকে নিয়ে এত কাণ্ড ঘটল সেই মণ্টু কৃতজ্ঞতায় প্রায় কেঁদে ফেলবার উপক্রম করল, বলল, "তোকে যে কি বলব তা ভেবে পাচ্ছি না বীরু—"

বীরু হাসল, ঠোঁটের রক্ত মুছতে মুছতে বলল, "যখন পাচ্ছিসই না তখন আর ভাবিস্ না, চুপ করে থাক্।"

পল্টু বীরুর কাঁধে হাত রাখল, সপ্রশংস দৃষ্টিতে মিষ্টিভাষায় জিজ্ঞেস করল, "খুব বেশী লাগেনি তোরে? এ্যাঁ?"

বীরু মাথা নাড়ল, "না।"

অবশ্য কথাটা সে মিথ্যেই বলল। তার বেশ জোরেই লেগেছে কয়েকটা ঘুষি, কিন্তু যে বন্ধু বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে গেছে, যার চোখে প্রশংসার উজ্জ্বল আলো চক্‌চক্ করছে তাকে যদি সত্য কথা বলে তবে হয়ত তার দামটা একটু কমে যাবে। সুতরাং মিথ্যে কথাই বলা ভালো। লাগলেও না লাগার ভান করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

"চল্ খেলা চলুক"—বীরু বলল সবাইকে।

"চল্ চল্"—

আবার খেলা আরম্ভ হল। জমীদার পুত্রের জন্য তা আট্‌কে রইল না। মিনিট পনেরো কুড়ির জন্য খেলা বন্ধ ছিল। এই মিনিট পনেরোতে কিন্তু একটা বিপ্লব ঘটে গেল অন্যান্য ছেলেদের মনে। পনেরো কুড়ি মিনিট আগে তারা নণ্ডকে তাদের সর্দ্দার বলে ভাবত কিন্তু ঐ সময় কেটে যাওয়ার পরে ব্যাপারটা উলটো হয়ে গেল। নণ্ডুর জায়গায় বীরু গিয়ে দাঁড়াল, ছেলেরা বীরুকেই নিঃশব্দে সে আসনে বসাল।

কিন্তু তারপর?

ব্যাপারটা কি ওখানেই সমাপ্তিলাভ করেছিল?

না। ওর পরে আরো বিশ্রী কাণ্ড ঘটল একটা।

নণ্ডু তার অপমানকে হজম করতে পারল না, বাপকে গিয়ে সে

তিলকে তাল করে লাগাল। সমস্ত ঘটনাটা সে এমনভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে দাঁড় করাল প্রিয়বল্লভবাবুর কাছে যে বীরুই পুরোপুরি দোষী, সেই ষড়যন্ত্র করে মেরেছে তাকে। আর বলল অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গীতে কেঁদে, নিজের দেহের ক্ষতচিহ্নগুলোকে দেখিয়ে।

প্রিয়বল্লভবাবু লোক খুব চালাক, ছেলেকে তিনি চেনেন। তবে নিজের ছেলের দোষটা সব বাপের কাছেই একটু গৌণ হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও তাই হল। তিনি বুঝতে পারলেন যে নণ্ড যাই বলুক একহাতে নিশ্চয়ই তালি বাজেনি, তবে এটা নিশ্চিত যে দোষী বীরুর। তাছাড়া নণ্ড দোষী হলেও সে জমিদারের ছেলে, গরীবের ছেলে হয়ে তাকে মারার আস্পর্দ্ধাটা সত্যি ক্ষমা করা যায় না। সুতরাং—

পরদিন সকালে তিনি হেডমাষ্টারমশাই ও অনন্তকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা সমস্ত শুনলেন।

স্কুল যাবার আগে পর্য্যন্ত বীরু টের পায়নি যে কি ব্যাপার ঘটছে। কারণ সে যখন স্কুলে যায় তখনো অনন্ত বাড়ী ফেরেননি।

সে তা টের পেল স্কুলে গিয়ে।

হেডমাষ্টারমশাই ডেকে পাঠালেন তাকে।

তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি একটা বেত তুলে নিয়ে বললেন, "হাত পাতো—"

"কেন মাষ্টারমশাই ?" ভয়ে ভয়ে প্রশ্নটা করে ফেলল বীরু।

"হাত পাতো, পরে বলছি।" হেডমাষ্টার কঠিন কণ্ঠে বললেন।

হাত পাতল বীরু। সপাং—সপাং। দুটো বেত পড়ল।

"কেন মাষ্টারমশাই ?" চোখে আগুন জ্বলল বীরুর। সে কি দোষ করেছে ?

"তুমি কাল নণ্ডকে মেরেছ বলে।"

"কিন্তু"—

"আমি সব জানি—মণ্টু এবং আর সবাইকে ডেকে আমি শুনেছি সব কথা।"

বীরু চুপ করে রইল, ভাবতে লাগল। সব জেনেশুনেও কেন হেডমাষ্টারমশাই তাকে মারলেন?

হেডমাষ্টার এগিয়ে এলেন, মৃদুকণ্ঠে বললেন, "আমি জানি তোমার দোষ কতটুকু আর সেইজন্যই তোমাকে মারলাম।"

বীরু বুঝতে পারল না কথাটা, সে মুখ তুলল।

"গরীবের ছেলে হয়ে জমিদারের ছেলেকে মারা একটা অপরাধ। সেজন্য গরীবেরা এমনি মার খায় চিরকাল, তারা হয়ত ভাবে যে তাদের দোষ নেই, কিন্তু আসলে তারাই দোষী। গরীব হওয়া একটা দোষ এবং তা জেনেশুনে চিরকাল গরীব হয়ে থাকাটা একটা অপরাধ। সেইজন্যই তোমাকে মারলাম যাতে গরীব হওয়ার জন্য তোমার লজ্জা হয়, দুঃখ হয়, রাগ হয়; যাতে তুমি লেখাপড়া শিখে জমিদারের ছেলেদের চেয়েও বড় হতে চেষ্টা কর, 'গরীব' কথাটা পৃথিবী থেকে দূর করতে চেষ্টা করো। তা যদি না বোঝ, তা যদি না পারো, তবে সারাজীবন এমনি মার খাবে, দোষ না করেও।"

বীরু কথাগুলোকে বুঝল খানিকটা কিন্তু ভালো করে বুঝতে পারল না। তবু হেডমাষ্টারের উত্তেজিত মুখচোখ দেখে, তাঁর এই কথাগুলো শুনে তার কেমন যেন ভালো লেগে গেল। তার মনে পড়ল বাবার সেদিনের কথা, আবার মনে পড়ল যে গরীব হলে শশী ময়রার দোকানের ক্ষীরমোহন আর রসকদম্ব তো দূরের কথা, চিনেবাদাম ভাজাও পেটভরে খাওয়া যায় না। তার ছোট্ট মাথায়

ছোট্ট একটা প্রশ্ন দু'একবার আঘাত করে থেমে গেল—মানুষ কেন গরীব হয়? গরীব হওয়াটা যখন ভালো নয় তখন মানুষ তা দূর করতে চেষ্টা করে না কেন?

"আচ্ছা। এবার যাও।" হেডমাষ্টারমশাই বললেন।

বাড়ী ফিরে গিয়ে বীরু টের পেল যে ব্যাপারটা আরো অনেকদূর গড়িয়েছে। তখন অনন্ত বাড়ী ছিলেন না।

সুমতি ছেলেকে দেখেই চটে উঠলেন, "এই যে, এসেছো! এসো, তোমার কপালে আজ অনেক দুঃখ আছে।"

"কেন?" বীরু থম্‌কে দাঁড়াল। বাড়ী ফিরতেই একি বিভ্রাট!

"কেন? জমিদারের ছেলের সঙ্গে তুই মারা মারি করিস, তোর আস্পর্দ্ধা তো কম নয়!"

"দোষ কার ছিল তা জান?"

"জানলেই বা, সে জমিদারের ছেলে সে খেয়াল আছে রে লক্ষীছাড়া?"

চীৎকার করে উঠল বীরু, "গাল দিয়ো না মা মিছিমিছি"—

মা চুপ করলেন না, বললেন, "যাও, কিছু গিলে জমিদার বাড়ী যাও, নন্তুর বাবা তোমায় ডেকেছেন"—

বুড়ো আঙ্গুল নাচিয়ে বীরু বলল, "ডেকেছেন তো বয়ে গেছে, আমি যাব না।"

"না গেলে পাইক পেয়াদারা এসে ধরে নিয়ে যাবে আর কি। জমিদারের কোপে এখন কি হয় দেখো।"

"দেখব আবার কি—আমি তো সেখানে যাব না।"

হঠাৎ হেডমাষ্টারমশাইয়ের কথাগুলো তার মনে পড়ে গেল। যা

বুঝেছিল তার চেয়ে তখন সে আরো বেশী বুঝল। মা যা বললেন তা হেডমাষ্টারমশায়ের কথার মতই, কিন্তু যাই হোক, সে যাবে না কারো বাড়ী। হয়ত তাকে ধরে মারবেন জমিদার বাবু হয়ত অনেক অপমান করবেন। কিন্তু কেন ?দোষ কার ছিল ? বাঃ, তার দোষ নেই তবু কেন সে মার খাবে, অপমানিত হবে ? সে গরীব ! কিন্তু সে কি মানুষ নয় ? আচ্ছা যদি সে না যায় তাহলে কি হবে ? পাইক পেয়াদা আসবে। না তো বাবা হয়ত তাকে ধরে নিয়ে যাবেন জমিদারের কাছে। না, সে কিছুতেই যাবে না সেখানে, কিছুতেই না।

"বীরু, হাত মুখ ধুয়ে খেতে আয়"—মালতীর সস্নেহ আহ্বান ভেসে এল।

কিন্তু কে খাবে জলখাবার ? যার খাওয়ার কথা তার মাথায় যেন আগুন জ্বলছে, তার মনে তখন নির্য্যাতন, অপমানের ভয় ঢুকেছে সে তখন পা টিপে টিপে বেরিয়ে যাচ্ছে বাড়ী থেকে। সে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকবে, জমিদার, পাইক পেয়াদা আর বাবার নাগালের বাইরে, বুড়ো শিবতলার নির্জ্জনতায়—যেখানে আম জাম কুল আর তালগাছের ভীড়ে দিনের বেলাতেও অন্ধকার হয়ে থাকে যেখানে বুড়ো শিবতলার বুড়ো বটের গা থেকে মুনিঋষিদের জটার মত ঝুরি নেমেছে, যেখানে জানা অজানা পাখীর মেলা বসে আর যেখানে রাশি রাশি ভাঁটফুলের উগ্র সুবাস বিবাগী বাউলের মত বাতাসে ভেসে বেড়ায়। সেইখানেই যাবে বীরু, গিয়ে চুপটি করে বসে থাকবে, মনে মনে ডাকবে বুড়োশিবকে আর বলবে—ঠাকুর আমি কোনো অন্যায় করিনি, তুমি আমায় রক্ষা করো। বলবে, বুড়োবাবা, তুমি নন্তুর একটা চোখ কাণা করে দাও, নন্তুর বাবার মাথা খারাপ করে দাও আর বাবাকে পল্টুর মত ভালোমানুষ করে দাও। দোহাই ঠাকুর, আর কেউ

না জানলেও তুমি তো জানো যে আমার দোষ নেই। এইসবই বলবে বীরু আর বলতে বলতে, ডাকতে ডাকতে কাঁদবে, এমনিতে চোখে জল না এলে চোখে আঙ্গুল ছুঁইয়ে জল এনে কাঁদবে, কাঁদতেই হবে তাকে। কাঁদলে নাকি বুড়োশিব একেবারে অস্থির হয়ে পড়েন, মমতায়, স্নেহে গলে যান, নিজে এসে ভক্তের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

বুড়ো শিবতলার ভাঙ্গা বেদীটাতে চুপ করে বসে ছিল বীরু। যখন সে সেখানে এসেছিল তখন শীতশেষের রাঙা রোদ ছিল সেখানটায় কিন্তু এখন আর তা নেই। এখন অতি দ্রুত একটা অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। নির্ম্মল জলের মধ্যে যেন কে হঠাৎ কালি ফেলে দিয়েছে, অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে সেই কালি, সব কিছুকে কালো করে তুলছে।

গ্রামের পেছনদিকে এই জায়গাটা। অমাবস্যা আর বিশেষ তিথি বা পূজো উপলক্ষেই এখানে লোকজনেরা আসে নইলে আর কেউ সচরাচর আসে না। বটগাছের গুঁড়িকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করেছে বেদীটা, গাছের সঙ্গে হেলান দেওয়ানো আছে একটি পাথরের শিব। একজন বামুনের ওপর ভার দেওয়া আছে, সেই প্রতিদিন অবসর সময়ে কয়েকটা ফুল বেলপাতা ঠাকুরকে দিয়ে যায়। বাকী সময়টা একা একাই থাকেন বুড়ো শিব। কাঠবেড়াল আর শালিক ময়নারা এসে তাঁর কাছে ভক্তি জানিয়ে যায়, বাতাস বইলে গাছপালারা তাঁর বন্দনা গেয়ে ওঠে, তাঁর ওপর শুক্‌নো পাতা ফেলে প্রণাম জানায়।

বুড়ো শিবতলার সামনেই একটা ছোট্ট পুকুরের মত আছে—এখন সেটার জল কমে এসেছে। তাতে আছে নীল-পাপড়িওয়ালা

কলমিফুল আর গুড়ি পানা, শ্বেতপদ্ম আর শ্যামাঘাস। হাওয়ায় ভেসে আসছে পুকুরের জল, উদ্ভিদ আর মাটির গন্ধ। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল। ঝিঁ ঝিঁ পোকারা ডাকতে আরম্ভ করেছে, শুক্‌নো, ঝরা পাতার ওপর দিয়ে বাতাস গড়িয়ে যাচ্ছে।

এমনি সময়ে কে যেন শুক্‌নো পাতা দলে পিষে সশব্দে এসে হাজির হল সেখানে।

"বীরু"—

বীরু চুপ করে বসে ছিল আর কাঁদবার চেষ্টা করতে করতে বুড়ো শিবকে ডাকছিল একমনে। হে বাবা বুড়োশিব তোমার দয়া কি হবে না? তোমার বিষয়ে কত গল্প শুনেছি, শুনেছি কত অদ্ভুত ঘটনার কথা। কিন্তু একি? আমার বিপদের কথায় তো তোমার সাড়া পাচ্ছি না—তবে?

আর ঠিক এমনি সময়ে ডাক শোনা গেল—"বীরু"—

চমকে উঠল বীরু। কে ডাকছে? বুড়োশিব? বুড়োশিব কি এসেছেন তাঁর দুঃখে বিগলিত হয়ে। কিন্তু বাবার মত গলা কেন তাঁর? তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে, দেবতারা ইচ্ছে করলে তো সবার রূপ ধারণ করতে পারেন, অবিকল তাদের মতই কথা বলতে পারেন।

"বীরু"—

বীরু তাকাল পেছন দিকে। কিন্তু একি! এ যে বাবা! কিন্তু কে জানে বুড়োশিবও হতে পারেন!

"বাবা—তুমি!"

"হ্যাঁ"—

"সত্যি তুমি!"

"কি সব কথা বলছিস পাগলের মত—আয় আমার সঙ্গে"—অনন্ত ছেলের হাতটা চেপে ধরলেন।

বুড়োশিবের দিকে অসহায় একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল বীরু। ঠাকুর না হাতী, কচু, হুঁঃ—। কিন্তু এইটুকু ভেবেই সে নিজেকে দমন করল। না বাবা, অমনভাবে গাল দেওয়া উচিত নয়। কে জানে দেবতা মানুষ, এতে চটে না যায়। বুড়োমানুষ রেগে গেলে ফল ভালো হবে না। না না, বুড়োশিবের তুলনা নেই। বুড়োশিবের দয়ার তুলনা নেই, আর বীরু তাকে সত্যি ভক্তি করে, ভয় করে।

"চল"—

অনন্ত ছেলের হাতে টান দিয়ে এগোলেন।

আশা নিরাশার মাঝখানে পড়ে কাহিল অবস্থা হল বীরুর। কি আছে বাবার মনে? মারবেন? জমিদারবাবুর কাছে নিয়ে যাবেন? না, সে মার খাবে, মার খেয়ে মরে যাবে, তবু সে সেখানে যাবে না। সে কোনো অন্যায় করেনি, কিছুমাত্র না।

ক্ষেতের ধারে গিয়ে পৌছুল ওরা। ওদিকে শঙ্খ ঘণ্টা আর কাঁসরের শব্দের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। হাল্‌কা অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে কাঞ্চনপুরের আকাশে, মাঠে, ঘাটে। আকাশের জানালা খুলে দু'একটা নক্ষত্র উঁকি মারছে। বুড়ো শিবতলায় হয়ত আগুনের ফুলকির মত এখন জোনাকিরা জ্বলছে। আঃ অপরূপ!

"বীরু"- অনন্ত থামলেন।

"উঁ?" বীরু চমকে উঠল।

"এখানে বোস্।"

দু'জনে বসল।

অনন্ত ছেলের দিকে তাকালেন, গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "জমিদারবাবু

আমাকে ডেকে তোর নামে অনেক কিছু বলেছেন, তোকে ডেকেও পাঠিয়েছেন তিনি।”

বীরুর গলা শুকিয়ে গেল, বাবার কণ্ঠস্বরও কেমন যেন শুক্‌নো, কঠিন। অবস্থা ভাল না।

অনন্ত বললেন, “তুই আমাকে কি শান্তি পেতে দিবি না ?”

আর চুপ থাকলে চলবে না। বীরু মরিয়ার মত বলল, “কিন্তু বাবা”—

অনন্ত তার কথা শেষ হতে দিলেন না, বললেন, “বুঝেছি। তুই কিছু বলতে চাস্”—

“হ্যাঁ”—

“বল্। কিন্তু সত্য কথা বলতে হবে।”

“বলব।”

সব বলল বীরু। একটুও অতিরঞ্জিত করল না সে, প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত যা যা ঘটেছিল তা সে সবই খুলে বলল।

অনন্ত মন দিয়ে শুনলেন সব কথা। শোনা শেষ হলে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন ছেলের দিকে, যেন ছেলের অন্তরটাকে তন্ন তন্ন করে দেখবার চেষ্টা করলেন।

“সত্য কথা বললি তো ?”

কেমন যেন একটু আশ্বাস জন্মাল বীরুর মনে, বাবার ভঙ্গীতে উৎসাহিত হয়ে সে বলল, “সত্য বলছি—মা কালীর দিব্যি”—

“থাক্ থাক্, দিব্যির দরকার নেই, এমনিতেই হবে।”

নিস্তব্ধতা।

কি হল ? অনন্তের মত কি ? বীরু উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাল বাপের মুখের দিকে। কি ভাবছেন বাবা ? বাবার কাছে সে দোষী না নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হল ?

নিস্তব্ধতা।

না বাবা কিছুই বলছেন না !

বীরু ভয়ে ভয়ে ডাকল, "বাবা"—

"কি ?"

"আমি কিন্তু যাবনা নণ্ডদের বাড়ী"—

"যাবিনা ?"

"না।"

"আচ্ছা না গেলি।"

"সত্যি বলছো !" অবাক হয়ে গেল বীরু। বাবার কাছে কিন্তু এ জবাব সে মোটেই আশা করেনি।

অনন্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবেই বললেন, "হ্যাঁ—তোকে আর যেতে হবে না। আমি বুঝেছি যে আসলে দোষ তোর নয়।"

বীরুর নিঃশ্বাস এতক্ষণে সহজ হল, হঠাৎ তার মনে হল যে পৃথিবীতে সবাই তার শত্রু নয়, বাবা বাইরে থেকে যতই গম্ভীর মনে হোক ভেতরে ভেতরে তিনি লোকটি খুব ভালো। আর, আনন্দে বুকটা ফুলে উঠল বীরুর।

"কিন্তু শোন্"—অনন্ত বললেন।

বীরু তাকাল।

"দোষ তোর নয় বলেই তোকে ছেড়ে দেওয়া যায় না"—

মানে ? এ আবার কি ?

"নণ্ডর সঙ্গে মারামারি করাটা তোর অন্যায় হয়েছে—সুতরাং তোকে শাস্তি পেতে হবে—দে, নাকে খৎ দে।"

"মানে ?"

"নাকে খৎ দে"—

"বাঃ—ও যে"—

"নাকে খৎ দে"—

"এখানে যে এব্ড়ো থেব্ড়ো মাটি—ধূলো !"

"তবু দিতে হবে—এ তোমার শাস্তি"—

যাক্‌গে নাকের ওপর দিয়েই ব্যাপারটা যখন সমাপ্তিলাভ করছে তখন ও বিষয়ে আপত্তি বা তর্ক আর করবে না বীরু। নিশঃব্দে সে বাবার আদেশকে পালন করল।

"বাড়ী চল্ এবার জমিদারবাবুকে যা বলবার আমিই বলব।"

বাপের পেছনে পেছনে চলল বীরু। আল বেয়ে বেয়ে। একটু হাল্কা কুয়াশা জমা হয়েছে চারদিকে। পায়ের নীচেকার ঘাস নরম, ঠাণ্ডা। আকাশে কয়েকটা তারা। দূরে কে যেন গাইছে। আব্ছা আলোতে সামনের উঁচুনীচু, সিঁড়ির মত ক্ষেতের ধাপগুলো আর দূরবর্ত্তী বাড়ী ঘর আটচালাগুলোকে কেমন যেন অবাস্তব মনে হচ্ছে। রাত এলো। দিনের পরিচিত পৃথিবীটা হঠাৎ যেন একটা রহস্যালোকে পরিণত হচ্ছে, হঠাৎ যেন রূপকথার দেশটা জেগে উঠছে।

নগুর বিষদাঁত ভেঙ্গেছে, ধনঞ্জয়বাবু ছাড়া আজকাল আর কেউ খাতির করে না। মনে মনে সে শুধু কেউটের মত ফোঁস করে, নিষ্ফল আক্রোশে চেয়ে চেয়ে দেখে যে কিছুদিন আগেও যারা তার কথায় উঠত বসত, তাকে অনুসরণ করত সেই সব ছেলেরা আজ বীরু ছাড়া আর কিছুই জানে না, নগুর দিকে তারা আর ফিরেও তাকায় না।

কিন্তু বীরু, পল্টু এবং অন্যান্য ছেলেদের মনে শান্তি নেই। ধনঞ্জয় বাবুর অত্যাচার ক্রমেই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তাঁকে না থামালে আর চলছে না। কিন্তু কি উপায়ে?

স্কুলের পেছনকার বড় তেঁতুল গাছ্‌টার নীচে প্রায়ই ওদের আড্ডা বসে, আলোচনা হয়। কিন্তু কোনো সুরাহাই হয় না, ধনঞ্জয়বাবুর গাট্টা অবাধেই চলতে থাকে।

হঠাৎ সেদিন পল্টু বীরুকে বলল, "টিফিনের সময় তোকে একটা কথা বলব।" চাপা একটা হাসি ঝিলিক্ দিয়ে উঠল তার ঠোঁটের কোনে, ছোট ছোট চোখ দুটো একটা দুষ্ট কল্পনার ভারে বুজে এল।

টিফিনের সময় বাইরে এল দুজনে।

একপাশে নিয়ে গিয়ে পল্টু বলল, "একটা উপায় ঠাউরেছি রে বীরু"—

"কি?" বীরু ঠিক ধরতে পারল না।

"গাট্টাওয়ালাকে এবার খাট্টা করতেই হবে।"

"কিন্তু কি করে?"

এই বলে বীরুর কানে কানে পল্টু যা বলল তা শুনে বীরু হিহি করে হেসে উঠল। সে হাসি আর থামতেই চায় না, হেসে প্রায় কুটিপাটি হবার জোগাড় হল। আর পল্টু তার দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগল। তার মৎলবটা বীরু মেনে নেওয়ায় সে খুশী হয়ে উঠল, তাই বীরুর হাসির সঙ্গে হাসি মেলাতে গিয়ে তার ছোট চোখদুটো বুজে এল।

তারপর দিন তিনেক দু'জনে খুব ব্যস্ত রইল। প্রতিটি বন্ধুর বাড়ীতে যায় তারা, কি সব পরামর্শ করে তারাই জানে! শুধু

সবাই মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে আর তাদের কথা শুনে আর বলে 'সাবাস্‌', 'সাবাস্‌ ভাই' !

তারপর সেদিন সেকেণ্ড পিরিয়ডে এক মজার কাণ্ড হল।

ধনঞ্জয়বাবু তাঁর ঐরাবতের মত ভারী দেহটিকে চেয়ারে এলিয়ে দিলেন। লালচে চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত ছেলেদের যেন সম্মোহিত করার চেষ্টা করে তিনি হাঁকলেন, "টাস্ক্‌ নিয়ে আয় সবাই"—

প্রথম থেকে একজনের পর একজন করে উঠে আসতে লাগল। আরম্ভ হল ধনঞ্জয় বাবুর হাতের সুখ। অর্থাৎ গাট্টার পরিবেশন। আর তর্জ্জন গর্জ্জন, সবাইকে বিচিত্র বিচিত্র জন্তু জানোয়ারের নামে ডাকা। গরুড়, প্যাঁচা, শকুন, চিল, চামচিকে, গরু, গাধা, কুকুর, শিয়াল, ভালুক, আর ওরাং ওটাং।

হঠাৎ ধনঞ্জয়বাবু একটু নড়ে বসলেন।

ছেলেরা একের পর এক আসছে।

পল্টু আর বীরু নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে আছে ধনঞ্জয়বাবুর দিকে। তাঁর নড়ে ওঠা দেখে তারাও একটু নড়ে বসল, তাদের জ্বলজ্বলে চোখগুলো আরো জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল, কৌতূহলের সপ্রশ্ন ভাষা তাতে লিখিত হল।

আবার নড়ে উঠলেন ধনঞ্জয়বাবু, এবার কাৎ হয়ে !

একের পর এক ছেলেরা আসছে খাতা নিয়ে। ধনঞ্জয়বাবুর মেজাজ আজ ভারী খারাপ। সে মেজাজ তার গাট্টা আর ক্ষুরধার জিভ্‌ থেকে বেরোতে থাকে।

আবার সেই গজ-বিনিন্দিত বিরাট দেহটি নড়ে উঠল।

পল্টু আর বীরুর মাথা নীচু হয়ে গেছে, মুখে হাতচাপা দিয়ে তারা হাসি চাপবার চেষ্টা করছে। প্রাণপণে।

হঠাৎ ধনঞ্জয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন, এদিক ওদিক তাকিয়ে তিনি পলটু আর বীরুর উপর নজর ফেললেন। তাঁর ললাটে তখন কালসাপের মত কুটিল কতকগুলো রেখা দেখা দিয়েছে, চোখের লাল্‌চে শিরগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ক্লাসটাকে কাঁপিয়ে তিনি ডাকলেন, "পলটু, বীরে—ইদিকে আয়—"

এমন জোরে হাঁক পাড়লেন তিনি যে ছেলেদের প্লীহা মানে পিলে তো চম্‌কে উঠলই এমন কি দেয়ালের একজায়গায় আলগা চূণ-সুড়কী খানিকটা খসে পড়ল।

"কেন মাষ্টারমশাই ?" বীরু সেখান থেকেই প্রশ্ন করল।

এবার কণ্ঠস্বরকে খুব মধুর করে ধনঞ্জয়বাবু বললেন, "ইদিকে আয় না—বল্‌ছি।"

তাঁর কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যকে ওরা বিশ্বাস করল না বটে কিন্তু তবু তাদের উঠে কাছে আসতে হল।

ধনঞ্জয়বাবু টেবিল থেকে বেতটা তুলে নিলেন, বাতাসকে দু'তিনবার সশব্দে আঘাত করে তিনি বললেন, "হাত পাত্—রসকদম্ব খাওয়াব তোদের"—

"কেন মাষ্টারমশাই ?" বীরু প্রশ্ন করল।

"কেন ?" বিশ্রী একটা ভেংচী কাটলেন ধনঞ্জয়বাবু, "কেন ? খেলেই টের পাবি। পাত, হাত পাত হারামজাদারা"—

ধনঞ্জয়বাবুর গলায় যেন বাজ লুকোনো আছে, তার শব্দে যেন দেয়ালের চুণ-সুড়কী আবার খসে পড়বার উপক্রম করল।

বীরু হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল, হাত দুটোকে পেছনদিকে সে বলল, "কি করেছি তা না বলে কেন মারবেন মাষ্টারমশাই ?"

"আমার খুশী"—

"না।"

"হাত পাত্ বলছি"—

এবার পল্টু যোগ দিল, "না, আমরা হাত পাতব না।"

"পাত্বি না?" রাগে কেঁপে উঠলেন ধনঞ্জয়বাবু, যেন ভূমিকম্পের ফলে একটা ছোট পাহাড় নড়ে উঠল।

"না"—একসঙ্গে দু'বন্ধু জবাব দিল। পরিষ্কার জবাব।

"বটে!" হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেলেন ধনঞ্জয়বাবু, এলোপাথাড়ি দুজনের ওপর বেত চালাতে চালাতে তিনি বললেন, "বল্—আর কখনো ছারপোকা এনে চেয়ারে ছেড়ে দিবি? এঁ্যা? এঁ্যা?"

আত্মরক্ষা করতে করতে বীরু বলল, "ছারপোকা!"

"হ্যাঁ রে শুয়ার—কিছুই জানো না নাকি?

"না তো—"

"বটে!" সমানে মেরে চললেন ধনঞ্জয়বাবু।

"হ্যাঁ বাঃ, মারছেন কেন খামোখা?" বীরু এবার উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বলল।

"চোপ্—চোপ্ বলছি। মারবো না? সারা গাঁয়ের ছারপোকা নিয়ে এসে এই চেয়ারে ঢেলেছিস্ আর তোদের ছেড়ে দেব! উঃ— বসতে বসতেই পিল্ পিল্ করে সবগুলো তেড়ে এসেছে—ওদের কামড় এখনো জ্বলছে আগুনের মত—বাপ্! আর এখন সাধু সাজা হচ্ছে! গাধা, উল্লুক, বাঁদর, হনুমান্—"

হঠাৎ পল্টু ছিট্‌কে একপাশে সরে গেল, একটা হাত নেড়ে সে বলে উঠল, "আমরা কিচ্ছু জানি না—আপনি যদি আবার মারেন তাহলে কিন্তু আমরা হেডমাষ্টারমশাইকে বলে দেব —"

আশ্চর্য্য ফল হল এই কথায়, ধনঞ্জয়বাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। তাঁর মনে পড়ল যে হেডমাষ্টারমশাই এসব মারধোর বেশী পছন্দ করেন না, আর তা ছাড়া প্রমাণ কই? যা মেরেছেন মেরেছেন, এখন থামাই ভালো। তাই করলেন তিনি।

"তোরা ছারপোকা এনে ছেড়ে দিস্‌নি চেয়ারে?"

"না—আপনি কি দেখছেন তা?" বীরু জবাব দিল।

"ছারপোকা পাবো কোথায় আমরা—ওসব তৈরী করার কি কোনো কল আছে আমাদের?" পল্টু যোগ দিল বীরুর সঙ্গে।

"চোপ্" ধনঞ্জয় বাবু ধমকে উঠলেন, "ইয়ার্কি দিবি তো জিভ্ উপ্‌ড়ে ফেলব তোদের। প্রমাণ? ঠিক প্রমাণ খুঁজে বের করব, আমি জানি যে ওসব ছারপোকা তোরা দুজনেই এনেছিস্, নইলে একদিনেই এত রক্তচোষা আম্‌দানী হল কোথেকে? আচ্ছা, আজ তো একপর্ব্ব হল—আজকের মতো ছেড়ে দিলাম—পরে আবার হবে অন্যদিন।

সমস্ত শরীরটা এখন বেদনার্ত্ত প্রতিবাদ জানাচ্ছে, রাগে ফুলতে ফুলতে দু'জনে নিজেদের সীটে ফিরে গেল। ক্লাসের অন্য সবাই গম্ভীর। শুধু নন্তু মুচ্‌কী হাসছে। তার দুই শত্রুর এই নির্য্যাতন দেখে সে পরম তৃপ্তি পেয়েছে, তার দু'চোখে একটা উৎকট উল্লাস ফুটে উঠেছে তাদের বেত্রাহত হতে দেখে।

বেতের ঘায়ে শরীরটা জর্জ্জর হয়ে উঠেছে। রাগে পল্টু আর বীরুর দাঁত-গুলো কড়মড় করে ওঠে, কিন্তু তবু একটা কথা মনে পড়ায় হাসি পায় ওদের। ধনঞ্জয়বাবু যখন ছারপোকার কামড়ে অস্থির হয়ে লাফিয়ে উঠেছিলেন সেই সময়কার ছবিটা ওদের মনে পড়ে। যাক্, একটা কিছু করা গেছে। এতেও যদি

লোকটা জব্দ না হয় তবে এবার কতগুলো তেঁতুলে বিছে এনেই চেয়ারে ছাড়তে হবে। হ্যাঁ তাই।

উঠে পড়ে লাগল যেন দুজনে।

তার পরদিন।

টিফিন পিরিয়ডে স্কুলের পেছনকার বাগানে বীরু সবাইকে ডেকে বলল, "এই—তোরা গান শুনবি?"

সবাই অবাক হল, "গান? তার মানে?"

বীরু মুচ্‌কী হাসল, "গম্ভীরা গান আমি গাইব—"

"বটে! শুনব—"

গোল হয়ে শুকনো পাতা আর ঘাসের ওপর বসল সবাই।

বীরু পল্টুর দিকে তাকাল, "তোকে কিন্তু দোহারকী করতে হবে পল্টু?"

মনটু প্রশ্ন করল "গান লিখেছে কে?"

বীরু মাথা নেড়ে বলল, "আমি।"

সবাই উৎসুক হয়ে উঠল, "বটে! বটে! তাহলে গা—"

বীরু হাসল, "আচ্ছা গাইছি। কিন্তু মন দিয়ে শুনবি সবাই, হাসবি না' খবরদার—"

"আচ্ছা—আচ্ছা—"

কেশে গলাটাকে পরিষ্কার করে নিল বীরু। তারপরে বাঁ হাতটা কোমরে দিয়ে ডান হাতটা দিয়ে ডান কান চেপে ধরল। চৈত্র-সংক্রান্তির রাতে জোতদার লক্ষ্মণ বোসের বাড়ীতে ওস্তাদ

সুদাম পালকে যেমন অঙ্গভঙ্গী করে সে গম্ভীরা গাইতে দেখেছিল ও শুনেছিল তেমনি হাত পা নেড়ে, সুর করে, নেচে নেচে সে গাইতে সুরু করল।

বীরু গাইতে লাগল, পল্টু দোহারকী দিতে লাগল আর ছেলেরা হাসতে হাসতে দু'হাতে কোমরে চেপে ধরে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

"হি হি হি—হি হি হি"—একটানা শব্দ উঠতে লাগল।

"কি রকম নাচছে আর মুখ ভেংচাচ্ছে হি হি হি—"

"ঠিক সুদাম পালের মত—হি হি হি—"

বীরু সহাস্যে ধমক দিল, "এই হাসিস্ না মাইরি, তোদের হাসি দেখে যদি আমিও হেসে ফেলি তাহলে আর গাইব কি করে?"

"ঠিক—ঠিক—তুই গা"—স্যোৎসাহে সবাই বলে উঠল।

বীরু আর পল্টু গানে ব্যস্ত আর ছেলেরা তা তন্ময়চিত্তে শুনতে ব্যস্ত। আর এমনি সময়ে একটা কাণ্ড ঘটল।

ধনঞ্জয়বাবু যাচ্ছিলেন বাগানের পূবদিকের রাস্তাটা দিয়ে। রোজ টিফিনের সময় তিনি বাড়ী যান, বাড়ীটা খুব কাছেই বলে তিনি এই সময়টা গিয়ে জলখাবারের পর্ব্বটা সেরে আসেন, যাতায়াতে মাত্র মিনিট সাতেক সময় লাগে তাঁর। আজও বাড়ী যাচ্ছিলেন তিনি। আর ঠিক সেই সময়েই যেতে যেতে তিনি ছেলেদের দেখতে পেলেন। তাঁর কৌতূহল হল। ছেলেরা হাসছে, বীরু আর পল্টু বিকট অঙ্গভঙ্গী করে গাইছে, ব্যাপার কি? তিনি এগোলেন কিন্তু পাছে তাঁকে দেখে ওদের জলসাটা ভেঙ্গে যায় এইজন্য তিনি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালেন। যা দেখলেন তাতে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ বারুদের মত জ্বলে উঠল, যা শুনলেন তাতে তার পাহাড়ের

মত শরীরটা রাগে থরথর করে কেঁপে উঠল, তাঁর ড্যাবডেবে চোখের লাল্‌চে শিরগুলো আরো লাল হয়ে উঠল, প্রায় জ্ঞান হারাবার উপক্রম হল তাঁর। বীরু তখন গাইছে ;

ভোলা হে,
কি কহিমু, কহনে না যায়
বোবা হইল ভাষা মোর, কথা না জোগায়।
ধনঞ্জয়ের কথা বলি শুন শুন সবে,
মন দিয়া শুইনলে পরে বড় মজা পাবে।
হাতী, মোষ, কোলাব্যাঙ্‌ একসাথে কে জানো?
সে আমাদের ধনঞ্জয় সে আমাদের ধনো॥
লজ্জাহীনের সজ্জা যেমন তেমনি মেজাজ,
ক্লাসে আইসা নিদ্রা যায় আর কিবা কাজ।
দোষ নাই, তবু সবাই মিথ্যা মাইর খায়,
'কড়াপাকের সন্দেশ' খায়া বলে 'হায় হায়'।
ভোলা হে,
কি কহিমু, কহনে না যায়—

হি হি হো হো একটা হাসির রোল উঠতে লাগল ছেলেদের মাঝখান থেকে আর অদৃশ্য একটা চাবুক এসে যেন সশব্দে ধনঞ্জয়বাবুর মুখের ওপর পড়তে লাগল।

তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না, গাছের আড়াল থেকে সবেগে ছুটে বেরোলেন তিনি। কালবৈশাখীর মত, মস্ত একটা বুনো হাতীর মত, একটা অপ্রত্যাশিত ধূমকেতুর মত তিনি গিয়ে ছেলেদের মাঝখানে পড়লেন তারপরে বীরুর মাথার চুলের গোছা ধরে দু'হাতে যেন ঢোলক পিটতে লাগলেন।

যে সব ছেলেরা বসে বসে হাসছিল তারা মুহূর্তে যে যেদিকে পারল অদৃশ্য হল। তার পরের ব্যাপারটা না বলাই ভালো।

ধনঞ্জয়বাবু যেন ক্ষেপে গিয়েছেন। নিজে যতটা পারলেন শাস্তি তো দিলেনই তার পরেও তিনি হেডমাষ্টারমশাইকে গিয়ে নালিশ করলেন।

হেডমাষ্টারমশাই ডেকে পাঠালেন বীরুকে।

"বীরু"—

"আজ্ঞে"—

"তোমায় নিয়ে তো মহাবিপদ হল"—

বীরু চুপ করে রইল। কিন্তু তার মাথায় তখন একটা আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণ চলছে। সে কিছু খারাপ কাজ করে বসবে, খুন করবে, কালাপানি যাবে, আর অতটা না পারলে তেঁতুলে বিছে যোগাড় করবে। প্রতিহিংসার একটা রক্তাক্ত ছবি তখন তার চোখের সামনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

"কি করেছ সব খুলে বল দেখি"—

বীরু চুপ।

"বল—ভয় নেই।"

হেডমাষ্টারমশাইয়ের চোখের তারাগুলো যেন নেচে উঠল, তিনি প্রশ্ন করলেন, "অঙ্কের মাষ্টারমশাইয়ের ওপর তোমার এত রাগ কেন?"

বীরু একটু সাহস সঞ্চয় করে বলল, "তিনি যে ভয়ঙ্কর মারেন।"

"হুঁ—আচ্ছা কি গান গেয়েছিলে বলো তো"—

বীরু লজ্জা পায় বলতে।

"তুমি গানটা তৈরী করেছিলে?"

"আমি—না—মানে—হ্যাঁ"—

"আচ্ছা শোনাও"—

"আর এমন কাজ করব না মাষ্টারমশাই"—বীরু ভয় পেল।

হেডমাষ্টার অভয় দিলেন, "আমি কিচ্ছু বলব না—শোনাও তুমি।"

আর উপায় নেই, ক্ষীণকণ্ঠে সমস্ত গানটা আউড়ে গেল বীরু। হেডমাষ্টারমশাই মন দিয়ে শুনতে লাগলেন তা তার গোঁফের আড়ালে একটা ক্ষীণ হাসি ঝিক্‌মিক্ করে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তা দমন করলেন তিনি, কেশে তা চেপে দিয়ে তিনি বললেন, "বটে! হুঁ"—

বীরু মাথা নীচু করে একটা কিছু ভয়ঙ্কর প্রত্যাশা করতে লাগল। ক'টা বেত খাবে সে কে জানে।

হেডমাষ্টার মশাই বললেন, "আর কখনো এমন গান তৈরী কর্বে না বা গাইবে না—বুঝলে ?"

মাথা নেড়ে বীরু জানাল যে সে বুঝেছে।

"ধনঞ্জয়বাবুর কাছে মাফ্ চাইতে হবে।"

"আচ্ছা"—

"রোজ ছ'পাতা করে হাতের লেখা এনে আমায় দেখাবে।"

"আচ্ছা।"

হেডমাষ্টারমশাই আড়নয়নে তাকালেন ছাত্রের দিকে। থম্‌থম্ করছে সেই দুরন্ত বিদ্রোহীর মুখ। তিনি এগিয়ে গেলেন বীরুর দিকে, তার কাঁধে একটা হাত রেখে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "এমন কাণ্ড আর কখনো করো না বীরু, তোমায় বড় হতে হবে, ভালো হতে হবে। বুঝলে ? আচ্ছা, এবার যাও—"

বাঁচা গেল বাবা! বীরু তাড়াতাড়ি এগোল।

"শোন্ বীরু"—হেডমাষ্টারমশাই আবার ডাকলেন।

আবার কিরে বাবা!

বীরু ফিরে তাকাল।

"কাছে এসো।"

বীরু কাছে গেল।

হেডমাষ্টার তার দিকে জলজলে চোখ মেলে তাকালেন, হঠাৎ ভারী মিষ্টি হাসি বেরিয়ে এল তার পরিপুষ্ট গোঁফের আড়াল থেকে, তিনি হেসে বললেন, "যাই হোক্, গানটা কিন্তু তুমি মন্দ তৈরী করনি বীরু—হুঁ—মন্দ নয়"—

বটে! হেডমাষ্টারমশাইও শেষে! হি হি হি। হঠাৎ ফিক্ করে হেসে ফেলল বীরু।

"উহুঁ—হাসি না, যাও, বেশ গম্ভীরমুখে ক্লাশে চলে যাও"—হেডমাষ্টারমশাই বললেন।

"আচ্ছা মাষ্টারমশাই"—

হঠাৎ মনটা খুশী হয়ে উঠল বীরুর, ভারি আনন্দ হল তার। হেডমাষ্টারমশাই লোকটা তো বেশ, সত্যি। বড় বড় পা ফেলে সে ক্লাসের দিকে চলল। চলতে চলতে বাইরের দিকে তাকাল। খররৌদ্রের নীচে ধূলোর ঘূর্ণি রচনা করে পশ্চিমা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। বসন্তকাল এল বলে। নতুন পাতা গজাবে, আমের মুকুলের গন্ধে বাতাস মাতাল হবে আর রক্তের মত লাল পলাশ ফুটবে রাশি রাশি। পশ্চিমা বাতাসের মধ্যে সেই আসন্ন বসন্তের ডাক। ঘর ছেড়ে বেরোতে ডাকছে। অচেনাকে চিনবার, অজানাকে জানবার জন্ত ডাকছে। আয় বীরু, আয়, আয়, আয়, আয়—

ধনঞ্জয়বাবু ওখানেই থামেননি, তিনি অনন্তের কাছে গিয়েও আবার নালিশ করেছিলেন বীরুর বিষয়ে। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ী ফিরেই তা টের পেল বীরু।

"বীরু"—

বাবার ডাক শুনেই বীরু বুঝল যে ব্যাপারটা সুবিধের নয়, গম্ভীরা গাওয়ার জেরই সুরু হবে নতুন করে।

"আজ্ঞে"—

"এদিকে এসো"—

বীরু ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও গিয়ে হাজির হল বাবার কাছে। সুমতিও ছিলেন ঘরের ভেতর।

"বীরু—তুমি আজ স্কুলে যা করেছ তা আমি শুনেছি"—

সুমতি বললেন, "ছিঃ বাবা, তুই কি একটুও শান্ত হবিনে?"

বীরু চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করল।

অনন্ত বললেন, "তোকে কতদিন বলব বাবা যে তুই গরীবের ছেলে, তোকে লেখাপড়া শিখে আমাদের দুঃখ দূর করতে হবে, মানুষ হতে হবে? কিন্তু তুই তো একটা কথাও কানে তুলিস্‌না। আজ তুই যে কাণ্ড করেছিস তা ভারী খারাপ—আর ওইরকম গল্প তৈরী করে মাষ্টারদের কি উপহাস করতে হয়—ছিঃ"—

বীরুর অভিমান হল, সমস্ত পৃথিবীই কি ঐ এক কথা বলবে! কিন্তু না, হেডমাষ্টারমশাই তো শেষ পর্য্যন্ত ওকথা বলেননি!

সে বলল, "কিন্তু হেডমাষ্টারমশাইয়ের তো আমার গানটা ভালোই লেগেছে"—

"ভালো লেগেছে! বটে!"

"হ্যাঁ—তিনি বলেছেন সে কথা"—

সুমতি ছেলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।

অনন্ত কট্‌মট্‌ করে তাকালেন, "হেডমাষ্টারমশাই যাই বলুন—আমি বলব না তা। আমি বলব যে তুমি অন্যায় করেছ আর তার জন্যে তোমায় শাস্তি পেতে হবে।—নাও, নাকে খৎ দাও দু'হাত"—

"বা রে—আমি—ইয়ে"—হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বীরু প্রতিবাদ জানাল।

সুমতি সহানুভূতি জানালেন, "থাক্‌ থাক্‌, ছেড়ে দাও আজ"—

"উঁহুঁ—তুমি এর মধ্যে এসো না"—অনন্ত মাথা নাড়লেন, "ছেলেপিলেদের আস্কারা দেওয়াটা আমি পছন্দ করি না। দে বীরু, নাক খৎ দে—দে"—

"নাকে লাগে যে—জ্বলে"—নাকি সুরে টেনে বলল বীরু, আড়নয়নে তাকাল মায়ের দিকে আরো সহানুভূতির প্রত্যাশায়। কিন্তু সুমতি আর কিছুই বললেন না।

অনন্ত খুব গোঁয়ার লোক, অবশ্য বীরুর মত তাই, কারণ তিনি বললেন, "লাগুক, জ্বলুক, তবু তোমাকে নাকে খৎ দিতে হবে"—

অগত্যা তাই করতে হল বীরুকে। খুব তাড়াতাড়ি এই লজ্জার হাত থেকে বাচবার জন্য সে ত্বরিৎবেগে নাকটা ঘষল। কিন্তু ফলটা খারাপ হল, খাড়া নাকের ডগাটার একটু চামড়া উঠে গেল, বেশ জ্বালা করতে লাগল সেটা।

সুমতি বলে উঠলেন, "আহা, লাগল না কিরে?"

"না"—বলেই ছিট্‌কে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বীরু। ইঃ, মায়ের ভালমানষী কত! ডান, মিট্‌মিটে ডান একটি। আর বাবা? একনম্বরের গোয়ার গোবিন্দ—এক্কেবারে ইয়ে।

"ডাকাত!" কথাটা উচ্চারণ করে বীরু উঠে এল বিছানা থেকে, দিদির পাশে এসে দাঁড়াল, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকটা ভরে উঠল তার, সে বলল, "তাহলে কি হবে রে দিদি ?"

মালতী হাসল, "কি আবার হবে আমাদের ? আমরা গরীব মানুষ, আমাদের বাড়ীতে ওরা আসবে না—তুই চুপ করে বসে থাক।"

"তবে ওরা কাদের বাড়ীতে যায় ?"

"বড়লোকদের বাড়ী"—

বাইরে ধাবমান লোকদের পদশব্দ ধ্বনিত হল।

দরজায় করাঘাত হল।

"মালতী"—অনন্ত ও সুমতি ডাকছেন।

মালতী দরজা খুলল।

"ভয় পাস্‌নি তো ?" অনন্ত হাসলেন।

মালতী মাথা নাড়ল।

আবার কোলাহল ধ্বনিত হল, "গেল—গেল—ধর—ধর"—

মালতী জিজ্ঞেস করল, "কার বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে বাবা ?"

অনন্ত বললেন, "দেখে আসি—তোরা ভয় পাস্ না"—

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কাটতে লাগল। অবশেষে একসময়ে সেই বিকট কোলাহল শান্ত হয়ে এল।

আরো কিছুক্ষণ পরে অনন্ত ফিরে এলেন।

"কার বাড়ীতে ?" সুমতি প্রশ্ন করলেন।

"ক্ষিতীশ ঘোষের বাড়ী—ওদের সঙ্গে একটা বন্দুক ছিল, এসেছিল প্রায় জন দশেক লোক"—

"কি কি নিয়ে গেছে ?"

"টাকাকড়ি গয়নাগাটি সব"—

সবাই চুপ করে রইল।

বাইরে শেষরাত্রির বাঁকা চাঁদ। কুয়াশা আছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকারা ডাকছে। ডাকছে তক্ষক। লাউকুমড়োর মাচার মধ্যে গিরগিটিরা খস্‌খস্‌ শব্দ তুলে চলাফেরা করছে, ঝিরঝিরে বাতাসে শুকনো পাতার মর্ম্মরধ্বনি উঠছে বাড়ীর পেছনকার জঙ্গলে। ভেসে আসছে গন্ধভেদালি লতার মৃদু গন্ধ। সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত পরিবেশ আর সেই পরিবেশে ডাকাতদের কথা ও ভাবনা। রোমাঞ্চকর একটা পরিস্থিতি। তারি মাঝে বীরুর মাথার পাৎলা তারে প্রশ্নের ঘা বাজে—'ডাকাতেরা কেন ডাকাতি করে ?'

"বাবা ?"

"কি ?" ছেলের দিকে অনন্ত তাকালেন।

"ডাকাতি কারা করে বাবা ?"

"গরীবেরা।"

"ডাকাতি করা তো পাপ—তাই না ?"

"নিশ্চয়ই"—মাথা নাড়লেন অনন্ত, "পরের জিনিস জোর করে নেওয়া পাপ।"

"তাহলে গরীবেরা এ পাপ করে কেন ?"

"অভাবে, না খেতে পেয়ে। পৃথিবীময় যুদ্ধ লেগেছে, আমাদের দেশে তাই নানা অভাব দেখা দিয়েছে। হাটে গেলে দেখবি কত লোক ভিক্ষে চেয়ে বেড়ায়, অনেক লোকই তো আজকাল একবেলা খেয়ে থাকে।"

যুদ্ধ! অভাব! হুঁ। খানিকটা যেন বুঝবার চেষ্টা করল বীরু। তার ছোট্ট মাথার অল্প বুদ্ধি দিয়ে যতটা আবছাভাবে বোঝা যায় ঠিক ততটা। কিন্তু বাবার কথাটা এক্ষেত্রে খাটবে না কেন ? এই ডাকাতেরা কি অন্য উপায়ে বড়লোক হতে পারে না ?

"আচ্ছা বাবা ?"

"উঁ ?"

"ডাকাতগুলো যদি গরীব তবে ওরা লেখাপড়া করেনা কেন ?"

অনন্ত হাসলেন, "লেখাপড়া শিখলেই বুঝি বড়লোক হয়ে যাবে ওরা ?"

বীরু একটু অবাক হল। বাবা নিজের কথা নিজেই ঘোরাচ্ছেন !

"বা, তুমি তো আমায় বল যে লেখাপড়া শিখ্‌লেই দুঃখ দূর হবে ?"

অনন্ত বুঝলেন যে ছেলের মন বিচারশীল, নিজের পূর্ব্বোক্তিকে যুক্তিসঙ্গত করার জন্য তিনি জোর দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তা দূর হবে—তবে লেখাপড়ায় খুবই ভালো হতে হবে।"

বীরু আবার ভেবে একটা প্রশ্ন করল, "সবাই যদি ভালো লেখাপড়া শেখে, তাহলে ?"

"কিন্তু সবাই কি বড়লোক হতে পারে রে বোকা ?"

"কেন পারে না ? কেউ বড়লোক আর কেউ গরীব কেন হয় বাবা ?"

"কর্ম্মফল—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল।"

"মানে ?" বারু বুঝতে পারল না।

"আগের জন্মে যে যেমন কাজ করেছে সে তেমনি ফল পাবে।"

"যদি আগের জন্মে কেউ খারাপ কাজ করে তবে এ জন্মে লেখাপড়া শিখেই বা তার লাভ কি ?"

"লাভ এই যে যদি কিছু হবার হয় তা লেখাপড়া শিখলে হয়ত হতে পারে।"

"ওঃ"—

বীরু থামল। আর প্রশ্ন করতে তার ভাল লাগল না। অনন্তও

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ছেলের প্রশ্নের ধারা দেখে তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। পৃথিবীর, দেশের, সমাজের ও মানুষের জীবনকে তিনি শাস্ত্র খুলে বিচার করেন, পুরোনো পুরোনো শাস্ত্র আর সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে যতটা হয় ততটাই তিনি বোঝেন ও আর সবাইকে বোঝান। যেটা এ জগতে দৃষ্টিকটু লাগে, অন্যায় মনে হয় তাকে তিনি দার্শনিক কথা বলে চাপা দেন। অনন্ত একটু আলাদা ধরণের লোক।

কিন্তু অনন্তের ছেলে বীরুও হয়েছে অন্য ধরণের। সে ওসব শাস্ত্র আর দর্শনের ধার ধারেনা। ওর কাছে মাটির পৃথিবীটাই সত্যি, ওর নিজের চেতনা সত্যি, ওর পঞ্চেন্দ্রিয়ের সীমার বাইরে অন্য কিছুই আর নেই। তাই বাপের কথায় ওর মাথাটা ভাবনায় ভরে উঠল। তাহলে কি দাঁড়াল কথাটা? মানুষ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অনুযায়ী এজন্মে ধনী আর দরিদ্র হয়ে জন্মায়। আগের জন্মে যে ভালো কাজ বেশী করেছে সে এ জন্মে লেখাপড়া শিখে বড়লোক হতে পারে আর যারা মন্দ কাজ করেছে তাদের কিচ্ছু হয় না, তারা গরীবই থেকে যায়। তাহলে মানুষ তো ভারী অসহায়! সব কিছুই তার আগের জন্মের সঙ্গে জড়িত এবং আগামী জন্ম এ জন্মের সঙ্গে জড়িত। তাহলে চেষ্টা করলে, ইচ্ছে করলেই বড় আর বড়লোক হওয়া যায় না? অদৃশ্য একটা শক্তি সবার কর্ম্মফল বিচার করে দেখছে? কি সাংঘাতিক কথা! দৃশ্যমান সব কিছুর অন্তরালে, নদীর অদৃশ্য স্রোতের মত নিরন্তর একটা শক্তির স্রোত বয়ে যাচ্ছে আর তার প্রচণ্ড টানে সব কিছু অসহায়ভাবে ভেসে চলেছে! তাহলে? তাহলে তো চিরকালই এমনি থাকবে। কয়েকজন বড়লোক হয়ে সুখ পাবে, এবং বাকী সবাই গরীব হয়ে দুঃখ পাবে, চুরি করবে

ডাকাতী করবে। তাহলে? বীরুর মনে যেন একটা বিদ্রোহ ঘোষিত হয় কিন্তু তবু সে অত্যন্ত অসহায় বোধ করে। একদিন বীরু মানুষের দুঃখজয়ের জন্য যে পথের পথিক হবে আজ সেই পথেরই কথাটা তার মাথায় খেলে গেল। এমন কোন পথ কি নেই যাতে সবাই সুখী, সবাই বড়লোক হতে পারে, নেই কি? কিন্তু তবু সে হঠাৎ ভয় পেল আজ। ভূত প্রেত, চোর ডাকাতের কথা ভেবে নয়, এই ভেবে যে বাবার কথা সত্যি হলে মানুষ অত্যন্ত অসহায়, দুর্লঙ্ঘ্য একটা নিয়মের গণ্ডীতে তারা পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে মরছে। চিরকাল ধরে। কিন্তু কে আছে এই নিয়মের পেছনে? ভগবান? বীরু তো শুনেছে যে ভগবান দয়ালু—বীরু তাঁকে ভক্তি করে। গ্রামের নির্জ্জনতায় যে বুড়োশিব ধ্যান করছেন, যে মা কালী শিবকে পদদলিত করে অন্যায় ও অসুন্দরকে ধ্বংস করেন, যে রাখাল ছেলে শ্রীকৃষ্ণ মহানন্দার মত যমুনা নদীর তীরে বাঁশী বাজান আর মায়ের মত দেখতে যে মমতাময়ী লক্ষ্মী আর সরস্বতী—তাঁরা সবাই যে সেই একই ভগবানের নানা রূপ তা বীরু শুনেছে এবং তাদের সবাইকেই সে ভালবাসে, ভক্তি করে। তাঁরা তো মানুষের দুঃখে গলে যান, তবে? তবে কেন আগের জন্মের কথা ওঠে? নাঃ, ব্যাপারটা বড় গোলমেলে! ভাবতে ভাবতে বীরুর মাথা হঠাৎ গরম হয়ে উঠল। আচ্ছা, কি দরকার অত গোলমেলে কথা ভেবে! সবাই মিলে চেষ্টা করলে কি দেবতার বিধানও বদলে দেওয়া যায় না? দেবতার নিয়ম যদি খারাপ হয় তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, তা না মানলে ক্ষতি কি? দেবতারা চটবেন! বয়ে গেল। মানুষকে কষ্ট দেওয়াতেই যে দেবতাদের দেবত্ব তেমন দেবতাদের না মানলেই বা কি? কিন্তু

কথাটা মাথায় আসতেই জিভ কাটল বীরু। মনে মনে সে সমস্ত জানা অজানা দেবতাদের নাম বিড়বিড় করে বলল, 'মাপ করো ঠাকুর—আমি একটা ইয়ে—মানে বোকা—ভেবেচিন্তে কূল পাইনে বলেই এমনি কথা ভেবেছি—আর এমনটি করব না—দোহাই ঠাকুর, দোহাই'—দেবতাদের উদ্দেশ্যে এমনি নানা কথা বলে সে একটু আশ্বস্ত হল। তবু তার মনের মধ্যে কিন্তু সেদিন থেকেই একটা কথা জমা হয়ে রইল যে মানুষের সুখ আর শান্তির পথে দেবতারা বাধা হলে তেমন দেবতাদের না মানাই ভাল—মানুষ অসহায় একথা তার মন কিছুতেই স্বীকার করতে চাইল না।

—তিন—

ছেঁড়া লেপটা আর গায়ে দিতে হয় না—শীত শেষ হয়ে গেছে। বসন্তকাল সুরু হয়েছে। কয়েকদিন ধরে একটা দ্রুত পরিবর্ত্তণকে লক্ষ্য করছিল বীরু। সকালবেলায় উঠে দূর প্রান্তরের সীমারেখায়, মহানন্দার জলের ওপরকার কুয়াসা আর দেখা যায় না। বরং পূর্ব্বাচলে উদিত সূর্য্যদেবের রক্তজ্যোতিতে সব কিছুই যেন পরিষ্কার দেখা যায়। তারপরে বেলা বাড়তে থাকে, সূর্য্যদেবের চেহারাটা বদ্‌লে যায়, তাঁর সকালবেলাকার প্রশান্ত হাসিটি, রক্ত-চাঞ্চল্যকারী তাঁর ঈষদুষ্ণ রাঙা আলোর স্পর্শটি যেন তিনি হারিয়ে ফেলেন, তার পরিবর্ত্তে তাঁর চেহারাটা হয়ে ওঠে ভয়াল, তাঁর আলোর স্পর্শে যেন আগুন থাকে। আর পশ্চিম থেকে মহানন্দার ওপারের বন-জঙ্গলেরও বহু দূরবর্ত্তী কোন এক তপ্ত মরুভূমির বুক থেকে একটা আহত পাগলের মত হাহা করে ছুটে আসে গরম বাতাস। ধূলো ওড়ে, নদীর ওপারের বনজঙ্গল যেন আতঙ্কে কোলাহল করে দুলতে থাকে, মহানন্দার জল লক্ষ লক্ষ ঢেউ তুলে নেচে ওঠে, তার স্তিমিত ধারার নীচে যে ভৈরবী বৃত্তিটা লুকিয়ে আছে তা যেন আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে ভারী খুশী হয়ে ওঠে।

লক্ষ্মণ দাসের নৌকোর কারখানায় আজকাল আবার ঠুক্‌ঠাক্ আওয়াজ শোনা যায়। এই সময় থেকেই জোর কাজ শুরু হয়ে যায়, গ্রীষ্মশেষে নৌকোর চাহিদা খুব বেড়ে যায় বলে।

বীরু একটা আমগাছের নীচে বসে তাই দেখছিল। পাশে প্রাণের বন্ধু পল্টু খুব মন দিয়ে একটা দুর্ব্বোঘাস চিবোচ্ছিল। মাঝে মাঝে

শুক্‌নো আমপাতা এসে তাদের গায়ে আট্‌কে যাচ্ছে, ওরা ভ্রুক্ষেপও করছে না। দু'একটা কাকের ডাক ভেসে আসছে, দূরে একটা হৃষ্টপুষ্ট কালো রংয়ের কুকুর জিভ্‌ বের করে হাঁপাচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে একটা কোকিলের ডাক। থেকে থেকে ডাকছে পাখীটা—কু-হু। কোথায় বসে ডাকছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, চক্‌চকে আমের মুকুলে ভরা গাছগুলোর কোনটায় যেন বসে উদ্দাম হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দের মধ্যে নিজের রিণরিণে ও মিষ্টি গলার ডাকটাকে মিশিয়ে দিচ্ছে পাখীটা। ভারী ভাল লাগছে শুনতে।

আর ওদিকে লক্ষ্মণ দাসের কারিগরেরা নৌকো তৈরী করছে, করাত দিয়ে কাঠ চিরছে, আগুণে সেঁকে কাঠের তক্তাগুলোকে বাঁকিয়ে নিচ্ছে।

"পলটু"—

"উঁ ?"

"ঐরকম একটা নৌকো পেলে বেশ হোত, নারে ?"

"কেন ?" পলটু চোখ পিট্‌পিট্‌ করে প্রশ্ন করল।

বীরুর দু'চোখে স্বপ্ন ঘনিয়ে এসেছে, মাথাটা বাঁ দিকে বেঁকিয়ে বলল, "বে-শ হোত—নৌকোটাকে ছেড়ে দিতাম মহানন্দার স্রোতের মুখে, তরতর করে ভেসে চলত তা, চলে যেতাম দূরে—দূরে—অ-নে-ক দূরে"—

পলটু তার ছোট চোখ দুটোকে আরো ছোট করে বলল, "হুঁ—বেশ হোত"—

"চল্‌—যাবি ?" বীরু হাসিমুখে তাকাল তার বন্ধুর দিকে।

"উঁহু"—

"বাঃ—কেন ?" বীরু প্রতিবাদ জানাল।

"ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দ্দার—নৌকো পাবি কোত্থেকে রে ?"

"কেন, একটা চুরী করব"—

"উঁহু—ওসব ভালো না। তার চেয়ে বরং আমার সঙ্গে রাণাঘাট চল্ না"—

"রাণাঘাটে কে আছে তোর ?"

"দাদামশাই, মানে মায়ের কাকা। চল্ না, ট্রেণে চেপে দিব্যি যাব, নানা দেশ আর মানুষ দেখতে দেখতে, ওখান থেকে কলকাতাতেও যাওয়া যাবে, এঁ্যা ? যাবি ?"

পল্টুটা যেন কি রকম—ফস্ করে এককথায় চল্ বললেই কি যাওয়া যায় ! বীরু জবাব দিল না, চুপ করে রইল। বেড়াতে তো ইচ্ছে করে তার, ঐ ধূলিজালে পরিব্যাপ্ত দিগন্তের ওপারে যে সব অদেখা দেশ আর মানুষ আছে তাদের বিষয়ে তার কৌতূহল কি পল্টুর চেয়ে কম উগ্র। কিন্তু মা, বাবা ?

"আচ্ছা পল্টু"—

"কি ?"

"মানুষ কেন গরীব হয় রে ?"

"টাকা না থাকলে"—

"টাকা না থাকলে ? বাঃ—ইয়ে, টাকা থাকে না কেন ?"

"কেন ?" পল্টু বিড়বিড় করে কথাগুলোকে আওড়াল, একটু ভেবে বলবার জন্য সে নিঃশব্দও রইল কয়েক সেকেণ্ডের জন্য, তারপর বলল, "আমরা যে পরাধীন—ইংরেজরা যে আমাদের ভালো চায় না।"

"তা কেন ?" বীরু কথাটা আরো ভালো করে বুঝতে চাইল। সে শুনেছে যে তাদের দেশ পরাধীন, সে শুনেছে যে দেশের লোকেরা

স্বাধীন হবার জন্য সংগ্রাম করছে, গান্ধী জহরলাল সুভাষচন্দ্রের নামও তার অজানা নয়, ত্রিবর্ণ পতাকা নিয়ে দীপ্তনেত্র বহু লোকের মিছিলও দু'একবার তার চোখে পড়েছে। কিন্তু তবু ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে চায় সে, জানতে চায় সব কিছু, বাবার কৈফিয়তে তার মন সেদিন আশ্বস্ত হতে পারেনি। আজকাল প্রায়ই তার মস্তিষ্কের কোটরে একটা প্রশ্ন বারংবার ধ্বনিত হতে থাকে 'মানুষ গরীব কেন, কি করে তাদের দুঃখ দূর হবে ?'

পল্টু জবাব দিল, "ইয়ে—আমাদেরটা নিয়েই তো ওরা রাজা, আমাদের ভালো করতে গেলে যে ওদের ভালো হবে না।"

"হুঁ"—

"থাক ওসব কথা ভাই, বল্ না, যাবি দিনকয়েকের জন্য বেড়াতে ? কিরে ?"

অন্যমনস্কভাবে বীরু মাথা নাড়ল, "যাব পরে"—

"ধ্যেৎ, তুই একটা মর্কট"—পল্টু চটে গেল।

হু হু করে গরম হাওয়া বইছে, ধুলো ও শুকনো পাতা উড়ছে, বাতাসে ভাসছে আমের মুকুলের সুবাস। মহানন্দার জল চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তার ওপারকার বনরেখা ধুলোবালির পাৎলা পর্দ্দায় ঢাকা পড়েছে, আর কোথায়, কোন গাছের পত্রকুঞ্জের নিভৃতে বসে সেই কোকিলটা যেন ক্ষ্যাপার মত ডেকে চলেছে অবিশ্রান্তভাবে। কু-হু।

"কু—হু"—

ওদের পেছন থেকে এবার শব্দটা হল। ওরা মুখ ফেরাল। না, কোকিল নয়,তা ওরা বুঝতে পেরেছিল। পাখীর গলা কখনো এত মোটা হয় ? পেছন ফিরতেই দেখা গেল যে মণ্টু ফিক্‌ফিক্ করে হাসছে।

"মণ্টু ! আয়, বোস্",—বীরু সহাস্যে ডাকল।

মণ্টু এসে পাশে বসল, উত্তেজিতকণ্ঠে বলল, "মা বেরোতে মানা করছিল, কিন্তু বসে থাকতে কি ভালো লাগে, বল্ না? হাওয়া বইলে, ধুলো উড়লে আমার কেমন যেন ভারী ভালো লাগে, বেড়িয়ে বেড়াতে ইচ্ছে হয়—একটু ফাঁক পেয়েই চোঁচা দৌড় মেরেছি"—

"বেশ করেছিস্"—পল্টু মণ্টুকে সমর্থন জানালো।

"শোন্"—হঠাৎ চোখ বড় বড় করে মণ্টু বলল, "শোন্ ভাই, একটা কাজ করবি?"

"কি?" বীরু উৎসুকনেত্রে তাকাল।

"ওপারে যাবি?"

"কেন?"

"তরমুজ খেতে!"—

"জিতা রহো বাবা"—পল্টু যেন এতক্ষণে সজীব হয়ে উঠল, "বাঁচা গেছে বাবা, এতক্ষণ ধরে প্রাণটা যে কি চাইছিল তা বুঝতে পারছিলাম না ভাই—ঠিক বলেছিস্—চল্ রে বীরু—ওঠ"—

"চল্—বেশ হবে"—তরমুজ চুরী করে খাওয়ার ছবিটা কল্পনা করেই বীরুর মনটা খুশীতে ভরে উঠল। বেশ হবে, দূরদূরান্তরের দেশে যাওয়ার সাধটা আর এই মুহূর্তেই সত্যি হয়ে উঠবে না, কিন্তু মহানন্দার ওপারকার বনজঙ্গলের নির্জ্জন আবহাওয়ায়, জনশূন্য তীরভূমির গরম বালুর ওপর দিয়ে চলতে মন্দ লাগবে না।

খেয়াঘাটে গিয়ে নৌকায় চড়ে বসল ওরা। খেয়া পারাপারের নৌকোর মাঝি বিরক্ত হয়ে উঠল তাদের দেখে।

"কুনঠে যাবা তোমরা—এঁ্যা?" সে প্রশ্ন করল।

"ওপারে"—পল্টু বলল।

"পাইসা আছে?"

"পাইসা ? কি রে বীরু, আছে ?"

বীরু হাসল, মাথা নেড়ে বলল, "না। আমরা স্কুলের ছেলে যে গো—"

মাঝি বিড়বিড় করে কি সব বলল। ওদের সে বেশ ভালো করেই চেনে তবু বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আর দেবার সাহস হল না তার। এই সব ছেলেদের সে হাড়ে হাড়ে চেনে। একবার ওদের নৌকায় না চড়ানতে খুব ভুগেছিল সে, শয়তান-গুলো তার নৌকোকে নদীর মাঝখানে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

পল্টু প্রশ্ন করল, "কি বলছ তুমি আপন মনে, এঁ্যা ?"

মাঝি তাড়াতাড়ি বলল, "কিচ্ছু না তো, বুলব আবার কি—চল"—অন্যান্য যাত্রীরা মুখ টিপে হাসতে লাগল।

মহানন্দার জল এখন বেশী নেই। ওপারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সাদা ও মিহি বালুর রাশি, পশ্চিমা হাওয়ায় তার ওপর মহানন্দার ঢেউয়ের মত দাগ তৈরী করেছে, তার পরে বেলে মাটির ওপর তরমুজের ক্ষেত। অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে ক্ষেতটা, আর তারও ওপরে নদীর খাড়া পাড় ঘেষে পটলের ক্ষেত।

চোরের দল এগোল তরমুজের ক্ষেতের দিকে। অতি সন্তর্পণে।

"কেউ পাহারা দিচ্ছে না তো রে—ভালো করে দেখ"—বীরু বলল।

পল্টু তাকাল, দুচোখের ওপর দু'হাত রেখে সে ভালো করে ক্ষেতের দিকে তাকাল।

"না, কেউ কোথাও নেই"—সে বলল।

তারপরে তরমুজের ভূশায়ী লতার মাঝে বসে বেছে বেছে তিনটে তরমুজ তুলল ওরা, ভারী দেখে দেখে। কুচকুচে কালো

গায়ের ওপর সাদা সাদা দাগ। তারপর আছাড় মেরে ভাঙল সেগুলোকে, বসল গিয়ে একটা আমগাছের নীচে। আঃ, টকটকে লাল তরমুজগুলো। কামড় দিয়ে দিয়ে খেতে লাগল ওরা, দু'কস বেয়ে ওদের তরমুজের রস জামা ভিজিয়ে তুলল।

"বেড়ে মাইরি"—পল্টু তার ছোট ছোট চোখ দুটো প্রায় বন্ধ করে বলল।

"চমৎকার, পরাণটা জুড়িয়ে গেল ভাই"—বীরু সায় দিয়ে বলল।

মণ্টু কোনো কথা না বলে একবার মুখ তুলে তাকাল শুধু আর ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো মেলে হাসল।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দ!

ওরা চমকে উঠল, তাকাল পেছন দিকে। একজন লোক, চাষা জাতীয় মুসলমান, তার হাতে একটা মস্ত বড় তরমুজ, তার ওজন অন্ততঃ সের দশেক হবে।

লোকটা থম্‌কে দাঁড়িয়েছে, কট্‌মট্ করে তাকাচ্ছে সে ওদের দিকে।

"কেরে ভাই?" মণ্টু প্রশ্ন করল।

"বোধ হয় এই ক্ষেতের মালিক"—বীরু ফিস্‌ফিস্ করে বলল।

"শালাকে মারব নাকি এই তরমুজ ছুঁড়ে?" পল্টু মৃদুগলায় বলল।

"পাগল! তাতে আরো বিশ্রী ব্যাপার হয়ে যাবে"—

"তাহলে?"

বিশ্রী অবস্থা!

সেই মুসলমান লোকটা স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে, দুলছে একটু একটু। আর ওদিকে গরম হাওয়ায় ধুলো-বালির ঘূর্ণি রচিত হচ্ছে নদীর ধারে।

"চল্ পালাই ভাই"—বীরু একটু ভয় পেল।

"হুঁ—তাই চল্"—চুরী করে ধরা পড়তে পল্টু রাজী নয়, বীরুর কথায় তাই সে তৎক্ষণাৎ সায় দিল।

মণ্টু ওদের চেয়েও বয়সে ছোট, তার মুখটা দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল যে বেচারা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। মাত্র আট দশ হাত দূরেই দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, যে কোনো মুহূর্ত্তে সে এবার দৌড়ে এসে তাদের ওপর লাফিয়ে পড়বে—অতএব—

"মার দৌড়্"—পল্টু গুল্তির ঢিলের মত একলাফে পাঁচ হাত দূরে ছিট্‌কে পড়ে দৌড়োতে আরম্ভ করল। মুহূর্ত্তের ব্যাপার। তার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমা বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বীরু আর মণ্টুও দৌড়োতে আরম্ভ করেছে।

"সোজা জলের দিকে চল্"—বীরু বলল।

"কিন্তু নৌকো নেই যে"—মণ্টু হতাশকণ্ঠে বলল।

"নৌকো নেই তো কি হয়েছে—সাঁতার কাটতে জানিস্ না কুম্‌ড়ো কোথাকার?" পল্টু ধমক দিল।

দৌড়োতে দৌড়োতে পেছন দিকে তাকিয়ে ওরা এবার রীতিমত ঘাবড়ে গেল। সেই মুসলমানটিও দৌড়োচ্ছে তাদের পেছনে।

"সেরেছে"—বীরু বলল।

পল্টু আদেশের সুরে বলল, "কথা না বলে আরো জোরে দৌড়ো শুয়ার"—

কিন্তু মণ্টু মুষড়েই পড়েছে, কাঁদ কাঁদ অবস্থায় সে বলল, "মায়ের কথা অগ্রাহ্য করার এই ফল—এবার কি হবে ভাই?"

"চুপ কর ছিচ্‌কাঁদুনে ছোঁড়া, দৌড়ো"—পল্টু গর্জ্জন করে উঠল।

সেই লোকটা আরো জোরে দৌড়োচ্ছে। আরো জোরে—

পায়ের নীচে নদীর জল।

"দে লাফ্—সাঁৎরে পার হ"—পল্টু বলল।

সবাই জলে লাফিয়ে পড়ল। ব্যস্, আর কে ধরে? ঐ লোকটার সাধ্য নেই যে সাঁতার কেটে ধরবে তাদের। কি করে ধরবে? 'কুমীর কুমীর' খেলা জানে ওরা ,একডুবে কোথায় গিয়ে ভুস্ করে উঠবে কিচ্ছু টের পাবে না ও ব্যাটা।

কিন্তু লোকটাও যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল!

কি আশ্চর্য্য! ঐ মুসলমান লোকটা তো ক্ষেতের মালিক নয়! কারণ ক্ষেতের ভিতর থেকে আসল মালিকের গর্জ্জন ও গালিগালাজ এবার শোনা গেল। যমদূতের মত কালো ও মোটা একজন মুসলমান এগিয়ে আসছে, রাগে আর ঘামে তাকে বিদঘুটে দেখাচ্ছে।

"হারামজাদা, শয়তান, শালা"—বিশ্রী বিশ্রী গালিগালাজ অবিশ্রান্ত বেরিয়ে আসছে লোকটার মুখ থেকে।

বীরু তাদের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী মুসলমানটির দিকে তাকল, হেসে প্রশ্ন করল, "কি হল মিঞা, জলে যে? তুমি তাহলে মালিক নও!"

মুসলমানটি বিশীর্ণ হাসি হাসল, ক্লান্তকণ্ঠে বলল, "মালিক হলে কি দৌড়া পালাই? হামি ভাবনু কি তুমরা মালিক, তুমরা ভাইবলে যে হামি, কিন্তু আসল মালিক যে ঐ শালা। হায় হায়, একটুকুনও মুখে দিলাম নাই গো"—

ছেলেরা সকৌতুকে হেসে উঠল। বেচারা!

মুসলমানটি সাঁতার কাটতে কাটতে আবার বলল, "কাল থিকা ভাত খাই নাই, ভুখ আর পিয়াস মিটামু ভাইবাছিনু—কিন্তু"—

বীরু স্তব্ধ হয়ে গেল। বাবার কথা মনে পড়ল তার। দুর্দ্দিন এসেছে। ধান চাল নেই দেশে। এই লোকটা কাল থেকে না খেয়ে আছে, তরমুজ খেয়ে পেট ভরাতে চেয়েছিল, আহা!

পল্টু একবার তাকাল পেছন দিকে, তরমুজ ক্ষেতের মালিকের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বলল, "তোমার ক্ষেতের তরমুজগুলা ভারী মিষ্টি হে মিঞা, আবার কাল আসব"—

ক্ষেতের মালিক দুই হাত মুখে লাগিয়ে আকাশফাটানো গলায় চেঁচিয়ে জবাব দিল, "আসিস রে হারামীর বাচ্চা—ক্ষ্যাতেতে গোর দিমু তুদের"—

পল্টু জলের মধ্যে লাফ্ মেরে জিভ্ বের করে ভেংচাল লোকটাকে, চুক্ চুক্ শব্দ করে করে বলল, "আহাহা চটো না, চটো না গো তরমুজ মিঞা—"

মণ্টু খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল, "তরমুজ মিঞা—তরমুজ—হি হি হি"—বেশী হাসতে গিয়ে মুখের মধ্যে জল গেল তার, সে বিষম খেযে কাশতে লাগল, তারপরে বীরুকে একটা ঠেলা মেরে বলল, "তুই চুপ করে যে বীরু?"

বীরুর হাসতে ইচ্ছে ছিল না, সে তাকিয়ে ছিল সন্তরণরত মুসলমানটির দিকে।

পায়ের নীচে মাটি ফিরে এল।

ঘাটের ওপর উঠে মুসলমানটি বসে হাঁপাতে লাগল। হতাশ-চক্ষে তাকাল ওপরের তরমুজের দিকে, কাল থেকে সে খায় নি, একদানা ভাতও পড়েনি তার পেটে। বীরু থম্‌কে দাঁড়াল, কিছু বলবে নাকি সে? কিন্তু কি বলবে? বলে লাভ কি?

"চল্ বীরু—দাঁড়াস্‌নে"—পল্টু বলল।

ভিজে গায়ে গরম বাতাসের ঝাপ্‌টা লাগছে, কাপড় শুকিয়ে যাচ্ছে, মহানন্দার জল দুলছে, ধূলো বালি উড়ে এসে গায়ে বসে যাচ্ছে। মাথার ওপরে নির্মেঘ আকাশ, আয়নার মত উজ্জ্বল। মুসলমানটির ভঙ্গীটা ভারী ক্লান্ত, চোখ দুটিতে কালো ছায়া, কণ্ঠা আর পাঁজরার হাড়গুলো সুস্পষ্ট, পরণের লুঙ্গিটা ছেঁড়া। তবু কোথায় যেন সেই কোকিলটা মাতালের মত ডেকে যাচ্ছে কুহু—কু-হু—

"আচ্ছা পল্‌টু"—

"উঁ"—

"গরীব মানুষদের দুঃখ কি করে দূর করা যায়? এঁ্যা?"

"টাকাপয়সা আর ভাতকাপড় দিলে"—

"ভাতকাপড় তো টাকাপয়সা ছাড়া পাওয়া যাবে না, তার মানে টাকাপয়সা হলেই ওদের দুঃখ দূর করা যায়, না?"

"হ্যাঁ"—পল্‌টু মাথা নাড়ল।

খুব ভাব্‌না এল বীরুর মাথায়, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে আপনমনে সে বলল, "যদি এমন হত—এই ধর্‌ আকাশ ভেঙ্গে দেব্‌তাদের ভাণ্ডারের টাকাপয়সা শ্রাবণমাসের বিষ্টির মত ঝরঝর করে নীচে পড়ত—তাহলে—তাহলে বেশ হোত"—

"দূর—তা বুঝি হয়? দেব্‌তারা অত কাঁচা লোক নয় রে"—পল্‌টু বলল।

"হি হি হি"—মণ্টু নিজের মনে হেসে উঠল হঠাৎ।

"হাসছিস্‌ যে!" বীরু বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল।

"হুঁ—ভাবছি—ভাবছি যদি আমগাছে আম না ফলে টাকা ফলত তাহলে—উঃ"—কৌতুক আর উত্তেজনায় মণ্টুর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল।

ম্লান হয়ে এল বীরুর মুখ। না, এসব বলে আর ভেবে কোনো লাভ নেই। হতাশায় মনটা ভারী হয়ে উঠল তার, নিরুপায় একটা আক্রোশে বুকের ভেতরটা জ্বলে যেতে লাগল। দূর ছাই, গরীবেরা মরুক সবাই, দলবেঁধে সব নরকে যাক্, আগুনে পুড়ুক, ওদের কথা ভেবে বীরুর কোনো লাভ নেই।

সন্ধ্যের একটু আগে ওরা স্কুলের মাঠ থেকে ফিরছিল। এক-হাঁটু ধূলো, উস্কোখুস্কো চুল, ঘামে ভেজা জামা, সারাদিনের রোদে আর খেলার শ্রমে দেহে ওদের ক্লান্তির জোয়ার এসেছে। নদীর ধার দিয়ে ঘুরে আসছিল ওরা। ঝিরঝিরে একটা বাতাস আসছে নদীর দিক থেকে, ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের মত। আসতে আসতে বোঁচার ট্যাঁকের পাশে এসে পৌছুল ওরা। বোঁচার ট্যাঁক মানে শ্মশান। কেন যে তার নামটা অমন হয়েছে, কে যে ঐ নামটা রেখেছে তা কেউ বলতে পারে না। সে নাকি অনেকদিনের কথা যখন ঐ নামটা রাখা হয়েছিল। অনন্ত'র মত বয়স্ক লোকেরাও সঠিক কোনো কারণ দেখাতে পারেনি অমন অদ্ভুত নামের। বিদ্ঘুটে জায়গার নাম বিদ্ঘুটেই হবে এই ভেবে এবং বলে সবাই চুপ করে যায়। তাছাড়া আর উপায় কি?

নদী এখন অনেক নীচে নেমে গেছে, তাই শ্মশানও নীচে নেমেছে। জল যেমন বাড়ে ও কমে শ্মশানও তেমনি ওপরে ওঠে বা নীচে নামে। ওপরের দিকে একটা খড়ের ছাউনি দেওয়া

ভাঙ্গা ঘর তাতে কাঠ বোঝাই রয়েছে। শবদাহের জন্য কাঠ বিক্রি হয় সেখানে, দোকানের মালিকের নাম বনমালী। নীচে, বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে বোঁচার ট্যাঁক। পোড়া কাঠ আর কয়লার টুক্‌রো বালুর মধ্যে ডুবে আছে, তার ওপরে ছড়ানো আছে বহু মানুষের অস্থি আর হাড় পাঁজ্‌রার টুক্‌রো—যারা এককালে এই কাঞ্চনপুরের হাটেমাঠে কাজ করত, মহানন্দার জলে নৌকো ভাসাত, তারাভরা আকাশের নীচে গান গাইত। তারা আজ মরে গেছে, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে আকাশে, বাতাসে, জলে, মাটিতে আর আলোতে, তারা আর নেই।

তখন একটাও মড়া পুড়ছিল না। তবু বাতাসে কেমন যেন একটা মৃদু দুর্গন্ধ। কাঠের দোকানটার পাশে একটা নেড়ী কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল।

"বোঁচার ট্যাঁক"—মণ্টু বলল।

"হুঁ"—বীরু মাথা ঝাঁকাল।

"একটু তাড়াতাড়ি চল্‌ ভাই"—মণ্টু দ্রুতকণ্ঠে বলল।

"কেন রে?"

মণ্টু জবাব দিল, না, তার হয়ে পল্টু বলল, "মণ্টুটা ভারী ভীতু যে"—

"ভয় পায়! কেন?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করল বীরু।

"ভূতের ভয় রে"—

"ভূত! দূর্"—

"দূর্ মানে?" পল্টু রুখে দাঁড়াল, "তুই কি ভূত মানিস্‌ না?"

"না।"

"কেন?"

"ভূত নেই।"

"কেন?"

"ইয়ে—মানুষ মলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সে আবার ভূত হয় কি করে রে?"

"হয়"—পল্টু মাথা নাড়ল, "যে লোকগুলো পাজী, পাপী—তাদের আত্মা ভূত হয়। জানিস্ না যে মানুষের আত্মা পোড়ে না"—

"কেন? আত্মার কি শরীর নেই?" বীরু বুঝতে পারে না কথাটা।

"না—আত্মা হচ্ছে তোর গিয়ে—ইয়ে—হাওয়ার মত। হাওয়া কি আগুনে পোড়ে?"

"না।"

"তবে?"

"হুঁ"—যুক্তির দিক থেকে অকাট্য পল্টুর কথাগুলো।

বীরু প্রশ্ন করল, "কোথায় থাকে তোর ভূতেরা?"

"শ্মশানে, অন্ধকার জায়গায়, শ্যাওড়াগাছে, যেখানে সেখানে"—

"দূর্"—বীরু আবার জোর করে প্রবলভাবে মাথা ঝেঁকে বলল, "ওসব কিছুই নেই।"

"বিশ্বাস করিস্ না?" পল্টু গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল।

"না"—

"তবে তোকে গল্প বলি—সত্যিকারের গল্প"—

"বল্"—

মণ্টু এতক্ষণে কথা বলল, পল্টুর গা ঘেঁষে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে বলল "থাক্ না ওসব কথা পল্টু। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এখন ওসব না বলাই ভালো।"

"দূর, কিচ্ছু হবে না।" পল্‌টু হেসে বলল, তারপরে বীরুর দিকে তাকিয়ে চলতে চলতে সে বলল, "সত্যি কথা বলছি। আমাদের গাঁয়ের হরিপদ মুখুজ্জে রে—কানু'র বাবা—তিনি বলেছেন। তাঁর নিজের চোখে দেখা। ঐ যেখানে পুরোনো মস্‌জিদ্‌টার পাশে একটা ডোবা মত আছে সেখানটায়। তিথিটা কি ছিল মনে নেই—তবে অন্ধকার রাত। তখন বোধ হয় মাঝরাত—একটা বিয়েবাড়ী থেকে ভোজ খেয়ে ফিরছিলেন, হঠাৎ একটা কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন তিনি"—

"পল্‌টু—থাক্"—মণ্টু কম্পিতস্বরে বাধা দিয়ে বলল।

পল্‌টু ধমকে উঠল, "আরে থাম্—ভীতু কোথাকার—আমরা রয়েছি না? হ্যাঁ শোন্ বীরু। একটা কান্নার শব্দ, বুঝ্‌লি? হরিপদ মুখুজ্জে একবার থম্‌কে দাঁড়ালেন। কুচকুচে কালো অন্ধকার রাত বড় বড় আমগাছ আর বাঁশঝোপের মাঝে আরো ভারী হয়ে উঠছে। গাছে গাছে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে, আলেয়ার মত জোনাকিরা জ্বলছে নিভ্‌ছে আর শর্‌শর্‌ খচ্‌মচ্‌ শব্দ তুলে পোকামাকড় শেয়ালেরা চলাচল করছে। এমনিতেই চলতে ভয় হচ্ছিল মুখ্যুজ্জেমশায়ের, নিঃশ্বাসটা ভারী হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ এই কান্নার শব্দ। ইনিয়ে বিনিয়ে কেউ যেন কাঁদছে, যেন কারুর কেউ মারা গেছে, যেন অতিদুঃখে পাগল হয়ে গেছে মানুষটা। বিচ্ছিরী কান্না, মুখুজ্জে-মশাইয়ের গায়ের রোঁয়াগুলো তো খাড়া হয়ে উঠল। কে কাঁদে? ভাবলেন তিনি—বুঝলি? ও কি, শুনছিস্ তো বীরু?"

"হুঁ"—সাগ্রহে মাথা নাড়ল বীরু। সত্যি হোক্, মিথ্যে হোক্, শুনতে মন্দ লাগছে না, একটা অস্বস্তিকর আগ্রহ ঘনিয়ে উঠছে মনের মধ্যে। তারপর?

"আমার কিন্তু শুনতে কেমন লাগছে ভাই—দেখ্ চেয়ে, আমার গায়েও কাঁটা দিয়েছে"—জোর করে হাসবার চেষ্টা করে, শুক্‌নো গলায় মণ্টু বীরুর বাঁ হাতটা চেপে ধরে বলল।

"আর ভয় পাচ্ছিস্ কেন রে গাধা—বোঁচার ট্যাঁক তো ছাড়িয়েই এসেছি"—

"হুঁ—তবে একটু অন্ধকার কিনা"—

"অত ভয় পেলে কি চলে ভাই—ভয় কি?" বীরু বন্ধুকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করল, তারপর পল্টুকে বলল, "তারপর—বল্।"

"শোন্। এখন কি হল জানিস্? মুখুজ্জেমশাই ভাবলেন যে কোনো মেয়েছেলে বোধ হয় তার মরা ছেলে কিংবা স্বামীর শোকে কাঁদছে—মানে কান্না শুনে তাই মনে হচ্ছিল কিনা। তিনি তাকালেন, যেন অন্ধকারের দেয়াল ফুঁড়ে দেখতে চাইলেন কে কাঁদছে, কি রকম চেহারা সেই মেয়েলোকটার। হঠাৎ দেখতে পেলেন তিনি, একশ' হাত দূরে, একটা গাব্ গাছের গায়ে হেলান দিয়ে, মাটির ওপর বসে, এলোচুলে একটি মেয়েছেলে কাঁদছে। আব্ছা আব্ছা দেখলেন মুখুজ্জেমশাই—তাই ভাবলেন যে আর একটু ভালো করে দেখতে হবে। কাদের বাড়ীর মেয়েলোক ওটি? বুঝলি না—মানে ইয়ে হল। আবার চোখ দুটোকে বড় বড় করে তাকালেন তিনি। হঠাৎ সেই মেয়েলোকটা উঠে দাঁড়াল, সোজা তাকাল মুখুজ্জেমশায়ের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে—উঃ! কি দেখলেন মুখুজ্জেমশাই?"

"কি?" মণ্টুর দম আট্‌কে এল।

"কি?" বীরু প্রশ্ন করল।

"কি আবার?—ছায়ার মত কালো একটা মুখে দুটো বড় বড় চোখ আর তার মাঝে যেন একএকটা আগুনের ডেলা—হাঁপরের

আগুন থেকে যেমন আগুনের 'ফুলকি ছিট্‌কে আসে তেমনি ভাবে আলো ছিট্‌কে পড়ছিল সেই চোখ দুটো থেকে। মুখুজ্জেমশায় ঘাবড়ে গেলেন—উহুঁ—ঠিক ভয় নয়, ঘাব্‌ড়ালেন। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে হন্ হন্ করে চলতে লাগলেন তিনি। কিন্তু কিছুদূর, বেশ কিছুটা দুর গেলে পর আবার সেই আগের মত কান্না শুনতে পেলেন তিনি। আবার তিনি তাকালেন। এবার তার শরীরের প্রত্যেকটা রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠল, ভয়ে তা দিয়ে যেন ভিতরের রক্ত জল হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল, শরীর অবশ হয়ে এল, কাঁপতে লাগল। আগের মতই, একশ হাত দূরে, সেই মেয়েলোকটা তার দিকে তাকিয়ে কাঁদছে। এবার তিনি বুঝতে পারলেন যে ঐ মেয়েলোকটা আর কিছু নয়—পেত্নী—পেত্নী। 'বাপ্' বলে হঠাৎ তিনি জোর করে দৌড় মারলেন, প্রাণপণ দৌড়—আঁদাড় বাঁদাড় পার হয়ে, বেত আর বাবলার কাঁটার ওপর দিয়ে, উঁচুনীচু জমি লাফিয়ে ডিঙ্গিয়ে তিনি বাড়ীর দিকে ছুটলেন, আর তাঁর পেছন পেছন ধাওয়া করল সেই পেত্নীটা—সমানে কাঁদতে কাঁদতে—ঠিক একশ' হাত পেছনে থেকে। ছুট্—ছুট্—ছুট্—চীৎকার করতে করতে তিনি পাগলের মত ছুটে বাড়ীর দোরগোড়ায় পৌছেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তারপর সে কি জ্বর—উঃ! কত ওঝা এল, ঝাঁড়ফুঁক হল, তারপরে গিয়ে ভালো হলেন তিনি। শুনলি তো?"

বীরু একটা নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল, "হুঁ—শুনলাম।"

"এমনি আরো কত গল্প জানি—সে বলতে গেলে তিনদিন তিন রাত কেটে যাবে।"

"আমি একটা বলব?" মণ্টু হঠাৎ বলল।

"বল"—বীরু বলল।

"আমাদের এককড়ির ঠাকুদ্দার গল্প। অনেক অনেকদিন আগে-কার কথা। তখন আমারা কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম তার ঠিক নাই। সেই সময়কার কথা। এককড়ির ঠাকুদ্দা একদিন শহর থেকে গাঁয়ে ফিরে আসছিলেন মোষের গাড়ীতে। তখন তো এদিকটায় রেললাইন হয়নি, বুঝলিনা? সঙ্গে আরো দু'তিনজন সাথী ছিলেন। এক জায়গায় রাত হয়ে গেল, ফাঁকা মাঠের শেষে, একটা জঙ্গলের সীমানায় গিয়ে তারা থম্‌কে দাঁড়ালেন, গাড়ী থামালেন। ঠিক করলেন যে রাতের বেলা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তাঁরা আর পাড়ি দেবেন না, এই জায়গাতেই বিশ্রাম করবেন। চিড়েগুড় বাঁধা ছিল গামছায়, ঘটি বাটি জলও ছিল, তাই খেয়ে হুঁকো কল্‌কে নিয়ে বসলেন সবাই। এ গল্প সে গল্প করতে করতে ভূতপ্রেতের গল্প আরম্ভ হল। প্রত্যেকেই বলতে লাগলেন তাঁর জানা ও দেখা নানা ঘটনার কথা। সে সব গল্প শুনে সবারই গা বেশ ছম্‌ছম্‌ করছিল। এদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠল, সামনের ধূ ধূ মাঠটা পর্য্যন্ত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, ইয়ে—জঙ্গলটার তো আর কথাই নেই। সবাই গল্প করছিলেন, কিন্তু এককড়ির ঠাকুদ্দা আর কথা বলছিলেন না, চুপচাপ হুঁকো টানছিলেন শুধু। হঠাৎ সবার নজর পড়ল তাঁর দিকে। তাঁরা বললেন, 'তুমি কথা বলছো না কেন হে? এঁ্যা?' এককড়ির ঠাকুদ্দা বললেন, 'তোমাদের ওসব গ্যাঁজাখুঁড়ি গল্প আমার ভালো লাগে না।' তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, তুমি কি ভূত মানো না?' এককড়ির ঠাকুদ্দা জোরগলায় বললেন, 'না। তোমরা যত সব ভীতু, গুলিখোড়ের দল—তাই'—সঙ্গীরা সবাই একটু হেসে চুপ করে রইলেন। এককড়ির ঠাকুদ্দা ছিলেন একরোখা মানুষ এই ইয়া তাগ্‌ড়া জোয়ান, পশ্চিমা মোষের মত। তাই তাকে চটাতে ভরসা পেলেন না কেউ। থাক্‌। তারপর তো রাত হল। জঙ্গলের

ভেতর শেয়ালেরা তোলপাড় আরম্ভ করল। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল, খালি এককড়ির ঠাকুদ্দার কেন জানি ঘুম আসছিল না। চোখ বুজে চুপচাপ পড়ে ছিলেন তিনি। হঠাৎ কার নিঃশ্বাস পড়ল তার কানের ওপর, তিনি নড়ে উঠলেন। আবার পড়ল সেই নিঃশ্বাস, এবার তার নাক চোখ মুখের ওপর। চোখ মেললেন তিনি। একি ব্যাপার বাবা! তার মুখের ওপর অনেকগুলো মুখ ঝুঁকে আছে। বিশ্রী বিশ্রী চেহারা তাদের, গোলার মত চোখ, আঁধার রাতের চেয়ে কালো তাদের গায়ের রং। আর কি লম্বা মূর্ত্তি, যেন তালগাছ এক একটা—এককড়ির ঠাকুদ্দা ভাবলেন যে ঘুম না আসায় মাথা গরম হয়েছে বলেই এসব ভুল দেখছেন তিনি। কিন্তু চম্‌কে উঠলেন তিনি খন্‌খনে গলার কথা শুনে। সেই সব বিদঘুটে ভুতুড়ে মূর্ত্তিগুলো যেন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'ভূত মানিস না রে শালা? এঁ্যা?' এককড়ির ঠাকুদ্দা ছিলেন একরোখা, রাগী মানুষ, সাহসী বলে নাম ছিল তাঁর—তিনি হার মানবেন কেন? হার মানার চেয়ে মরা তাঁর কাছে—ইয়ে ছিল কিনা। তিনি মাথা নেড়ে বললেন—'না, আমি মানি না।' আবার ভূতগুলো জিজ্ঞেস করল, 'শালা, ভেবে বল্, ভূত মানিস্ না?' এককড়ির ঠাকুর্দ্দা দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'না রে হারামজাদারা—না।' তার রাগ দেখে হঠাৎ হিহি হাহা করে ভূতেরা হাসতে লাগল। তাদের সেই হাসি পাঁচ নম্বরি ফুটবলের মত, মহানন্দার ঢেউয়ের মত অন্ধকারে ডুবে-যাওয়া মাঠের ওপর দিয়ে ধুলো উড়িয়ে গড়িয়ে গেল, তাদের সেই হাসির শব্দে সামনের জঙ্গল যেন কালবৈশাখী ঝড়ের দোলায় হাহাকার করে উঠল। তারপর একটা সংঘাতিক ব্যাপার হল। এককড়ির ঠাকুদ্দা দেখলেন যে সেই সব বিকট ভূতেরা তাঁকে নিয়ে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার জঙ্গলের একটা জায়গায় নিয়ে ফেলল আর তারপর তাঁকে বেদম মার দিতে আরম্ভ

করল। তাঁর 'বাপ্' 'বাপ্' শব্দ চারদিকে ভেসে গেল কিন্তু কেউ এলো না তাঁকে বাঁচাতে! মারতে মারতে ভূতেরা জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'বল্ শালা, ভূত মানিস্ কিনা, বল্?' শেষে যখন প্রাণ যায় যায়, যখন সব কিছু ঝাপ্সা হয়ে এল চোখের সামনে তখন এককড়ির ঠাকুদ্দা কাৎরাতে কাৎরাতে বললেন, 'মানি বাবা তোমাদের গুষ্টির সবাইকে মানি।' পরদিন—তোমার গিয়ে—সঙ্গীরা তাঁকে জঙ্গলের মাঝে অজ্ঞান অবস্থায় কুড়িয়ে পেল।"

মণ্টু থাম্‌ল, জ্বল্‌জ্বলে চোখ মেলে তাকাল বীরুর দিকে, প্রশ্ন করল, "কিরে? এবার ভূত মানবি তো?"

বীরু চট্ করে জবাব দিল না। ভাব্‌তে লাগল সে। এই সব শোনা কথা, আজগুবী গল্প শুনে ভূত মানবে সে? মা বলেছেন যে ওসব নেই, থাকলেও মানতে নেই, ভয় পেতে নেই। আর যদিই মানতে হয়, তবে না দেখে মানবে না বীরু। ভূত আছে কি নেই, এ নিয়ে এত মাথাব্যথা কেনরে বাপু?

পল্টু কনুইয়ের ঠেলা মারল, "বল্‌না—মানিস্ তো ভূত?"

"না।"

"না?"

"না।"

"হুঁ"—একটু থুথু ফেলে ঠোঁটটাকে কামড়াল পল্টু, চট্ করে ভেবে নিয়ে বলল, "তোর যদি এতই সাহস তাহলে তুই বোঁচার ট্যাকে মাঝরাতে আসতে পারবি?"

একটুও না ভেবে বীরু মাথা নাড়ল।

"ভয় করবে না?" অবাক হয়ে গেল পল্টু।

"না।"

"বাজী রাখ্"—

"রাখলাম।"

"আজই ?"

"হ্যাঁ—আজই।"

"দূর্—গোয়ার্তুমি করিস না ভাই বীরু—কিসের থেকে কি হবে, তখন ভারী ইয়ে হবে"—মণ্টু মিনতির স্বরে বলল।

"হোক্—আমি যাব।" বীরু উদ্ধতভাবে বলল, সাহসী বলে প্রশংসা পাবার লোভটা তার দুর্নিবার হয়ে উঠল, তাকে পেয়ে বসল। সে বলল, "তবে একটা কথা পল্টু"—

"কি ?"

"তোকেও আসতে হবে সঙ্গে—তুই দূরে, রাস্তায় দাঁড়াবি—আমি বোঁচার ট্যাঁকের মাঝখানে ঘুরে আসব।"

মণ্টু সবেগে মাথা নাড়ল, "কিন্তু প্রমাণ—বুঝব কি করে যে তুমি গিয়েছিলে ?"

"ঠিক—প্রমাণ ?" পল্টু সায় দিল।

বীরু ভাবতে লাগল।

"শোন্"—পল্টু বলল, "আমায় কাছে একটা লাল কাগজের পতাকা আছে সেটা পুঁতে আসবি মাঝখানে।"

"ঠিক।" বীরুর কথাটা মনঃপূত হল।

"তাহলে এই সেটল হল—এঁ্যা ?" পল্টু ইংরিজী মিশিয়ে বলল।

"হ্যা আমি তোর ঘরের জানালার কাছে গিয়ে বেরালের ডাক ডাকলেই তুই বেরিয়ে আসবি—কেমন ?"

"আচ্ছা।" পল্টু সম্মতি জানাল, "এবার তবে বাড়ী যা তুই।"

কিন্তু মণ্টু ভয়ঙ্কর ঘাব্ড়ে গেছে, যাবার আগে সে আর

একবার বীরুকে মিনতি জানাল, "গোয়ার্ত্তুমি করিস্ না বীরু—লক্ষ্মী ভাইটি"—

বীরু বলল, "তুই নিজের চরখায় তেল দেগে যা—আমার জন্য ভাবিস্ না।"

রাত হয়েছে তখন।

মা রান্নাঘর লেপে মুছে, পান খেয়ে, রামায়ণ পড়ে যখন শুয়ে পড়েন তখনই বুঝতে হবে যে রাত প্রায় বারোটা বাজল। বাড়ীতে ঘড়ি নেই, তবু মায়ের কাজই যেন ঘড়ির কাঁটার মত সময়ের নির্দ্দেশ দেয়।

বীরু জেগে বসে ছিল, উত্তেজনায় বুকটা টিপ্ টিপ্ করছিল তার, রক্ত গরম হয়ে উঠে কানের পাশে ঝাঁ ঝাঁ করছিল। মায়ের রামায়ণ-পাঠ যখন থেমে গেল, যখন অখণ্ড নিঃশব্দতা বাড়ীটার ভিতর আসর জমিয়ে বস্‌ল আর বাইরে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন বীরু বুঝল যে সময় হয়েছে। সে তেলের প্রদীপটাকে একটু উস্কে দিল, তাকাল দিদির দিকে। তার দিকে মুখ করেই মালতী ঘুমোচ্ছে, তার ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসির রেখা। আহা! দিদিকে কেমন যেন অসহায় মনে হচ্ছে, ভারী মায়া হল বীরুর। কিন্তু থাক্ ওসব ভাবনা, এবার বেরোতে হবে। কিন্তু দিদি মট্‌কা মেরে নেই তো?

"দিদি—ও দিদি"—ফিস্‌ফিস্ করে ডাকল বীরু।

মালতী কোন সাড়া দিল না।

বীরু এবার গলা চড়াল, পা টিপে টিপে বিছানা থেকে নেমে মালতীর গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকল, "দিদি—এই—শুনছিস্ ?"

না, মালতী অঘোরে ঘুমোচ্ছে, নিশ্চিন্ত হল বীরু। সে এক ফুঁয়ে তেলের প্রদীপটাকে নিভিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

খানিকক্ষণ চোরের মত পা টিপে চলবার পর চলার বেগ সে বাড়িয়ে দিল। উত্তেজনাটা বুকের মধ্যে একটা রবারের বলের মত লাফাচ্ছে। মন্দ লাগছে না ব্যাপারটা। ঠিক যেন একটা খেলা। একটা এ্যাড্ভেঞ্চার।

পল্টুর বাড়ী। শুয়ারটা জেগে আছে কিনা কে জানে ? হয়ত মিছামিছি তাকে হায়রাণ করে বোকা বানাবার ফিকিরে আছে।

আচ্ছা, দেখাই যাক্ না।

"মিঁ—আঁ—ও—ও"—একটা বেড়াল ডেকে উঠল বীরুর গলার ভিতর। নিজের ডাক শুনে নিজেই হেসে আকুল হয় বীরু। হি হি হি—কি মজা ! কিন্তু কোথায়, সাড়া নেই কেন ?

"মিঁ-আঁ-ও-ও-ও-ও"—আবার ডাকল সে। মরিয়ার মত। একটু জোরে। যেন বিড়ালটা চটে গেছে।

এবার জবাব এল, ক্ষীণকণ্ঠে"—ম্যাঁ-ও-ও"—যেন সাড়া দিয়ে দিয়ে বলল ঠিক আছে সব, রাগ করো না।

হি হি হি। আবার অন্ধকারে, মুখে হাতচাপা দিয়ে হাসল বীরু। মন্দ নয় এই খেলাটা।

পরমুহূর্ত্তেই একটা ছায়ামূর্ত্তির মত পল্টু এসে পাশে দাঁড়াল, বীরুর একটা হাত চেপে ধরে চাপা গলায় বলল, "চল্—শিগ্গীর করে"—

হন্হন্ করে হাঁটতে লাগল দুজনে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। আকাশে চাঁদ নেই, রয়েছে অনেকগুলো তারা আর দীর্ঘ-বিস্তৃত ছায়াপথটা। নীচে, গাছপালার ভীড়ের মাঝে মিশকালো অন্ধকার। চলবার সরু পথটাকে ঠিক পরিষ্কার দেখা যায় না, মাথার ওপকার হাজার হাজার তারার আলোতেও কিছু দেখা যায় না। সব কিছুকে ছায়ার মত আব্ছা মনে হয়, মনে হয় একটা অপরিচিত পৃথিবীর অজ্ঞাত রহস্যের দিকে এগিয়ে চলেছে তারা। ভয়? না, ভয় নয়। অবর্ণনীয় একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে সমস্ত দেহ মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

"কিরে, ভয় করছে না তো?" পলটু লঘুকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

"দূর"—

আর খানিকটা। আরো খানিকটা

শেষে একসময়ে পলটু থামল, বলল, "এসে গেছি।"

"কোথায়?"

"ঐ তো দূরে বোঁচার টাঁক—এবার যা তুই।"

সামনের দিকে তাকাল বীরু। হুঁ।

"পতাকাটাকে দে"—সে বলল।

"নে"—

পতাকাটা নিয়ে বীরু বলল, "তাহলে আমি এগোই?"

"আচ্ছা—গোলমাল মনে হলে হেঁকে ডাকবি আমায়।"

বীরু হেসে বলল, "দরকার হবে না রে গাধা। আচ্ছা চললাম"—

এগোল সে। পায়ের নীচেকার মাটী এখন ঠাণ্ডা, মৃদু হিমে ভারী হয়ে উঠেছে। গরু আর মোষের গাড়ী চলার ফলে রাস্তার ধুলো পাউডারের মত মিহি হয়ে উঠেছে, তার ওপর দিয়ে চলতে ভারী আরাম লাগে। শুক্‌নো পাতা ঝরে পড়েছে দু'পাশে

গাছপালা থেকে, পায়ের চাপে সেগুলো মর্‌মর্‌ শব্দে ভেঙ্গে চুরে যায়।

বোঁচার ট্যাঁকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল বীরু। খাড়া পাড়ের ধারে যে আমগাছগুলো তার ডগায় বকেরা বাসা বেঁধেছে। তাদের ছানার কিচ্‌মিচ্‌ শব্দ কান্নার মত মনে হয়। পেছনে, আশেপাশে কালো পরদার মত অন্ধকার। হাওয়া নেই। সামনে অন্ধকারটা ফিকে হয়ে নদীর ওপর আরো ম্লান হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে চিক্‌চিক্‌ করে উঠছে তা নক্ষত্রদের ক্ষীণ আলোতে। সেই অস্পষ্ট আলোর ছোঁয়াচে বোঁচার ট্যাঁককে দেখা যায়। মুহ্যমান, নিঃশব্দ, গম্ভীর। অলৌকিক একটা পরিবেশ। কাঠের দোকানটাকে যেন একটা মুষ্‌ড়ে পড়া মানুষের মত মনে হয়। কোনো মড়া পুড়ছে না এখন, ডোমবাগ্দীদের এক আধ জন যারা এখানে থাকে তাদেরও দেখা যাচ্ছে না। খালি একটা নেড়ী কুকুরকে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকতে দেখা গেল—ঠিক শ্মশানের মাঝখানটায়। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চারদিককার সেই বিরাট গাম্ভীর্য্য ও অন্ধকারে-মোড়া নিঃশব্দতার স্রোত যেন বীরুর দেহমনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

হঠাৎ একটা মৃদু বাতাসের ঢেউ ভেসে এল। মনে হল কারা যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলে উঠল। গায়ে এসে লাগল সেই হাওয়া। মনে হল কে যেন নিঃশ্বাস ফেলল বীরুর গায়ে। বীরু চম্‌কে উঠল, তাকাল, তারপরে লজ্জা পেল। ছিঃ, একি ভাবছে সে কিন্তু তারপরেই সে আবার দমে গেল। বাতাসে একটা উগ্র, পচা দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। পাশের দিকে তাকাতেই আবার চম্‌কে উঠল সে। আগ্নেয় চোখ মেলে কারা যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে! সে একটু নড়ে উঠতেই অদৃশ্য হল সেগুলো। ভালো করে দেখতেই

বুঝল যে ওগুলো একদল শেয়াল। তারা লঘুপদে নীচে নেমে গেল, নদীর জলের নিকটবর্ত্তী কি একটা ধরে কাম্‌ড়া কাম্‌ড়ি করতে লাগল আর তা টের পেয়ে নেড়ী কুকুরটা হঠাৎ সবিক্রমে আত্ম-ঘোষণা করল, নিস্তব্ধতাকে চিড়ে ফেড়ে চীৎকার করে উঠল, শেয়ালগুলোকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ—ওকি! একটি কুচকুচে কালো মূর্ত্তি এসে দাঁড়াল কুকুরটার পাশে, একটা ঢিল কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল শেয়ালগুলোকে। ওঃ—লোকটা হয়ত ডোম কিংবা কাঠের দোকানের চাকর। কুকুরের ডাকটা থামল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পেছন থেকে সুতীক্ষ্ণ একটা কান্নার শব্দ ভেসে এল। একটানা, কাঁপিয়ে কান্না, যেন কোনো ছোট ছেলে ভয় পেয়ে কাঁদছে। বীরুর রক্তে চাঞ্চল্য জাগল, শরীরটার ভিতর কি যেন শিরশির করে উঠল। ভূত! পেত্নী! সে কি ভয় পাবে? দূর —নাঃ। এলেও ভয় পাবে না। মনে মনে এমনি ভেবেও কিন্তু রাম রাম আওড়াল বীরু। কি জানি বাবা, সাবধানের বিনাশ নেই। কিন্তু কে কাঁদে! কে? একটু ঠাহর করতেই সব বুঝতে পারল বীরু। পেছনকার কোনো একটা তালগাছের মাথা থেকে একটা শকুনের বাচ্চার কান্না ভেসে আসছে। অথচ সে ঘাবড়ে গেল! ছিঃ! আত্ম-ধিক্কারে বীরুর মনটা ভরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পলায়নপর শেয়ালগুলো পেছনের জঙ্গলে গিয়ে তারস্বরে চেঁচাতে আরম্ভ করল। ক্যা হুয়া হুক্কা হুয়া। বিশ্রী, কর্কশ সে ডাক। আক্রোশে অন্ধ হয়ে ওরা যেন কষে গাল পাড়ছে, শাপশাপান্ত করছে, ঘোষণা করছে কোনো অশরিরী দানবের আগমন-বার্ত্তা। কার যেন পায়ের শব্দ ধ্বনিত হল পেছনদিকে! শুকনো পাতা দলে পিষে কে যেন আসছে! কোনো পেত্নী? যেমনটি মুখুজ্জে-

মশাই দেখেছিলেন? কিংবা এককড়ির ঠাকুর্দ্দার দেখা ভূতের দল? বীরুকে বুঝি ভয় পাওয়াতে চায়, তাকে দিয়ে বোধ হয় স্বীকার করিয়ে নিতে চায় যে সে ভূত মানে? কিন্তু বীরু কি ভয় পাবে? না। ও কিসের শব্দ তবে? বাতাস, বাতাসের শব্দ। কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে, কেমন যেন গা ছম্‌ছম্‌ করছে, মৃত্যুর এই স্বল্প-পরিচিত রঙ্গমঞ্চে দম যেন আট্‌কে আসছে, আর বেশী কিছুক্ষণ থাকলে হয়ত সে ভয়ই পেয়ে যাবে, বাজী হারবে। তার চেয়ে কাজ শেষ করে চলে যাওয়া উচিত বীরুর।

দ্রুতপদে নীচে নামল বীরু। ঠিক মাঝামাঝি, যেখানটায় একটু বুনোঘাস ঘন হয়ে উঠেছে, সেখানে সে লাল পতাকাটাকে মাটিতে পুঁতে দিল তারপরে সোজা উপরের দিকে উঠতে লাগল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে।

"বল হরি—হরিবোল"—

বোঁচার ট্যাঁক যেন হঠাৎ কথা বলে উঠল। বীরু তাকাল। উল্‌টো দিক থেকে, বোধ হয় নিমডাঙ্গার দিক থেকে, একদল শবযাত্রী আসছে। দলটা ছোট, মাত্র পাঁচ জন লোক। চার জন একটা কাঁচা বাঁশের দোলায় করে মড়া বয়ে আনছে, আর একজনের হাতে একটা ময়লা কাঁচ-ওযালা হ্যারিকেন। মড়ার গায়ের ওপর একটা ছেঁড়া কাপড়ের ফালি, পা পর্য্যন্ত ঢাকা পড়েনি, রোগা কালো দুটো পা বেরিয়ে আছে। দেখে বীরুর গাটা হঠাৎ শিউরে উঠল। লোকটা মারা গেছে! কেন মরে মানুষ?

কৌতূহল জন্মাল বীরুর মনে। কি করে মড়া পোড়ায় ওরা? সে কোনদিন দেখেনি, আজ তা দেখবে। পল্টু হয়ত দাঁড়িয়ে আছে, থাক না খানিকক্ষণ। সে একটু আড়ালে সরে দাঁড়াল।

শবযাত্রীরা নীচে নামল, নদীর ধারে গিয়ে মড়া নামাল। যারা বয়ে আনছিল, তারা মাটীতে বসে পড়ল, পায়ের ঘাম মুছ্‌তে লাগল কাপড়ের খুঁট দিয়ে।

একজন বলল, "ইস্‌, শালার মড়ার ওজন কি হে? আয় বাবা"—

আর একজন মাথা নাড়ল, হেসে বলল, "হয় জী! দেখ্‌তে তো চিমড় লাগে কিন্তু ব্যাটার হাড্ডিতে ভার আছে"—

"ওই গো—ওই"—শবযাত্রীরা মুখ ফেরাল। কাঠের দোকানটার সামনে থেকে খানিক আগে দেখা সেই কুচ্‌কুচে কালো ছায়া-প্রশ্ন করল, "তুমাদের ল্‌করি লাইগ্‌বে তো?"

"না ভাই, লাগবে নাই"—

"কেনে জী—তুম্‌রা কি মড়া পুড়াইবা না?"

"না। পাইসা নাই"—শবযাত্রীদের মধ্য থেকে একজন জবাব দিল। তাদের মধ্যে বুড়োমত লোকটা লণ্ঠন বয়ে আনছিল, সে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "হেই চ্যাংড়ারা—তুরা কি আরাম করবার আইছ—এঁ্যা? চল্‌, মড়াটা ফেইলা দিয়া ঘরত্‌ ফিরা চল্‌"—

"ঠিক, ঠিক বুল্যাছ"—আর সবাই সায় দিল। মড়াটাকে আর একটু নীচের দিকে নিয়ে একপাশে ফেলে দিয়ে তারা ওপরের দিকে উঠে বাড়ীর দিকে ফিরে চলল।

গায়ের লোমগুলো এবার কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠল বীরুর। মড়াটাকে পোড়াল না কেউ! পয়সা নেই বলল, তার মানে ওরা গরীব। 'গরীব' কথাটা মনে আসতেই আগের অভিজ্ঞতাগুলো মনে পড়ল তার। এর জন্য সে তৈরী ছিল না। তার এ্যাড্‌ভেঞ্চারের শেষে যে এমন শোচনীয় দৃশ্য দেখতে হবে তা কি সে জানত! দারিদ্র্য মরা মানুষকেও ক্ষমা করে না, দয়া করে না। মড়াটিকে

পোড়াতে পারল না ওরা। কার মড়া, কে মরেছে, কে জানে। লোকটা সারাজীবন ধরে বোধ হয় না খেয়ে খেয়ে, ন্যাংটো থেকে থেকে লড়াই করেছিল, বাঁচতে চেয়েছিল বণস্মৃতির মত, ভোগ করতে চেয়েছিল রাজার মত—কিন্তু, একি পরিণতি তার ?

প্রায় একছুটেই সে গিয়ে হাজির হল পল্টুর কাছে।

পল্টু শঙ্কিতভাবে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "কি রে, এত দেরী হল যে ! ভয় পাসনি তো ?"

গম্ভীরভাবে বীরু বলল, "না।"

"পতাকা পুঁতে এসেছিস্ ?"

"হুঁ"—

"কিচ্ছু দেখতে পাসনি ?"

"না"—

"ধ্যেৎ—তা কি হয়। একটু গা ছম্‌ছম্‌ও কি করে নি—এ্যাঁ ?"

বীরু সে সব কথার জবাবই দিল না, উদাসভঙ্গীতে কেবল ডাকল, —"পল্টু ?"

"কি ?"

"আজ একদল লোক একটা মড়াকে পোড়াল না, মরা কুকুর বেড়ালের মত ফেলে দিয়ে গেল।"

"ওঃ—এ তো প্রায়ই হয়।" পল্টু একটু নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল। পল্টুর দর্শন বীরুর চেয়ে অনেক বাস্তব, সে বীরুর মত অত অল্পতে বিচলিত হবে কেন ?

"প্রায়ই হয় !" বীরুর বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল, "লোকগুলো বলছিল যে পয়সা নেই—কিন্তু তাই কি ?"

"তা না তো আর কি ?" পল্টু একটু চড়া গলায় বলল। পয়সা

না থাকায় যারা না খেয়ে মরে, রাস্তায় কুকুরের মত শুকিয়ে মরে, তাদের পোড়াবার পয়সা কোথায় পাওয়া যাবে বাবা ? থাক্ ও কথা, বাড়ী চ', অনেক দেরী করেছিস্, অনেক রাত হয়েছে।"

সে থেমে গেল, পাশ ঘেঁষে চলতে চলতে বীরুর পিঠে দুম্ করে একটা কিল্ মেরে বলল, "যে কথা বলছিলাম বীরু"—

"কি ?"

"ইয়ে—তুই—সাবাস্ ভাই !"

"মানে ?"

"বাজীতে জিৎলি তুই, আমি মেনে নিলাম যে তোর সাহস আছে।"

সলজ্জভাবে বীরু বলল, "বাঃ, কাল নিশানটাকে দেখ্ আগে।"

পল্টু মাথা ঝাঁকাল, "ও আমার দেখা হয়ে গেছে।"

গর্ব্বে, আনন্দে বীরুর বুকটা ফুলে উঠল। ভূত থাকুক আর নাই থাকুক, তাতে কারো কিছু এসে যায় না। সাহস করে এগোলে ভয়কে জয় করা যায়। এর পর পল্টু বা মণ্টু কি আর তাকে ভূতের গল্প শুনিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারবে যে বীরু ভূত মানে কিনা ? সে প্রমাণ করে দিয়েছে তার বিশ্বাসই ঠিক—ভূত নেই, থাকলেও ভয়ের কিছু নেই। আঃ। নিজেকে সাহসী জানতে পেরে আরো সাহস বেড়ে গেল বীরুর। বুড়ো বুড়ো লোকেরা যে বোচার ট্যাঁকে যেতে ভয়ে শিউরে ওঠে, সেখান থেকেই ঘুরে এল বীরু ! ইস্, ব্যাপারটা চাট্টিখানি না কিন্তু তবু বুকের ভিতরটা মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে উঠতে লাগল। সেই মরা লোকটা। মরেও তার দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। তাজা মড়ার দুর্গন্ধে শেয়ালগুলো হয়ত আবার এতক্ষণে ফিরে এসেছে, তাদের

ছোরার মত ধারালো দাঁত দিয়ে সোল্লাসে সেই মড়াটার গায়ের মাংস টেনে টেনে ছিঁড়ছে আর চিবোচ্ছে—

উঃ—

বাড়ী।

আকাশটা যেন হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল মাথার ওপর। দাওয়ার ওপর উঠেই পাথরের মত নিশ্চল হয়ে গেল বীরু। বোঁচার ট্যাঁকের মাঝখানে যে ছেলে বাজী রেখে নিশান পুঁতে এল তার সাহস এখন কর্পূরের মত উড়ে গেল, ভূতের ভয়ে যে ছেলে কাবু হয়নি সে ছেলে এখন মানুষের ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। সে মানুষ মা বা দিদি নয়, বাবা।

ঘরের মধ্যে অনন্ত, শিবানী আর মালতী উত্তেজিতভাবে কথাবার্ত্তা বলছিলেন। বীরুর বিষয়ে। কোথায় গেল ছেলেটা? ব্যাপার কি?

কিন্তু লুকোনো হল না।

রাক্ষুসী দিদিটা হঠাৎ দেখে ফেলল তাকে, বলে উঠল, "ওই তো বীরু!"

তার পরবর্ত্তী ব্যাপারটা খুব সংক্ষেপেই বলা ভাল।

অনন্ত অস্বাভাবিকভাবে গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "কোথায় গিয়েছিলে?"

বীরু ভেবে অস্থির হয়ে উঠল, থেমে গেল, "ইয়ে—এই"—

"কোথায় গিয়েছিলে—শিগগীর বল"—

থতমত খেয়ে গেল বীরু, গলাটা শুকিয়ে তার কাঠ হয়ে উঠল। কিন্তু কিছু একটা বলতে হবে তো, চুপ করে থাকলে বাবার মনে হবে যে সে বুঝি খুন করে এল কাউকে।

ক্রুতকণ্ঠে সে বলল, "বাইরে গিয়েছিলাম"—

"বাইরে কেন?"

"ইয়ে"—

"কি ইয়ে?"

"পায়খানায়"—

তর্জ্জনী আস্ফালন করে কঠিনকণ্ঠে অনন্ত বললেন, "তুমি মিথ্যে-বাদী"—

"না"—

"সাবধান বীরু—ভালো চাও তো সত্যি কথা বল।"

সুমতি বললেন, "ছেড়ে দাও—হয়ত তাই গিয়েছিল"—

অনন্ত রেগে উঠলেন, "তোমার পুত্রস্নেহ তোমাকে অন্ধ করে ফেলেছে—দেড়ঘণ্টা ধরে কেউ পায়খানা যায় নাকি? বল বীরু—সত্যি কথা বল"—

আর উপায় নেই। হোক যা হবার।

মাথা নীচু করে বীরু বলল, "বোঁচার ট্যাকে গিয়েছিলাম।"

"বোঁচার ট্যাক! আবার মিথ্যে কথা বলছ!"

"না—এবার সত্যি কথা বলেছি"—

"ওমা! বলিস্ কিরে হতভাগা—বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া"—শিবানী প্রায় আর্ত্তনাদ করে উঠলেন।

"সব খুলে বল—ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হচ্ছে।"

সব বলতে হল।

সব শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। ছেলেটা পাগল না কি? প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে যায় মাঝরাতে উঠে? আর বোঁচার ট্যাঁকে! শ্মশানে! যেখানে রাতের অন্ধকারে ভূত পেত্নীদের সভা বসে, যেখানে মড়ার মাথার ভিতর দিয়ে আওয়াজ তুলে হাওয়া বয়, যেখানে দগ্ধ মাংস নিয়ে পিশাচেরা কাড়াকাড়ি করে।

কলসীভর্ত্তি জল এনে সবাই ঢালল তার মাথায়। এত ঢালল যে শীত করতে লাগল বীরুর। কিন্তু উপায় কি? প্রতিবাদ করে বীরুর সাধ্য কি?

আগুন জ্বেলে সুমতি বললেন, "আগুন ছোঁও পাজী কোথাকার"—

নিঃশব্দে তাই করল বীরু।

মালতী দা'টা নিয়ে এল, বলল, "এতে কামড় দে"—

আবার আদেশ পালন করতে হল।

নিমপাতা নিয়ে এসে শিবানী বললেন, "চিবো এটা"—

আচ্ছা বাবা, তাও সই।

সর্ব্বশেষে অনন্ত বললেন, "কাছে এসো। হুঁ—এবার একঠ্যাংয়ে দাঁড়িয়ে, দু'হাতে দু'কান ধরে, জিভ্ বের করে দাঁড়িয়ে থাক—একঘণ্টা। উহুঁ—তোমায় এখন থেকে আর মার্জ্জনা করব না আমি। আজ এই পর্য্যন্ত—এর পরে আর কোনোদিন অন্যায় কিছু খুঁজে পেলে তোমাকে আমায় বাধ্য হয়ে মারতে হবে। নাও—দাঁড়াও"—

করুণনেত্রে একবার বাপের মুখের দিকে তাকাল বটে বীরু কিন্তু কোনো কোমলতাই সেখানে সে দেখতে পেল না। বাপের কুঞ্চিত ভ্রূ, রেখাসঙ্কুল ললাট আর দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠদ্বয় দেখে নিঃশব্দে তাঁর দেওয়া শাস্তিকেই মেনে নিল বীরু। এতেই যদি দুর্গতির অবসান ঘটে তবে তাই মঞ্জুর বাবা।

প্রজাপতির মত বহু-বিচিত্র বসন্তের দিনগুলো একের পর এক কেটে গেল। আকাশ আর মাটি, আলো আর বাতাস সব কিছুতেই একটা শুক্নো ভাব দেখা দিল, সব কিছুতেই আগুনের আভাষ পাওয়া যেতে লাগল। আমগাছের মুকুল এবার আম হয়ে দেখা দিল।

বীরু যেন সেদিন থেকে হঠাৎ বদ্‌লে গেল। কেমন যেন গম্ভীর, উদাস হয়ে উঠল সে। দিনে রাতে, স্কুলে, মাঠে, বাড়ীতে, সব সময়, সব জায়গায় সেদিনকার শ্মশান-পর্ব্বটা তার মনে পড়তে লাগল। দারিদ্র্য, দুঃখ, অনাহার, মৃত্যু—সবগুলো কেমন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত তাই ভাবতে লাগল সে। একদিন পল্টু বলেছিল যে ইংরেজদের জন্যই এই দুরবস্থা—আর একদল স্বদেশী লোভী মানুষদের জন্য সে অবস্থা আরো বিকট ও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এখন থেকে যখনই সে সুযোগ পেতে লাগল তখনি জানতে চেষ্টা করতে লাগল যে ইংরেজদের জন্য দেশের অবস্থা কতদূর খারাপ হয়েছে। বড়দের আলোচনায় নির্ব্বাক শ্রোতা হয়ে শুনতে লাগল সব কথা, এ বিষয়ে এক আধটা বই পেলেই গোগ্রাসে গিলতে লাগল, তার প্রতিটি বর্ণকে। যত সে শুনতে লাগল, পড়তে লাগল, জানতে লাগল ততই তার উত্তেজনা বাড়তে লাগল। আবার ততই সে হতাশ হয়ে পড়তে লাগল দেশের বিষয়ে। যে ইংরেজেরা পৃথিবী শাসন কচ্ছে, যাদের গুলিগোলা আর কামান বন্দুকের কোনোই অভাব নেই তাদের তারা তাড়াবে কি করে? স্বদেশী আন্দোলন? মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু, জহরলাল আর সুভাষচন্দ্রের কাহিনী সে পড়েছে —সে জানে তাঁরা কেমনভাবে ইংরেজদের সঙ্গে সংগ্রাম করছেন। তাঁরা বলেন যে ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়ালেই লোকের দুর্দ্দশা দূর হবে, তাছাড়া নয়।

মাঝে মাঝে একা একা ঘুরে বেড়াতে লাগল বীরু। মাঝিপাড়া,

সাঁওতালপাড়া, রাজবংশীদের ওখানে, গরীব চাষাদের বাড়ীর আনাচে কানাচে। তাদের অৰ্দ্ধ-নগ্ন, রোগজীর্ণ চেহারা, অজ্ঞতা আর অভাব দেখে তার বুক জ্বালা করতে লাগল, আগ্নেয়গিরির ভেতরে যেমন অগ্নিস্রোত এসে জমা হতে থাকে তেমনি ভাবে একটা আক্রোশের আগুন তার বুকে সঞ্চিত হতে লাগল।

ঘুরতে ঘুরতে আর একটা জিনিষকে লক্ষ্য করল বীরু। পরাধীনতাই একমাত্র দুরবস্থা নয় তার দেশবাসীদের, অভাব আর অজ্ঞতাই তাদের একমাত্র দুঃখ নয়। সে দেখল যে তার দেশের লোকেরা অভিশপ্ত। হাতে গোনা যায় না, এমনি নানা জাত তাদের মধ্যে। বামুন, বদ্যি, কায়েৎ, বৈশ্য, গোয়ালা, শুদ্দুর, ডোম, মুচি, মুদ্দফরাস, সাঁওতাল, রাজবংশী, তিলি, সুবর্ণবণিক, কর্ম্মকার, জেলে, ধোপা, নাপিত—বলে শেষ করা যায় না তাদের সংখ্যা। আর প্রত্যেকে তার নীচের লোকদের ঘৃণা করে। যেমন বড়লোকেরা গরীবদের লাথি মারে, হুকুম করে, তেমনি বড় জাতেরা অন্য জাতের লোকদের ছোঁয় না, চোখ রাঙিয়ে ঘেন্নার সুরে কথা বলে। পল্টুকে জিজ্ঞেস করছিল সে এ বিষয়ে। এমন জাতের বালাই নাকি পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। সেদিন থেকে বীরুর মনে কেমন যেন একটা লজ্জা জন্মাল, সেদিন থেকে সে নিজের পৈতেটাকে কোমরে পেঁচিয়ে লুকিয়ে রাখতে লাগল, যেন একটা কুৎসিত ঘা ওটা, লোকেরা দেখলে সে লজ্জা পাবে।

কিন্তু কি করা যায়? বীরু ভাবে। ইংরেজরা তো আর একদিনেই ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবে না? ততদিন কি লোকেরা এমনি দুঃখ পাবে, অভাব-জ্বালা সহ্য করবে। অভিশপ্ত হয়ে থাকবে?

প্রাণের বন্ধুর পরামর্শ চাইল সে একদিন।

"আচ্ছা পল্টু?"

"কি ?"

"ইংরেজরা না গেলে কি এদের দুঃখ দূর করা যাবে না ?"

"না। করবি কি করে, যতদিন ও ব্যাটারা থাকবে ততদিন আমাদের কোনো ভালো কাজই করতে দেবে না ওরা—সুমুন্দিরা ইয়ে কিনা"—

"সত্যি। কিন্তু তাহলে তো অনেকদিন লাগবে রে পল্টু !"

"লাগুক না—একদিনেই কি ধান গজায় রে বোকা ?"

"তা ঠিক ভাই।"

তাই বটে। একদিনে পৃথিবীতে কিছুই হয়নি, হবে না, হয় না। তুমি আমি আর বীরু চাইলেই কি অঘটন ঘটবে, অসম্ভব সম্ভব হবে ? রথের চাকা না ঘুরলে তো রথ চলে না।

এ তল্লাটে পঞ্চাননপুরের হাটই সব চেয়ে বড়। রোহণপুরের পর এতবড় ধানচালের হাট আর নেই। রাতের অন্ধকার একটু ফিকে হয়ে আসতেই উঁচুনীচু জমির মাঝখান দিয়ে মোষের গাড়ি চলতে থাকে সেদিকে। দূরের গাঁ থেকে রাত থাকতেই বেরোয় সব। তবে কাঞ্চনপুর থেকে পঞ্চাননপুর বেশী দূরে নয় বলে এখানকার লোকেরা ভোর হবার পরেই রওনা হয়। রাতের বেলা ধান বস্তা-বোঝাই করে রাখে, ভোর হলে গাড়ীতে চাপিয়ে রওনা দেয়। মাত্র তিনক্রোশ পথ —বেশী কষ্ট হয় না।

পঞ্চাননপুরের হাট প্রতি সোমবারে হয়। এবারকার হাটের আগের দিন, খেলার মাঠ থেকে ফিরে আসতে আসতে বীরু লক্ষ্য করল যে পল্টু কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক, খেলার মাঠেও সে বেশী কথা বলেনি, খুব গা দিয়ে খেলেনি।

"কি হয়েছে পল্টু ?"

"উঁ ?"

"আজ এমন মনমরা কেন ?"

"দূর, বাড়ীতে বড় বকে আজকাল"—

"সে তো সবাইকেই বাড়ীতে বকে"—

পল্টু মাথা নাড়ল, ছোট ছোট চোখ দুটোকে আরো ছোট করে, ঠোঁট চেপে বলল, "না, মিথ্যে নয়. আমার বাড়ীতে সবাই চামারের মত রাগ করে। ধ্যেৎ, যাব শালার পালিয়ে একদিন"—

বীরু ম্লান হেসে চুপ করে রইল। বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার মত আর কোনো কথাই সে খুঁজে পেল না।

খানিকবাদে সে বলল, "কাল ইয়ে—মানে ছুটি"—

"হ্যাঁ"—পলটু বলল।

"চল্ কোথাও বেড়াতে যাই।"

"কোথায় যাবি ?"

"এই কোথাও"—কথাগুলোকে টেনে সে একটা কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না।

পলটু ভাবতে লাগল, "হুঁ, গেলে মন্দ হয় না—কিন্তু কোথায় যাব ?"—

চুপ করে চলতে থাকে দুজনে। বেশ বোঝা যায় যে পল্টু ভাবছে কোথায় যাবে কাল।

"বীরু—ঠিক করেছি।"

"কোথায় যাবি ?" সাগ্রহে প্রশ্ন করল বীরু।

"পঞ্চাননপুরের হাটে"—

"এঁ্যা! সেখানে যাবি—কেন ?"

পল্‌টুর কণ্ঠে একটু উত্তেজনা সংক্রামিত হল, 'বন্ধুকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে সে বলল, "আরে পঞ্চাননপুরের হাট বাজে নয়, রীতিমত মেলা মনে হবে তোর—আর তাছাড়া দেখবি কত ধান আসে সেখানে—হাজার দু'হাজার গাড়ীর ভীড়ে তুই দিশেহারা হয়ে পড়বি, জানিস ?"

"হুঁ—আচ্ছা যাব।"

হ্যাঁ, যাবে বীরু। ছোটবেলায় একবার মাত্র পঞ্চাননপুরের হাটে গিয়েছিল সে বাবার সঙ্গে। তার স্মৃতি অত্যন্ত ফিকে হয়ে আছে মনে, আসলে তার কিছুই মনে নেই! মন্দ কি, আবার যাবে সে।

"কিন্তু যাবি কি করে ?" সে জিজ্ঞেস করল।

"সে ঠিক আছে, আমাদের যতীন মণ্ডলদের দুটো গাড়ী প্রতি হাটে যায়—যতীনকে বলে ওদের গাড়ীতে চড়ে যাব।"

"চমৎকার"—বীরু খুব খুশী হয়ে উঠল। তিনক্রোশ পথ গাড়ীতে চড়ে যেতে চমৎকার লাগবে। কিন্তু—

"খাব কি ভাই ? যেতে হবে তো সেই সকালে"—সে একটু ভেবে বলল।

"তা ভাবিনি বুঝি ? ও ঠিক হয়ে যাবে, যতীন ক'দ্দিন এর আগে বলেছে—হাটে ওরা রান্না করে খায়, আমরাও খাব ওদের সঙ্গে, নাহয় চাট্টি চাল নিয়ে যাব সঙ্গে করে। বুঝলি না, কষ্ট না করলে ভাই কেষ্ট মেলে না"—

"ঠিক।" বীরু সর্ব্বান্তঃকরণে সায় দিল বন্ধুর কথায়।

কিন্তু কোনো সমস্যাই দেখা দিল না। যতীনকে বলতেই সে খুব খুশী হয়ে উঠল, বলল যে তাদের ভার সে নেবে, খাওয়া দাওয়ার কোনো কষ্ট হবে না।

শুধু মা বাবার অনুমতি নেওয়াটা বাকী ছিল। সেটাও রাতের

বেলা সংগ্রহ করল বীরু—নানা কথা বলে, আব্দার জানিয়ে, অভিমান করে।

সকালে উঠে পেটভরে চিড়ে গুড় দিয়ে জল খেয়ে বেরোল, তারপরে পল্টুকে ডেকে সোজা যতীনের বাড়ী।

তখন রাঙা রোদে চারদিক ঝল্‌মল্ করছে, হাওয়া বইছে ফুরফুর করে। ভেসে আসছে ফিঙে, শালিক আর ঘুঘুর ডাক। সমস্ত প্রকৃতি যেন একটা ফুর্ত্তিবাজ বাচ্চার মত কলরব করছে, দুর্ব্বোধ্য ভাষায় গান গাইছে।

যতীনের বাবা নীলমণি মণ্ডল তখন মোষদুটোকে জল খাওয়াচ্ছিল, বীরুদের দেখে সহাস্যে বলল, "হাটে যাবা বুঝি তোমরা?—আস—আস"—

টোপর দেওয়া গাড়ীটার পেছনদিকে মাত্র দু'বস্তা ধান ছিল, তারি সামনে তারা চারজনে বসল। নীলমণি মণ্ডল একটাকে চালাতে লাগল, অন্য গাড়ীটাকে একজন সাঁওতাল চাকর চালাতে লাগল।

গাড়ী চলল। দু'পাশে উঁচু জমি, তার মাঝখানে রাস্তা। দুধারে নিম, জাম, আম, আর তেঁতুল গাছ। তাতে পাখীদের আসর। ক্রমে সেগুলো পিছিয়ে গেল। বুড়ো শিবতলা ছাড়িয়ে, চৌধুরীদের মজা পুকুরটার পাশ দিয়ে গাড়ী চলল। শেষে গ্রাম পেছনে পড়ল, খোলা মাঠ আরম্ভ হল। দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, দিগ্বলয়ে গাছপালার সারি, আকাশটা ঝুঁকে মাটিকে যেন ছুঁয়ে ফেলেছে দূর দিগন্তে। আর ঢেউয়ের মত কখনো উঁচু কখনো নীচু হয়ে গেছে মাঠটা। সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে নেমেছে আর উঠেছে তার ক্ষেতের অংশ।

ধান নেই, মাঠটাকে কেমন যেন ফাঁকা মনে হয়, দেখে মনে একটা রিক্ততার বেদনা জাগে। ফাঁকা মাঠ, তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট দু'একটা আম গাছ বা অশ্বত্থ গাছ আছে, আছে বাব্‌লা আর তাল গাছ। মাটিতে বিন্নাঘাস। তার মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে রাস্তাটা চলে গিয়েছে। মোষের আর গরুর গাড়ীর চাকার ভারে রাস্তার দু'পাশটা ক্ষয়ে গর্ত্ত হয়ে গেছে। মাঝখানটা উঁচু হয়ে আছে একটা ছোট দে'য়ালের মত। গাড়ী চলতে থাকে, নীলমণি মণ্ডল আর সাঁওতাল চাকরটার হাঁক ওঠে। 'বাঁ—বাঁ—ব্বাঁয়ে চল্। ডা—ডা—ড্ডাহিনে যা—মর্ শালা, এ মোষ কুন্‌ঠে যাছে বা!' বেশ লাগে শুনতে। ঝাঁকুনী লাগে, চামড়ার ওপর চিন্‌চিন্ করে তা লাগলে। মাঝে মাঝে একদিকে হেলে পড়ে গাড়ী চলতে থাকে, মনে হয় যেন গাড়ী উলটে যাবে।

খানিকটা দূর যেতেই একটা গড়ের মত উঁচু জায়গা পড়ে, ঠিক বড় বাড়িটার ধারেই। প্রাচীন কালে গৌড় রাজাদের আমলে ওখানে নাকি একটা গড় ছিল। ভাঙ্গাচুরো ইঁটের পাঁজা আছে মাঝখানটায়, আমজাম আর বড় বড় বটগাছের ঝুরি-মেলা অন্ধকার ছায়ার মাঝে।

"দেখছিস্?" পল্টু বলল।

"হুঁ"—বীরু মাথা নাড়ল।

নীলমণি মণ্ডলের কানে কথাগুলো গেল, সে মুখ ফিরিয়ে বলল, "আগেকালের দিনে কোন্ একজন রাজার বাড়ী ছিল শুইনাছি। জঙ্গলের মাঝে ভাঙ্গা বাড়ী দেখতে পাবা—তবে লোকেরা যাইতে ভয় পায়"—

"কেন?" কৌতূহল হোল বীরুর মুখে চোখে।

নীলমণি মণ্ডল সপাং করে বাঁদিকের মোষের পিঠে এক ঘা চাবুক

মেরে বলল, "সাপখোপ আর কি। তবে অনেকে বল্লে যে ওইঠি নাকি সেই রাজা যক্ হয়ে আছে—মানে যক্ষ—বুইঝাছ ?"

বীরু মাথা নাড়ল।

"যক্ আছে—তাঁই নাকি পাহারা দেয়"—

"কি ?"

"টাকা পাইসা—যাই রাজা থাক্ত তাঁর নাকি অনেক ধনদৌলত ছিল"—

"লোকেরা চেষ্টা করেনি ?"

"কইরাছিল—অনেকদিন আগে, কিন্তুক পায় নাই কিছুই. উপরন্তু তার পরাণটাও গিয়াছিল—সাপের কামহড়ে"—

"ওঃ"—কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে গড়টার দিকে তাকাল বীরু। খোলা মাঠের মাঝে, খোলা আকাশের নীচে যেন ঝিমোচ্ছে জায়গাটা, তার ওপরকার জঙ্গল আর ভগ্নস্তূপের মাঝে প্রাচীনকালের স্বপ্ন, অতীত ঐশ্বর্য্যের গরিমা। হয়ত মিথ্যে নয়, হয়ত ওর মাঝে, মাটির নীচে, নিভৃত কোনো গুপ্ত কক্ষে তাল তাল সোনা আর অজস্র মণি-মুক্তো ও হীরে মাণিক রক্ষিত আছে। অথচ কেউ তা ভোগ করতে পারে না। সেই মরা রাজা যক্ষ হয়ে আগলে রাখে তাঁর গুপ্তধন, মরেও তার ভোগের লালসা মেটেনি। পাতালের অন্ধকারে নিজের ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে দুটো জাগ্রত ও সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দিনরাত সেই রাজা বসে আছে, পাহারা দিচ্ছে, মর্ত্তের জীবন্ত মানুষদের প্রসারিত হাতকে ভেঙ্গে ফেলছে, তাদের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। আশ্চর্য্য।

রোদের তাপ বেড়ে যাচ্ছে। ধুলো উড়িয়ে মোষগুলো ছুটছে। দূরে গাছের ছায়ায় নেংটি পরা রাখাল ছেলে বসে বসে ঘাসের ডগা

চিবোচ্ছে আর অবাক হয়ে একটা চিলের পাক খাওয়া দেখছে। এখানে ওখানে আলের ওপর দিয়ে চলছে দু'একটা লোক, চরে বেড়াচ্ছে গরুর পাল। শুকিয়ে যাওয়া বিলের কাদা থেকে একটা উত্তপ্ত বাষ্প উড়ছে, তার মধ্যে পদ্মের শোভা। আঃ—চমৎকার। বীরুর মনে আমেজ ধরে, সব কিছু নতুন, বিস্ময়কর ও আশ্চর্য্য মনে হয়। নবজাতকের মত বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে সে পৃথিবীকে দেখে, অবাক হয়ে যায়, এই রূপৈশ্বর্য্যময়ী বসুন্ধরার অদৃশ্য স্নেহরসে অভিষিক্ত হয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আঃ—চমৎকার!

হাট। গিজ্ গিজ্ করছে লোকে।

রেবতী দাসের গোলায় ওরা গিয়ে থামল। তার সামনে অনেকখানি জায়গা। গাড়ী আর মানুষদের জন্য রেবতী দাস এ জায়গায় নিম আর আমগাছ লাগিয়েছে। বেশ ছায়া ঘন জায়গা, তার নীচে এক জায়গায় গাড়ীটা থামাল ওরা। গাড়ীর চাকার সঙ্গে বাঁধল মোষদুটোকে, সামনের পুকুর থেকে বাল্তি ভরে জল নিয়ে এসে খইল আর ভূষি মিশিয়ে দিল, গাড়ীর পেছন থেকে দু'আঁটি বিচালি এনে ফেলে দিল তাদের সামনে।

নীলমণি মণ্ডল তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "যাও, তুম্রা হাটে বেড়াও গিয়া আমরা রান্না চড়হাই"—

"চল্ ভাই"—বীরু সোৎসাহে বলল। ভারী ভালো লাগছে তার এই ভীড় আর কোলাহল।

"চল্"—

তিনজনে চলল ওরা। তখন সবে দশটা হবে। হাট তখনো শুরু

হয়নি। কেবল গোলার সামনে গাছপালার নীচে, ধানবোঝাই গাড়ীর পাশে ইঁট দিয়ে উনুন করে চাষীরা রান্না চড়িয়ে দিয়েছে, অনেকের ডাল নেমেছে, ভাত হয়ে এল বলে। আর হাটের আর একপ্রান্তে অন্য সব ব্যাপারীরা ও রান্না করছে, দোকান সাজাচ্ছে। তরিতরকারী থেকে, রেডিমেড্ জামাকাপড়, তেল চিরুনী ফিতে, মিষ্টি, মুড়িমুড়কি বাতাসা, চিনে বাদাম আর চানাচুর, গামছা আর লুঙ্গি, মস্‌লা আর তেলেভাজা, তেলডাল সুজি, পান সুপারি, খেল্‌না পুতুল আর বাঁশি পর্য্যন্ত সব রকমের দোকান পাটই বসে গেছে। চারদিকের গাঁয়ের লোকেরা আর যারা ধান বিক্রি করতে আসে তাদের জন্য এই হাট। রীতিমত মেলা বললেই হয়। আর কত ধানের গাড়ী যে এসেছে উঃ! পল্‌টুর কথাই ঠিক। বীরু অবাক হয়ে গেল। বস্তা বস্তা ধান বোঝাই গাড়ী। গোলায় গোলায় ব্যস্তসমস্ত লোকেরা। এমন ব্যাপার সে আর আগে দেখেনি।

ঘণ্টা দু'য়েক পরে তারা নদী থেকে চান করে এল। এসে দেখল যে ভাত আর একটা মাছের তরকারী তৈরী।

নীলমণি মণ্ডল বলল, "নাও, বসে পড় বাবারা—খাইয়া লাও"—

পদ্মপাতায় করে তারা খেল আর কি মিষ্টিই যে লাগল তা বলবার নয়। নীলমণি মণ্ডল ভারী সুস্বাদু রান্না করেছে।

যতীন হেসে প্রশ্ন করল, "কেমন লাগছে ভাই, এঁ্যা?"

বীরু মাথা নেড়ে বলল, "চমৎকার; ঠিক যেন চড়ুইভাতি খাচ্ছি"—

পলটু সংশোধন করে বলল, "যেন আবার কেন—চড়ুইভাতিই তো"—

খাওয়া দাওয়া সারা হলে নীলমণি মণ্ডল তার ধানের গাড়ীর ওপর গিয়ে বসল।

পাইকারেরা তখন আসা যাওয়া করছে।

"কত কইরা মন হে?"

"কি ধান এঠি—গইজা ধান?"

" কি বুলছ? কাঁচি পাঁচ টাকা চাহছ—আয় গো বাবা"—

"মিলে দিবা ধান—মিলে? চাইর টাকা বার আনা পাইবা জী"—

ওদিকে আর একজনের গোলায় কাঁটা চড়িয়ে ধান ওজন করা হচ্ছে তারপর তা ঢালা হচ্ছে গোলায়। কুলিরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা। কেউ মাথায় করে, কেউ পিঠে।

কোলাহল। উত্তেজিতকণ্ঠের হাঁকাহাঁকি। বিড়ির ধোঁয়া। মোষ আর বলদের রোমন্থন, তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ। গোবর আর ভিজে খড়ের গন্ধ, উনুনের ধোঁয়া আর দর কষাকষি।

বীরুরা আবার ঘুরে বেড়াতে লাগল। ধান—চারিদিকে বস্তা বস্তা ধান। যে ধান সে দেখেছে মাঠের মাঝে তা নিয়ে এত কাণ্ড তাতো বীরু জানত না। অসংখ্য গাড়ী বোঝাই ধান এসেছে চারদিক থেকে। পাইকাররা খরিদ করছে, গোলদারেরা কিনে নিচ্ছে, কিনছে মিলের লোকেরা আর সরকারী এজেণ্টের লোকেরা। বাতাসে ধানের গন্ধ। কিন্তু কোথায় যায় এত ধান? কোথায়?

ঘুরতে ঘুরতে হাটের প্রান্তে আবার গেল ওরা। ভীড় এবার আরো বেড়েছে, সঙ্গে গরম। কিন্তু কে তোয়াক্কা করে গরমকে? ফুর্তিতে প্রাণ ভরপুর, চোখ ধারালো ছোরার মত চকচকে, নিঃশ্বাস দ্রুত। লোকজনেরা কেনাকাটায় ব্যস্ত। বুড়োদের কাঁধে চড়ে ছোট ছেলেরা হাঁ করে দেখছে সব কিছু। কেউ হয়ত বাঁশী বাজাচ্ছে। কেউ কাঁদছে এটা ওটা খাবে বলে। মেলার মত হাটটা গিজগিজ করছে, লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে।

"এই লুঙ্গিটার দাম কত হে ?"

"বাবাগো আমি ঐ লাল জামাটা লিব হুঁ"—

"ছাইড়া দাও মিঞা, ও চাইর পাইসা আর দিবনা হামি"—

"কি বুললা ? এই ত্যালের দাম আড়হাই টাকা ! ইটা কি তোমার সোনার ত্যাল নাকি জী ?"

"বাঃ, ধাক্কাইছ কেনে হে ? তুমি কি অন্ধা নাকি—এঁ্যা ?"

হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়াল বীরু।

"পল্টু, দেখ্"—সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করল।

বাঁদিকের গাছপালার নীচে সারি বেঁধে বসে আছে একদল ভিখিরী। রুগ্ন, অথর্ব্ব, কানা, খোঁড়া। কুদর্শণ লোকগুলো।

"দেখেছি"—পল্টু বলল, "ওরা ভিখিরী"—

"ভিখিরী !" কথাটা বিড়বিড় করে আওড়াল বীরু, তারপরে একটু উঁচু গলায় প্রশ্ন করল, "কিন্তু কেন—ওরা অমন কেন ?"

পল্টু তার হাট দেখতে বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠল, মুখ-বিকৃত করে বলল, "তুই তো আচ্ছা পাগলা বীরু। যারা গরীব, যাদের দুনিয়ায় কিচ্ছু নেই আর যারা খেটে খেতেও পায় না তারাই ভিখিরী হয়"—

"বাঃ, কেন হবে তা ? লোকেরা ওদের খেতে দিলেই তো ভিক্ষে চাওয়া বন্ধ করবে।"

"দেবে কেন লোকেরা, কার এত ফাল্‌তু আছে যে দেবে ?"

"কেন এত এত ধান যারা বিক্রি করছে, যারা কিনছে !"

পল্টু এবার রীতিমত চটে উঠল, "যাঃ, চুপ্ কর্, সেই এক কথা প্রতিদিন জিজ্ঞেস করিস, আর শুনতে ভালো লাগে না মাইরি।

বলিনি তোকে যে যারা বড়লোক তারা নিজেরা ঝোল আনাই চায় বলে আর আমরা ইংরেজদের অধীন বলে এমন হয় ?”

বীরু নরম সুরে বলল, “রাগিস্ না ভাই। আচ্ছা পল্টু কোথায় যায় এত ধান ?”

“অনেক জায়গায়। সরকার কিনে জমা রাখে, যুদ্ধে চালান দেয় সৈনিকদের জন্য। গোলদার আর মহাজনেরা কিনে জমা রাখে, চড়া দামে বিক্রি করে লাভ করে।”

“দাম চড়ায কেন ওরা, তাতে লোকেরা তো কিনতে পারে না, না খেযে থাকে।”

“থাকেই তো, কি যায় আসে ওদের ?”

“হুঁ”—দাঁতে দাঁত চেপে বীরু বলল, “শালারা তাহলে চোর ওদের খুন করা উচিত।”

“করবে কে ভাই ?” যতীন বলল, “সরকার আর বড় ব্যবসাদাররা যে সব সমান—চোরে চোরে যে মাস্তুতো ভাই সম্পর্ক।”

“হুঁ”—আর কথা বলল না বীরু। হঠাৎ তার আনন্দ আর ফূর্তিতে যেন একটা ছেদ পড়ল। সে তাকাল ভিখিরীদের দিকে। কালো কালো চেহারার মানুষগুলো মানুষের মত দেখতে অথচ মানুষ নয। জানোযারের মত খানিকটা তবু জানোয়ারও নয়। মানুষের মত বাঁচে না, জানোযারের মত কেড়ে নিতে পারে, শিকার করতে জানে না, কেবল ছুটো ঘোলাটে, রক্তহীন চোখের অসহায়, কাতর দৃষ্টি মেলে নাকিসুরে ভিক্ষে চায়। ‘দাও, দাও, ভগবান তোমাদের রাজা করবেন।’ অথচ যে ভগবানের ওরা দোহাই পাড়ে সে ভগবান ওদের অবস্থা এমন করল কেন ? কর্ম্মফল ? বাবার কথা ? জন্মান্তরবাদ ? কিন্তু আমরা যদি

সবাই চাই যে ওরা অমন করে ভিক্ষে চাইবে না, ওদের যদি আমাদের অন্নের অংশ বেঁটে দিই, কাজ দিই, তাহলে কোথায় থাকবে জন্মান্তরবাদ আর কর্ম্মফল? তখন থেকেই কেমন যেন চুপ করে রইল বীরু। ভাবতে লাগল।

বিকেল পড়ে আসতেই নীলমণি মণ্ডল ফিরে চলল, বীরুরাও। আবার সেই খোলা মাঠে, খোলা আকাশ, ধূলোর রাশি, ঝাঁকুণি, এবার একটা ছবির মত বিচিত্র ব্যাপার দেখল বীরু। হাট-ফিরতি আরো অনেক গাড়ী পেছন পেছন আসছিল। একটার পর একটা, লম্বা একটা সারি। সে সারিতে অন্ততঃ পঞ্চাশটা গাড়ী ছিল। দেখে বেদুইন ডাকাতদের উটের সারির ছবির কথা মনে পড়ল বীরুর। ওদিকে যেতে যেতে সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়ল। তাঁর রক্তবর্ণ আলো সেই ফাঁকা মাঠের ওপরকার বিন্না ঘাসগুলোকেও সোনালী করে তুলল। আর বিরাট ও শান্ত নীল সমুদ্রের মত আকাশের গায়ে মেঘের দল নানা রঙে রঙীন হয়ে নানা ছবি রচনা করল। কোথাও মনে হল যেন সিঁদূর ছড়ানো রয়েছে, কোথাও সোনালী তুলোর পেঁজা, কোথাও গিনি সোনার বারের মত, আবার কোথাও যেন বেগুনী রংয়ের বেণারসী শাড়ী। এদিকে গাড়ী চলেছে, বাড়ী ফেরার লোভে উত্তেজিত মোষগুলো তাড়াতাড়ি পা ফেলছে, ধূলো ওড়াচ্ছে, আর মাঠ একেবারে ফাঁকা, রাখালের দল আর গরুর পাল এখন নেই। চারদিকের দিগন্ত-স্পর্শী, অবারিত, ঢেউয়ের মত অসমতল মাঠের নির্জ্জনতার ওপর এবার রাত নামবে।

কিন্তু বীরু কি করবে? ভিখিরীদের কথা যে সে ভুলতে পারছে না! সে কি করবে?

কয়েকদিন ধরে বীরু কি যেন ভাবতে লাগল।

খেতে বসে পাতের ডালভাতের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে সে। ক্ষিধে পেলে খাবার চেয়ে যখন মায়ের বিমর্ষ, অপরাধীর মত মুখটা দেখে তখন সে ভাবাকুল হয়ে ওঠে। চলতে চলতে যখন দেখে যে গাছতলায় বসে শুক্‌নো মুড়ি চিবোতে চিবোতে কোনো একজনের চোখ দুটো ছোট হয়ে এসেছে তখন সে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে, যখন সে দেখে যে ন্যাংটো,' কঙ্কালসার ছেলেমেয়েরা গাছতলায় বসে খেলছে তখন সে কাতর হয়ে পড়ে, আর ভাবে।

মাঝে মাঝে গ্রামের শেষ প্রান্তে, নির্জ্জন মুহূর্ত্তে, কোনো একটা আলের ওপর বসে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে বীরু, দূরবর্ত্তী তালগাছের সারি যেন নিঃসীম নীলিম আকাশের গায়ে ছবির মত ঝুলতে থাকে। ডানার ঘায়ে শন্‌শন্‌ শব্দ তুলে, নিস্তব্ধতাকে চমক দিয়ে, বায়ুসমুদ্রে তরঙ্গ-সৃষ্টি করে, একদল বক উড়ে যায়। খানিকটা দূরে গিয়ে আকাশের নীচেকার পুঞ্জীভূত সাদা মেঘের মাঝে পাখীগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। মাঝে মাঝে নাম-না জানা পাখীর ডাকে চারদিকের সব কিছু অপরূপ ও মায়াময় হয়ে ওঠে, রাঙা রোদের মাঝে কোন্‌ একটা অদৃশ্য জগতের ছবি ভেসে বেড়ায়, প্রাণটা কেমন যেন করে ওঠে। আর ঠিক এমনি অবস্থায় কি সব যেন ভাবে বীরু। খুব ভাবে। অনেক চেষ্টা করলে হয়ত তখন জানা যাবে যে রবিনহুড্‌ আর বিশেডাকাতের গল্প ভাবছে বীরু। ভাবছে যে অমনি ডাকাতি করে যদি টাকা পয়সা পাওয়া যেত তবে গরীব দুঃখীদের সাহায্য করত সে।

এমনিভাবেই বসে থাকতে থাকতে একদিন সে তাকাল সেদিকে —যেখানটায় সেই প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষটা আছে। বহুকাল

আগেকার সেই মৃত রাজা যেখানে যক্ষ হয়ে দিনরাত তার অগাধ ঐশ্বর্য্য পাহারা দেয়। সেদিকে তাকিয়েই বীরু কি যেন ভাবল, কি যেন মনে পড়ল তার, সঙ্গে সঙ্গেই উজ্জ্বল, প্রখর দৃষ্টি মেলে ওপরের দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে চেপে ধরল সে আর মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে। যেন কোনো একটা সমস্যার সমাধান করতে পেরে সে নিজেই নিজেকে সমর্থন করল—'হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক বলেছ।'

রবিবার দিন সকালে গিয়ে পল্টুকে ডাকল বীরু।

পল্টু বেরিয়ে এসে দেখল যে গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছে তার বন্ধু। কয়েকদিন ধরেই ছেলেটা বেশী কথাবার্ত্তা বলে না, দেখাশোনা কম করে, খেলার মাঠে গিয়েও দৌড়োদৌড়ি করে না। কি হল বীরুর?

"কিরে, গোম্‌রা-মুখো হয়ে আছিস্ কেন বল্‌তো?"

"পল্টু—দরকার আছে।"

"কি দরকার?"

বীরু তাকাল, তাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠল, ফিস্‌ফিস্ করে বলল। "খুব জরুরী কথা ভাই—গোপন কথা—ইদিকে আয়"—

পল্টু কাছে সরে এসে একটু আগ্রহ দেখিয়ে বলল, "বল্, কি বলবি?"

"তোর কথাই ঠিক"—বীরু বলল।

"আমার কোন কথা?"

"টাকা থাকলে গরীবদের দুঃখ দূর করা যায়।"

"খুলে বল্ বাবা"—সে বলল।

"মানে টাকার সন্ধান পেয়েছি, যা দিয়ে অনেক অনেক লোকের দুঃখ দূর করা যাবে।"

অবিশ্বাসের সুরে পল্টু বলল, "যাঃ—কি যে বলিস্।"

বীরু উত্তেজিত হয়ে উঠল, "মিথ্যে নয়, মাইরি, বড় খাড়ির ধারে যে গড়ের মত জায়গাটা দেখেছিলি তা মনে আছে?"

"আছে।"

"নীলমণি মণ্ডলের কথা মনে আছে—সেই যে একরাজা যক্ হয়ে তার টাকা পয়সা পাহারা দেয়?"

"হুঁ্যা"—

"আমরা সেখানে যাব—সেই টাকাপয়সা উদ্ধার করব।" এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল বীরু। যেন অনেকদূর পথ সে দৌড়ে এসেছে, তাই জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে তার।

অবিশ্বাসের ছায়াটা ঘনীভূত হল পল্টুর মুখে চোখে, ঠোঁটের কোণে জমা হল একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা, সে বলল, "তুই পাগল নাকি রে—এ্যাঁ? নীলমণি মণ্ডলের কথা তুই বিশ্বাস করবি?"

"বাঃ, শুধু সে নাকি, বাবা পর্য্যন্ত বলছেন যে কথাটা সত্যি"—

পল্টুর মুখ এবার আবার সহজ হয়ে উঠল, "তাই নাকি?" সে ভাবতে লাগল।

বীরু বলল, "তা না তো কি? আরে সোনারূপো মণিমুক্তো তো এমনি ভাবেই পাওয়া যায়—যারা সাহসী তারাই তো পায় এসব।"

পল্টু প্রশ্ন করল, "আমরা কি সাহসী?"

বীরু সোৎসাহে বলল, "সাহসী নয় কেন? আমাদের মত কে বোঁচার ট্যাঁক ঘুরে আসতে পারে বল্ তো?"

"হুঁ—তা ঠিক। কিন্তু ইয়ে"—

"উঁ ?"

"যক্ যদি আমাদের মেরে ফেলে"

"মারবে না—মারে কাদের তা জানিস্ ? যারা লোভে পড়ে নিজেদের লাভের জন্য যায়, তাদের। আমরা তো তা করব না, আমরা যা কিছু গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেব, তাদের ভালো করব—তবে ? আমাদের মারবে কেন যক্ ?"

"হুঁ"—

বীরুর যুক্তিগুলো হঠাৎ কেমন যেন অকাট্য ও অভ্রান্ত বলে মনে হল পল্টুর কাছে। সে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

"তবে ? যাবি ?" বীরু উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"যাব।"

"আজই—দুপুর বেলা। কেমন ?"

"আচ্ছা। কিন্তু একটা কোদাল আর খন্তি চাই যে ?"

"আমি জোগাড় করব।"

বীরু বাড়ী ফিরল। চলতে চলতে থমকে দাঁড়াতে লাগল সে। তার চোখের সামনে বারংবার ভেসে উঠতে লাগল স্তূপীকৃত রত্নৈশ্বর্য্যের ছবি। সোনা, রূপো, হীরে মাণিক, মুক্তো আরে প্রবালের ছবি।

ঠিক দুপুরে, যখন সারা গ্রাম মধ্যাহ্ন তন্দ্রায় ঢুলছে, যখন রোদের ধুলোবালি আগুন হয়ে উঠেছে আর গরম বাতাস যখন আবিরের মত

তা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই বীরু আর পলটু বেরোল। রোদ্দুরে ঝাঁ ঝাঁ করছে চারিদিক, আকাশটা যেন গণ্‌গণে উনুন।

হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে চলল দুজনে। একজন বইছে কোদালটা, আর একজন খন্তিটা, ললাট ওদের রেখাসঙ্কুল, চোখে গুপ্তধনের সোনালী স্বপ্ন, নিঃশ্বাস দ্রুত।

গাছপালার ছায়া পেছনে পড়ে রইল। খোলামাঠের ওপর, আল বেয়ে চলল দুজনে। ফাঁকা মাঠেও সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছে হাওয়ার, এত জোরে বইছে তা। দূরের তাল আর বাব্‌লা গাছগুলো মাথা ঝাঁকাচ্ছে। পায়ের নীচে, বিন্নাঘাসের সাদা ফুলগুলো দুলছে, লজ্জাবতী লতার ঝাড়ে পা পড়তেই তা কুঁক্‌ড়ে এলিয়ে পড়ছে।

গড়টাকে দেখা গেল দূরে। শরীরের মধ্যে রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে উঠল ওদের। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল ওরা। মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে গড়টা যেন গাছপালার ছাতা মেলে চুপ করে বসে আছে।

শেষে একসময়ে বীরুর গলা ধ্বনিত হল, "এসে গেছি—ব্যস্‌।"

ওপরের দিকে উঠতে লাগল ওরা। উত্তেজনায় চোখ মুখ ওদের থম্‌থম্‌ করতে আরম্ভ করেছে। এক এক ধাপে রহস্য সমাচ্ছন্ন রত্ন-ভাণ্ডারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। বাব্‌লা, ঝিঁটকিনি আর আঁশশ্যাড়ার জঙ্গলে ভর্ত্তি হয়ে গেছে জায়গাটা অশ্বত্থ আর পাকুর গাছ বাদ্‌শা উজীরের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ঝুরি নেমে প্রায় আসল কাণ্ডের মতই মোটা হয়ে মাটিকে ভেদ করেছে। বাতাসে ভাসছে বুনো লতা আর দ্রোণ ফুলের গন্ধ, ভাসছে বন-মালতীর সুবাস। চারশ পাঁচশ, কিংবা আরো বেশী বছর যেন স্তব্ধ হয়ে আছে এখানকার আম জাম আর তেঁতুল গাছের দুর্ভেদ্য প্রাসাদে, নিজেদের জরাজর্জ্জর ধ্বংসা-বশেষের মাঝখানে। আর তার মাঝে কালো ছায়ার সঙ্গে গা মিলিয়ে

কোথায় যেন সেই যক্ষটা দুটো সদাজাগ্রত চোখের সন্ধানী দৃষ্টি মেলে বসে আছে। অন্ধকারে, মাটির নীচে তাল তাল সোনা, শত শত মনি, হাজার হাজার হীরেমুক্তো আর লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা থরে থরে সাজানো আছে। ভাবতে গায়ের রোঁয়াগুলো সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠল ওদের।

"কোন্ জায়গায় ?" ফিস্ ফিস্ করে পল্টু প্রশ্ন করল।

"হুঁ—সেইটেই ভাবতে হবে।" বীরু কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল।

"মানে ? ভেবে ঠিক করবি, তারপর খুঁড়বি !"

"হুঁ, দাঁড়া। দেখ্, টাকাপয়সা মানুষেরা কোথায় রাখে সাধারণতঃ ? ভিতরে, ঘরের ভিতরে, তাই না ?"

"তাই তো।"

"তাহলে আমাদের আরো ভেতরে যেতে হবে।"

ধ্বংসাবশেষ দেখলে মনে হয় যে বেশ বড় একটি অট্টালিকা ছিল সেখানে। দু'একটা দে'য়াল এখনো খাড়া আছে, বাকী সব ইঁটের পাঁজা। পুরোনো কালের পাৎলা পাৎলা ইঁট। সবশুদ্ধ প্রায় চার পাঁচটা ঘর ছিল বলে মনে হয়। তার চারদিকে দেয়াল, তাতে খাঁজ কাটা ও খুপরি করা—বোধ হয় সেখান দিয়ে শত্রুদের ওপর গুলিগোলা বা তীর বর্শা ছোঁড়া হ'ত। জায়গায় জায়গায় দে'য়ালের একটু একটু আছে, তার গায়ে বিদ্যুতের মত ফাটল করে বটের চারা বেরিয়ে এসেছে, বাকী জায়গায় মাটির সঙ্গে মিলে গিয়েছে।

"আরো ভেতরে! ওদিকে যে ঘন জঙ্গল রে ?" পল্টু একটু ঘাব্ড়ে গিয়ে বলল।

"তা থাকলেই বা, কোদালের ঘায়ে তা কেটে ফেলব।" নির্ব্বিকার-ভাবে বীরু বলল।

বন্ধুর কথা বলার ভঙ্গী দেখে পল্টু মনে মনে লজ্জা পেল। সে কি বীরুর চেয়ে কম নাকি? না বলে বাড়ী থেকে উধাও হয়ে যায় সে, বাইরের অপরিচিত পৃথিবীতে নির্ভয়ে বিচরণ করে বেড়ায়, আজ এই গুপ্তধন বের করার ব্যাপারে সে কি বীরুর চেয়ে পেছিয়ে থাকবে! না।

লতাপাতা আর বুনোগাছের ঝোপ ঠেলে সন্তর্পণে এগোল তারা। পায়ে, গায়ে কাঁটা বিঁধল, তবু ভ্রূক্ষেপ করল না। তারপরে মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়াল। তিনদিকে বুক সমান ভাঙ্গা দেয়াল, একদিক খোলা। মেঝে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে জায়গায় জায়গায়। এখানে ওখানে ছোট বড় নানা গর্ত্ত। চারদিকের গাছপালায় তখন নানা পাখী কলরব করছে। ঘুঘু, শালিক, দোয়েল, শ্যামা, কাক আর বক। আর প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে লতাপাতার মাঝখানে।

"কোন জায়গায়?" পল্টুর আর তর সইছে না, মন্দ লাগছে না ব্যাপারটা তার কাছে! সত্যি, কি মজার ব্যাপার হবে সেই ধনদৌলৎ পেলে!

শর্-শর্ শব্দ। কে? সেই সদাজাগ্রত যক্ষ রাজা এসে কি পেছনে দাঁড়াল! দুজনে তাকাল চারদিকে। না। কিছু নয়, একটা অচেনা পাখী।

বীরু মেঝের দিকে তাকাল। খন্তি দিয়ে দু'তিন জায়গায় ঠুক ঠুক্ শব্দ করল। কোথায়? কোথায় খুঁড়লে পাওয়া যাবে সেই ঐশ্বর্য্যের পাহাড়? হে বাবা বুড়োশিব, হে মা রক্ষাকালী, হে মা মনসা, হে ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ, তোমরা সহায় হও, তোমরা এই উত্তপ্ত দিনের রূঢ় বাস্তবের মধ্যেও অলৌকিক কাণ্ড ঘটাও। দোহাই ঠাকুরেরা। আমরা তো আর নিজেদের জন্য চাচ্ছিনা এই সব টাকাকড়ি, তোমার হতভাগ্য জীবদের জন্যই চাইছি, তোমার কর্ত্তব্য-কর্ম্মে সহায়তা করছি

মাত্র। দোহাই ঠাকুরেরা, যেখানে কোদাল চালাব, সেখানেই যেন থাকে সেই সব হীরেমানিক।

"খোঁড় এই জায়গাটায়"—বীরু একটা জায়গা দেখিয়ে বলল। সেখানে মেঝের ওপর একটা চতুষ্কোণ দাগ ছিল।

"দুর্গা—দুর্গা"—বলে পল্‌টু খন্তির ঘা মারল সেখানে।

বীরু চারদিকে তাকাল। কোথায় সেই যক্ষ রাজা? সে কি এসে বাধা দেবে? দিক্, কিচ্ছু করতে পারবে না সে। মহৎ কাজের বেলায় দেবতাদের আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায়, সেই আশীর্ব্বাদ বীরুদের যক্ষের সমস্ত কোপ ও ইন্দ্রজাল থেকে রক্ষা করবে। কোনো ভয় নেই তাদের।

ঠন্—ঠন্—ঠুক্—ঠুক্—খন্তির শব্দ উঠতে লাগল।

"আরো জোরে মার্"—বীরু বলল।

"হুঁ"—

বেশ খানিকটা খুঁড়ল পল্‌টু। তখন বীরু কোদাল চালাতে আরম্ভ করল। মাটির সঙ্গে বেরিয়ে আসতে লাগল ভাঙ্গা ইঁট পাথরের টুকরো। বন্য লতা আর চারদিককার গাছপালার শেকড়। কিন্তু কোথায় গুপ্তধন? কোনো হাঁড়ি, কোনো প্রকোষ্ঠ কিছুই তো বেরোয় না! চালাও—চালাও, আরো জোরে কোদাল চালাও ভাই, খন্তি দিয়ে মাটি খোঁড়।

হঠাৎ দুজনে চমকে উঠল। কে যেন পেছনে হিস্ হিস্ শব্দ করছে। ত্বরিৎগতিতে পেছনে তাকাল তারা। ও বাবা! সাপ! একটা প্রকাণ্ড বড় গোখ্‌রো সাপ তাদের পেছনকার মাটির স্তূপের কাছে এসে ফণা তুলে মাথা দোলাচ্ছে, হিস্ হিস্ শব্দে গর্জ্জন করছে আর পাৎলা বিদ্যুতের তারের মত জিভ্‌টাকে বের করছে।

"সাপ !" পলটু সম্মোহিতের মত উচ্চারণ করল।

"খবরদার ঘাব্‌ড়াস না—ওকে মারতে হবে।" বীরু দৃঢ়কণ্ঠে বলল।

"কেন ? একটু সরে দাঁড়ালেই তো চলে যাবে ওটা !"

"না—যাবে না। ওকে চিনতে পারলি ?"

"পারব না কেন, ওটা তো গোখ্‌রো সাপ।"

"উঁহু"—বীরু ধীরে ধীরে মৃদু হেসে মাথা নাড়ল, "ওটাই সেই যক্ষরাজা, সাপের ছদ্মবেশে আমাদের তাড়াতে বা মারতে এসেছে।"

"ধ্যেৎ—কিযে বলিস্ মাইরি।"

"হ্যাঁ"—খুব গম্ভীরভাবে বীরু বলল, "বিশ্বাস্ কর। নীলমণি মণ্ডলের সেদিনকার কথা তোর মনে নেই ? সেই যে—অনেকদিন আগে কে একজন এইসব টাকাকড়ি উদ্ধার করতে এসে সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিল ! সে সাপ কে আবার—সেই যক্ রাজা।"

পলটু মাথা নাড়ল। ঠিক, ঠিক। কথাটা অত তলিয়ে ভাবেনি পলটু। তাহলে ? কি হবে ?

"আমরা কি পারব মারতে ওকে—ইস্, কি রকম গজ্‌রাচ্ছে আর মাটিতে ছোবল্ মারছে ভাই, বাপ্ !"

বীরু এবার একটু বিরক্ত হয়ে উঠল, "ওরকম করলে কি কাজ হবে বল্ তো ? ওই সাপ্ না মারলে আমরা কিছুই পাব না। যতক্ষণ যক্ থাকবে ততক্ষণ সে বাধা দেবে, আমাদের পেতে দেবে না।"

"হুঁ—আচ্ছা তবে পিছিয়ে চল"—

"তারপর ?"—

"আমাদের খোঁড়া গর্ত্তের দিকটায় এগিয়ে আসুক ওটা—তখন ওপর থেকে কোদালের একঘা-ব্যস্। কোদালটা আমায় দে দেখি"—

তিনচার পা পেছিয়ে গেল ওরা, গর্ত্তের ওপরে। পল্টু তখন একটা ঢিল ফেলল সাপটার দিকে। ফণা তুলিয়ে হিস্ করে উঠল সেটা, তার তুটো ছোট ছোট চোখ স্থির বিত্যুতের মত চকমক্ করে উঠল। তারপরে ফণা একটু গুটিয়ে গর্ত্তের দিকে সবেগে ছুটে এল সাপটা—তার লক্ষ্য বীরুরা। মুহূর্ত্তের জন্য অস্বস্তিকর একটা অনুভূতিতে শরীর মন ভরে উঠল তাদের, গায়ে কাঁটা দিল, গলা আর ঠোঁট শুকিয়ে উঠল। গর্ত্তের মধ্যে এসে পড়ল সাপটা, একবার থমকে মাথাটা তুলে দেখে নিল তার তুটো মানুষ শিকারকে তারপর আবার এগোতে লাগল।

"মারছি"—পল্টু বলল।

"মার"—বীরু ফিস্ ফিস্ করে বলল।

"আমি মারার সঙ্গে সঙ্গে তুইও মারিস্।"

"নিশ্চয়ই"—

তিনহাত দূরে এল সাপটা!

প্রাণপণে কোদালটাকে তুলে মারল পল্টু। সাপটার মাথার এক বিঘৎ নীচ থেকে তু'টুকরো হয়ে কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর বীরুর খন্তির ঘা পড়ল, ছেঁচে গেল তা। ব্যস্, কাজ শেষ, শত্রু নিপাত গেছে।

"এবার?" উৎফুল্ল ও প্রদীপ্ত মুখে পল্টু প্রশ্ন করল।

"আবার কি? সাপটাকে সরিয়ে আবার খুঁজতে হবে। যক্ তো মারা গেল, আর ভয় নেই।"

"ঠিক।"

কোদাল দিয়ে মরা সাপটাকে টেনে ফেলে দিল ওরা। তারপরে আবার মাটি খোঁড়া আরম্ভ হল।

এদিকে সূর্য্যদেবের রথের সাতটা ঘোড়াই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শান্ দেয়া তলোয়ারের ফলার মত ধারালো রোদ্দুর ম্লান হয়ে এসেছে, ঝোপঝাড় আর জঙ্গলের মাঝে গাছপালাদের লম্বা লম্বা ছায়া আরো কালো ও ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে, ঘুঘুর উদাস ডাক বেড়ে চলেছে। বেলা পড়ে এল। কিন্তু কোথায় গুপ্তধন? কোথায়?

"এ জায়গায় নেই—ওদিকটায় খুঁড়ি চল্"—বীরু বলল। তার কণ্ঠে হতাশা ধ্বনিত হল না কি তা ঠিক বোঝা গেল না।

"চল্"—পল্টুরও কেমন যেন নেশা হয়েছে। আজ কিছু খুঁড়ে বের করতেই হবে। এককালে সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল, রাজধানী ছিল এই সব অঞ্চলে। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে, ভগ্নস্তূপের মাঝে কত লোক কত কি খুঁজে পেয়েছে—এসব তো মিথ্যে কথা নয়। তবে আজই বা তেমনি অঘটন ঘটবে না কেন? পেলে বেশ হয় কিন্তু।

"বীরু"—

"উঁ?"—

"টাকাকড়ি পেলে কিন্তু আমার একটা জিনিষ চাই।"

"কি?"

"পেটভরে শশী ময়রার দোকানে সের তুয়েক ক্ষীরমোহন খাব।"

বীরু রেগে উঠল, চোখমুখ অন্ধকার হয়ে গেল তার, "তুই কি রে? বলিনি যে গরীবদের জন্য আমরা নেব এসব?"

"আমি তো নেব না কিছু, তবে খাব চাট্টি। কেন খাব না? আমিও তো গরীব। তিনদিন ধরে কি দিয়ে ভাত খাই জানিস্? কল্মী শাক্ দিয়ে"—

বীরু স্তব্ধ হয়ে গেল, গভীর মমতায় তার গলাটা ভিজে উঠল, বন্ধুর ওপর রাগ তার জল হয়ে গেল। শুধু কল্মী শাক আর ভাত! আহা!

কিন্তু এখনই কেন লোভটাকে প্রকাশ করে ফেলল পল্টু—যদি কিছু না পাওয়া যায়!

নিঃশব্দে মাটি খুঁড়ে চলল তারা। এখনো বৃষ্টি পড়েনি, মাটি যেন পাথর হয়ে আছে। খুঁড়তে খুঁড়তে গা টনটন্ করে, হাত অবশ হয়ে যায়, ঘামের বন্যায় শরীর ভিজে একসা হয়ে যায়। তব খুঁড়তে হবে। যক্ষকে মেরে ফেলেছে তারা, আর কোনও প্রতিবন্ধক নেই, আর ভয় নেই। পেতেই হবে গুপ্তধন। অসংখ্য লোককে না খেয়ে শুকিয়ে থাকতে দেখেছে তারা, দেখেছে যে অভাবে মানুষ চুরী করে, ডাকাতি করে, মরে শেয়াল কুকুরের ফলার হয়। খোঁড়, মাটি খোঁড় ভাই। মানুষের দুঃখ দূর করতে হলে ভয়ানক কষ্ট করতে হয়, অনেক ঘাম আর রক্তকে ঝরাতে হয়, অনেক প্রাণকে বিলিয়ে দিতে হয়।

কিন্তু কোথায় গুপ্তধন? কোথায়? কোথায়? হে মা দুর্গা, হে বাবা বুড়োশিব, তোমাদের কি কোনো দয়ামায়া নেই, তোমরা কি মানুষের দুঃখ দূর করতে চাও না?

ক্রমে বেলা শেষ হয়ে এল। সূর্য্যদেবের অগ্নিরথ গিয়ে পশ্চিমাকাশের অস্ত-সমুদ্রে ডুব দিল, আকাশের সাদা মেঘগুলো হঠাৎ নানা রঙের ছোঁয়াচে অপরূপ হয়ে উঠল। গড়ের ওপরে, অশ্বত্থ, পাকুর, আম, জাম, তেঁতুল, বাবলা আর ঝিট্‌কিনির জঙ্গলে দিনের আলো কালো হয়ে এল। দূরে উঁচু নীচু পাহাড়ের মত ঢেউ-খেলানো জমির ওপর একটা উদাস বৈরাগ্যের ধূসর ছায়া ঘনিয়ে এল। পাখীরা কলরব করতে করতে ফিরে এল তাদের খড়কুটোর বাসায়। আর দিনের আলোয় যারা অন্ধ হয়ে তাদের নিভৃত আশ্রয়ে নিঃসাড়ে বসে ছিল সেই সব বাদুড়েরা আসন্ন অন্ধকারে তাদের চোখের জ্যোতি ফিরে পেয়ে আহার্য্য-সন্ধানে বেরোতে আরম্ভ করল। কিন্তু কোথায়? কোথায় সেই অতি-বাঞ্ছিত গুপ্তধন?

পল্টু বসে পড়ল মাটিতে, ক্লান্তভাবে বলল, "আর পারছি না বীরু"—

বীরু মাথা নেড়ে সায় দিল, "হ্যাঁ ভাই, কিন্তু"—

পল্টু বিষাদের হাসি হেসে বলল, "আবার 'কিন্তু' কেন ? গুপ্তধন টন কিছু নেই এখানে—ওসব গ্যাঁজাখুড়ি কথা।"

"নেই ?" কেমন যেন করুণ শোনাল বীরুর গলাটা, "আরে খোঁড়া যাক্ না"—

"নেই তবু খুঁড়বি ?" পল্টু এবার চটে গেল, একটু ভেবে পরে বলল, "আর গুপ্তধন পেলেই বা কি হবে রে ? দেশে যে কোটী কোটী গরীব লোক—সবার দুঃখ দূর করতে তো এই গুপ্তধনে কুলোবে না।"

বীরু নিঃশব্দে শুনে যেতে লাগল বন্ধুর কথা।

"আর ধর যে তুই সবাইকে দিলি কিছু কিছু। কিন্তু তারপর ? যা দিলি তাই দিয়ে কি গরীবদের সারাজীবন চলে যাবে, তার ছেলেমেয়ে নাতি নাতনীদেরও চলে যাবে ?—উহুঁ—তবে ? কি দরকার এমন করে ? এমন কিছু করা উচিত আমাদের যাতে ওদের বরাবরকার মত ভালো হয়, বুঝলি না ?"

বীরু জবাব দিল না, নিঃশব্দে ভাবতে লাগল।

"বাড়ী চল্ বীরু—এখানে কিছু নেই।" পল্টু বলল।

বীরু এবার মুখ খুলল, অস্ফুটকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "তাহলে কি করলে ভাল হবে ?"

"দেশকে স্বাধীন করতে হবে"—

"হুঁ—কিন্তু আজ আরো খুঁড়ে দেখব পল্টু—আমি ছাড়ব না।" হঠাৎ উদ্ধতভাবে বীরু বলল, ওর কপাল কুঁচকে উঠলো কতকগুলো দৃঢ়তার রেখায়।

"পাগ্লামো করিস্ না—বাড়ী চল্ বীরু।" পল্টু আবার বলল।

বীরু এবার রাগতস্বরে বলল, "তোর জন্যেই তো এমন হল।"

"আমার জন্যে—বাঃ, কেন ?"

"তা নয়ত কি ? গুপ্তধন পেলে ক্ষীরমোহন খাবি—অমুক করবি—কেন তা বলতে গেলি ? লোভ দেখালি বলেই তো ভগবান দিল না কিছু।"

পল্টু লজ্জা পেল একটু, সে জবাব দিল না।

বীরু চারিদিকে তাকাল। রাত হয়ে আসছে, মাথার ওপর কালো কালো ডানা মেলে বাদুড়েরা উড়ে চলেছে, তাদেরই মত অন্ধকার ডানা মেলে জগৎ চরাচরকে আচ্ছন্ন করে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আর আসন্ন রাতের খবর জেনে, এখানে এই গড়ের ওপরকার গাছপালা-গুলো যেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠেছে, রাতের অন্ধকারে এখানে যেন একটা বিচিত্র নাটক অনুষ্ঠিত হবে—তারই প্রত্যাশায়। রাতের বেলা বোধ হয় এখানে পাঁচশো ছ'শো বছরের পুরোনো প্রাসাদটা আবার ইন্দ্রজালবলে নতুন হয়ে উঠবে, এখানকার মাটিতে মিশে-যাওয়া অসংখ্য অজ্ঞাত লোকেরা জীবন্ত হয়ে উঠবে, হাসবে নাচবে, গান গাইবে। তারই প্রত্যাশায় এখানকার সব কিছু যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। আর ঝিঁ ঝিঁ পোকারা ডাকতে ডাকতে যেন বীরুদের বলছে—চলে যাও। চলে যাও, দূরে যাও, সরে যাও। হঠাৎ কেমন যেন ভয় হল বীরুর, ভাঙ্গাচুরো পুরোনো প্রাসাদের কঙ্কালের মাঝখানকার বাতাসটা যেন কেমন ভারী ও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। না, আর হোল না, পল্টুর কথাই ঠিক। দেশের কোটী কোটী লোকের অবস্থা চিরকালের জন্য ভালো করতে গেলে অন্য কাজ করতে হবে, অন্য পথে চলতে হবে। ঠিক।

"বাড়ী চল্ বীরু। না গেলে কিন্তু আমি এবার তোকে ফেলেই চলে যাব।" পল্টু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল।

বীরু বন্ধুর দিকে তাকাল, মৃদুকণ্ঠে মাথা নেড়ে বলল, "চল্—আমিও বাড়ী যাব এবার"—

ধীরে ধীরে তারা ফিরে চলল। অনেকদূর গিয়ে পেছন ফিরে একবার তাকাল বীরু। বিরাট ও বিস্তৃত মাঠের মধ্যে একটা অন্ধকার কালো পিণ্ডের মত গড়টা দাঁড়িয়ে আছে। তারা চলে এসেছে, এখন হয়ত রাতের অন্ধকারে সেই ইন্দ্রজাল ঘটবে। পাঁচশ, ছ'শো বছর আগেকার হারানো, মরা দিনগুলো আবার প্রাণ পেয়ে ফিরে আসবে, আকাশের তারাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রাসাদের ঝাড়লণ্ঠনের আর মশালের আলো জ্বলবে। আর বহুদিন আগেকার বিস্মৃত ও মরা মানুষেরা জীবন্ত হয়ে নাচবে, গাইবে, হাসবে। ওখানকার সোনাদানা, মণিমুক্তো, চুনীপান্না আর হীরেমাণিক কেউ নিতে পারবে না, ভোগ করতেও পারবে না। আর কি হবে তা নিয়ে? ওতে তো কোটী কোটী লোকের চিরকালের দুঃখ মিটবে না। থাক্, ওই অভিশপ্ত গড়টা পেছনেই পড়ে থাক্, অন্ধকারে মিশে যাক্।

—চার—

তারপরে আবার দিনের পর দিন কেটে চলল। গরীব দুঃখীদের কথা ভেবে মাঝখানে কয়েকটা দিন যেরকম ভেবেছিল বীরু তা ক্রমশঃ কমে এল, গুপ্তধন-পর্ব্বের হতাশা'র পর থেকে কেমন যেন মুষড়ে পড়ল সে। ছোট মাথায় বড় চিন্তাকে কুলোতে না পেরে আবার আগেকার মতই খেলাধূলো, ফল আর ফুলচুরীর মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে ফেলল বীরু। কিন্তু নির্জ্জন মুহূর্ত্তে, রাতের বেলা, ঐ সব সরিয়ে-রাখা ভাবনা আর ছবিগুলো মাথায় ভীড় করে আসত আর অন্ধকারে সাপের মণির মত জ্বলত তার দুটো চোখ, শক্ত হয়ে উঠত তার চোয়াল দুটো।

দিন কেটে চলল। একঘেঁয়ে ভাবে। সেই স্কুলে যাওয়া আর ধনঞ্জয় মাষ্টারের 'কড়াপাকের সন্দেশ' খাওয়া, সেই স্কুল-পালানো আর শাস্তি-ভোগ করা, মাঠে খেলা আর ক্ষ্যাপার মত ঘুরে বেড়ানো।

ক্রমে বৈশাখমাস শেষ হল, জ্যৈষ্ঠে স্কুল বন্ধ হল গরমের ছুটির জন্য। অখণ্ড অবসর। তখন কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে, কাকের পালকের মত কালো রংয়ের মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে বেড়ানো শুরু হল। হাসি-কান্না, আনন্দ ও বেদনার মধ্যে জীবন আবর্ত্তিত হতে লাগল।

শেষে একদিন ছুটী শেষ হল, স্কুল খুলল।

তার কয়েকদিন পরের কথা। এমন ব্যাপার ঘটল সেদিন যে বীরুর জীবনের ধারা বদ্‌লে গেল তখন থেকে। ঘরকুনো, অনভিজ্ঞ ছেলেটা সেদিন বাইরের পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ল। বাইরের পৃথিবীকে দেখেই তার মনের অঙ্কুরগুলো শেষে শাখা মেলে বড় হয়ে উঠেছিল, তাকে সত্যিকারের মানুষ হবার মত প্রেরণা জুগিয়েছিল।

ব্যাপার এই।

আমের সময় তখন। আম অনেকদিন আগেই পেকেছে। গোপালভোগ, ল্যাংড়া, ক্ষীরসাপাতি, অমৃতভোগ আর লক্ষ্মণভোগ তখন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ফজ্‌লী তখনো বাকী। নদীর ধারে, চৌধুরীদের কয়েক বিঘা জমির ওপরকার মস্ত বড় আমবাগানের ফজ্‌লী আমগুলো মানুষের জিভে জল আনে। সেই আমের লোভেই ব্যাপারটা ঘটল।

তখন ওরা সবাই স্কুলে। দুটো অঙ্ক ভুল করায় ধনঞ্জয় মাষ্টারের কাছে অনেকগুলো গাট্টা খেয়ে বীরুর মন খিচ্‌ড়ে গেল। খানিকবাদে, বোর্ডের ওপর আরো দুটো অঙ্ক দিয়ে, ধনঞ্জয় মাষ্টার তাঁর মোটা শরীরটাকে এলিয়ে দিলেন, মাথাটাকে রাখলেন টেবিলের ওপর। আজ ঠেসে আম খেয়ে এসেছেন, তাই ঘুম পাচ্ছিল তাঁর। দেখে ছেলেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাক্, খানিকক্ষণ বেশ কেটে যাবে, তারপরেই তো ঘণ্টা বেজে উঠবে।

ঠিকই তাই হল। একটু বাদেই ধনঞ্জয় মাষ্টারের মোটা নাক আর হাঁ-করা মুখ থেকে একটা বিদ্‌ঘুটে মৃদু শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল। ঘর্‌র্‌র্‌—ফোঁস্—ফোঁস্।

বীরু পল্টুকে খোঁচা মারল, "এই"—

"কি ?"

"চল্—পালাই"—

"যদি হোঁৎকাটা জেগে ওঠে ?"

"জাগবে না—ওই কুম্ভকর্ণের ঘুম কি সহজে ভাঙ্‌বে। চল্"—

"কিন্তু"—

"আরে একটু বাদেই তো ঘণ্টা বাজবে, পিরিয়ড তো শেষ হয়ে এল, চল্ ফজ্‌লী আম চুরী করিগে চৌধুরীদের বাগানে"—

"বাগানটা এক পচ্ছিমার কাছে বিক্রি করেছে না?"

"হ্যাঁ"—

"ওরা তো কড়া পাহাড়া দেয়।"

"দিলেই বা—ফাঁক পাওয়া যাবেই। যারা পাহারা দেয় তাদের তো আর রাবণের মত দশটা মুণ্ডু নেই যে চারিদিকই দেখতে পাবে।"

"চল্ তবে।"

বীরু মণ্টুকে ডাকল, ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "শোন্, হাতীটা জিজ্ঞেস করলে বলবি যে আমি জল খেতে গিয়েছি। বুঝলি? আর আমাদের বইগুলো দেখিস্ তুই, কেমন?"

"আচ্ছা ভাই—বলব।" মণ্টু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

চুপি চুপি পেছনদিককার জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল দু'বন্ধু। কেউ দেখতে পেল না, কেবল নণ্ড তাদের যেতে দেখল। তিনচার মাস আগেকার সেই লাঞ্ছনার স্মৃতি তার মনে তখনো দগ্‌দগে ঘায়ের মত জ্বালাময় হয়ে ছিল; চুপ্‌চাপ্ থাকলেও সে আহত বাঘের মতই সুযোগ খুঁজে বেরাচ্ছিল এতদিন ধরে। আজ সেই সুযোগ পেল সে, চোখের সামনে দুই শত্রুকে পালাতে দেখে একটা বর্ব্বর উল্লাসে তার বুক ফুলে উঠল।

কয়েকমিনিট পর।

নণ্ড গিয়ে ধনঞ্জয়বাবুর পাশে দাঁড়াল, ডাকল, "মাষ্টারমশাই—মাষ্টারমশাই"—

জবাব হল—ঘরঘর—ফোঁস্—ফোঁস্—

ছেলেরা মুখে হাতচাপা দিয়ে হাসি থামাল। মণ্টু ঘুমোবার ভাণ করে ভেংচাল ধনঞ্জয়বাবুকে।

নণ্ড আরো জোরে ডাকল, "শুনছেন—মাষ্টারমশাই"—

ধনঞ্জয়বাবুর ঘুমের প্রাসাদ হঠাৎ হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল, চম্‌কে মাথা তুললেন তিনি, দুটো রক্তবর্ণ চোখ কচ্‌লে নণ্ডর দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি হল, এঁ্যা? হেডমাষ্টারমশাই নাকি?"

"না"—

"তবে ডাকলে যে? আঃ—বেশ জমে উঠেছিল ঘুমটা, দিলে তো মাথা ধরিয়ে"—জমিদার-নন্দনকে সস্নেহ তিরস্কার করলেন ধনঞ্জয়বাবু, তারপরে প্রশ্ন করলেন, "কেন ডাকছ বল তো?"

নণ্ড হেসে বলল, "পালিয়ে গেছে স্যার"—

"পালিয়ে গেছে! মানে? কি পালিয়েছে, কে পালিয়েছে?"

সমস্ত দাঁতগুলোকে বিকশিত করে নণ্ড বলল, "বীরু আর পল্টু স্যার।"

"এঁ্যা!" বিরাট মুখব্যাদান করলেন ধনঞ্জয়বাবু, যেন কথাটা বিশ্বাস করতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, তাকালেন পেছন দিকে। কৈ, কোথায় বীরু আর পল্টু? হুঁ, নেই, পালিয়েছে ওরা, নণ্ডর কথা তাহলে মিথ্যে নয়।

"পালিয়েছে, না? পালিয়েছে বদ্‌মায়েসেরা"—ধনঞ্জয়বাবুর গর্জ্জনের চোটে ক্লাস কেঁপে উঠল।

মণ্টু মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়াল, বন্ধুদের বাঁচাবার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি বলল, "না স্যার"—

ধনঞ্জয়বাবু তাকালেন তার দিকে, "কি বলছিস্ তুই?"

"ওরা পালায়নি—নণ্ড মিথ্যে কথা বলছে।"

"মিথ্যে বলছে!" বিচ্ছিরী একটা হাসি ফুটে উঠল ধনঞ্জয়বাবুর মুখে। নণ্ডও নিঃশব্দে হাসল।

ধনঞ্জয়বাবু মণ্টুকে প্রশ্ন করলেন, "তাহলে আসলে কি হয়েছে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এঁ্যা ?"

"ওরা জল খেতে গেছে"—শুক্‌নো গলায় মণ্টু বলল।

"বটে! আচ্ছা দেখছি। এই—এই জিতে, যা তো বাইরে, দেখে আয় তো ওরা সত্যি জল খাচ্ছে কিনা—যা।"

জিতু নামক ছেলেটি বাইরে গেল।

ধনঞ্জয়বাবু ক্লাসের মধ্যে পায়চারী আরম্ভ করলেন, "জল, জল খেতে গেছে না ছাই, হারামজাদারা নির্ঘাৎ পালিয়েছে। আচ্ছা"—হাত তুটো মুঠি পাকিয়ে তিনি বললেন," অনেক জ্বালিয়েছে, আর না, আজ ওদের এমন শিক্ষা দেব যে বাপের নাম ভুলে যাবে।"

জিতু ফিরে এল।

"কি হল ?" উদ্‌গ্রীব হয়ে ধনঞ্জয়বাবু তাকালেন তার দিকে।

"নেই ওখানে।" জিতু মাথা নেড়ে বলল।

নণ্ড আবার নিঃশব্দে হাসল তার ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো মেলে।

ধনঞ্জয়বাবু একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, "নেই! তা তো জানতামই আমি। আচ্ছা, বুনো ওলের জন্য বাঘা তেঁতুল আছে বাবা, এ্যায়সা টিট্ করে দেব যে জীবনে তা ভুলতে পারবে না। হুঁ—এবার ? মহারাজ যুধিষ্ঠির, তোমার কথা যে মিথ্যে হয়ে গেল ?" তিনি মণ্টুর দিকে এগোতে লাগলেন।

মণ্টুর মুখ শুকিয়ে গেল, শুক্‌নো তালুটাকে জোর করে ভিজিয়ে তুলে সে একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করল কিন্তু শেষে থেমে গেল। কি হবে বলে ? যাই বলুক না কেন সে, ঐ অতিকায় মাষ্টারমশাই তাকে রেহাই দেবে না। তার চেয়ে নিঃশব্দে তু'এক ঘা হজম করাই ভাল।

মন্টুর কাছে গিয়ে ধনঞ্জয়বাবু হাসলেন, "আহা, মহারাজ যুধিষ্ঠির কি সত্যবাদী! বন্ধুদের বাঁচাবার জন্য কি আপ্রাণ চেষ্টাই না করলে! সাধু, সাধু—তোমায় কিছু সন্দেশ খাওয়ানো উচিত মহারাজ, তাই না?"

খট্‌খট্ কয়েকটা গাট্টা মেরে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন, নগুকে বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে চল—হেডমাষ্টারমশাইকে সব বলতে হবে। আজ আর আমি ছাড়ব না ওদের"—

সব শুনে হেডমাষ্টারমশাই গম্ভীর হয়ে উঠলেন। আড়নয়নে একবার তিনি তাকালেন নগুর দিকে, বুঝতে পারলেন সমস্ত ব্যাপারটা। কিন্তু তবু—বীরুরা যে অন্যায় করেছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। খুব ভাবলেন হেডমাষ্টারমশাই। বহুবার তিনি বীরুদের সতর্ক করে দিয়েছেন, বহুবার শাস্তি দিয়েছেন, তবু ফল হয় নি। তিনি হৃদয় চেনেন, কোন ছেলে আসলে কি তাও তিনি জানেন কিন্তু তাই বলে ডিসিপ্লিন ভাঙ্গা যায় কেমন করে? না, এবার একটু কড়া ব্যবস্থা করতে হবে।

তিনি ধনঞ্জয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "হুঁ, আপনার কথাই ঠিক, ওদের একটু শিক্ষা দেওয়া উচিত। কয়েকটি ছেলেকে তবে পাঠান ওদের ধরে আনার জন্য।"

ধনঞ্জয়বাবু হেডমাষ্টামশাইয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নগুকে বললেন, "তুমি আরো চার পাঁচজনকে নিয়ে ওদের ধরে আনতে যাও—একেবারে যাকে বলে এ্যারেষ্ট্ করে নিয়ে আসবে, বুঝলে?"

নগু একগাল হেসে বলল, "তা কি আর বুঝিনি? বুঝেছি স্যার"—

নগুর সঙ্গে গেল জিতু, পাঁচু, হরেন, বিমল আর হাঁদু। ওরা এখনো নগুর দলেই ছিল, যদিও বাইরে তা প্রকাশ করত না

বেশী। জমিদারের ছেলের সঙ্গে শত্রুতা করতে তাদের মন সায় দেয়নি, তাছাড়া নণ্ড তাদের নানাভাবে খুশী রাখার চেষ্টা করত। জলখাবারের অংশ দিয়ে, বাজার থেকে ভালো মন্দ এটা ওটা খাইয়ে সে তাদের কৃতজ্ঞ করে রেখেছিল। তাই আজ নণ্ডকে খুশী করার সুযোগ পেয়ে তারা একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

"কোথায় যাব প্রথমে?" পাঁচু প্রশ্ন করল।

নণ্ড ঠোঁটটা উল্‌টিয়ে মাথা নাড়ল, "তাই ভাব্‌ছি—হুঁ"—

"প্রথমে আমরা সেই মজা পুকুরটার ধারে যাই, কেমন?"—হাঁদু প্রস্তাব করল।

"পুকুরের ধারে। আচ্ছা চল, দেখাই যাক্। মোট কথা, আজ আর ছাড়ছি না ওদের, নিয়ে যাবার আগে এ্যায়সা মেরামত করতে হবে ওদের যে শালারা যেন বাপের নাম ভুলে যায়, বুঝলি?"

হাঁদু হা হা করে হেসে উঠল। বেশ মোটা সোটা চেহারা হাঁদুর, কাউকে কিল ঘুসি মারতে পারলে ভারী খুশী হয়ে ওঠে। বীরু আর পল্টুকে মারবার ছবিটা কল্পনা করে সে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

সে বলল, "শালাদের কিছুদিন ধরে বড়া ডিং হয়েছে মাইরি—আজ গদাম্ গদাম্ ঘুষি মেরে সে ডিং সব বের করে দেব, হা হা হা"—

আর সবাইও সশব্দে হেসে উঠল।

হাসি থামিয়ে নণ্ড বলল, "থাক্, আর হাসলে কিন্তু চলবে না ভাই। আমাদের সি, আই, ডি'দের মত চুপচাপ, লুকিয়ে লুকিয়ে চলতে হবে, ক্যাঁক্ করে আসামীদের ধরতে হবে, বুঝলি?"

সবাই মাথা নেড়ে নিঃশব্দে চলতে আরম্ভ করল। চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—দ্রুতপদে।

কিন্তু মজা পুকুরের ধারে তো কেউ নেই। দুপুরের রোদে ঝিমোচ্ছে পুকুরটা, গভীর একটা স্তব্ধতা ঘনিয়ে এসেছে চারদিকের ঝোপের মধ্যে আর শুঁড়ি পানা ভর্ত্তি পুকুরের বুক থেকে একটা উত্তপ্ত বাষ্প পাক খেয়ে খেয়ে আকাশের দিকে উঠছে।

"কোথায় গেল ব্যাটারা?" জিতু প্রশ্ন করল।

"বাড়ীতে গিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে না তো?" হরেন বলল।

"আরে না না, তা নয়"—পাঁচু বিরক্ত হয়ে হরেনকে বাধা দিল।

বিমল একটু হেসে বলল, "শোন্ নগু—একটা কাজ করলে হয় না?"

"কি কাজ?"

"এই একটু বেড়িয়ে টেড়িয়ে ইস্কুল ভাঙ্গবার সময় গিয়ে বলব যে ওদের আমরা পাইনি। এই রোদ্দুরে পুড়ে কি লাভ হবে?"

নগু চোখ ছোটো করে তাকাল বিমলের দিকে, দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "হয়েছে হয়েছে—তোর মত সাধু হয়ে আমার লাভ নেই। রোদে পুড়ে যাই সোভি আচ্ছা কিন্তু আজ ওদের ধরে বেদম মার দেব আর খাওয়াব—হ্যাঁ।"

বিমল কাঁচুমাচু হ'য়ে গেল।

হাঁদু সায় দিল, "নিশ্চয়—আলবৎ"—

পাঁচু তাদের বাধা দিয়ে বলল, "ওসব তো বুঝলাম কিন্তু এবার কোথায় যাওয়া যায়?"

নগু বলল, "আমাদের আমবাগানের দিকে চল্ তো—নিশ্চয় শালারা আম চুরী করতে গেছে। বেশ হবে তাহলে, খোট্টা বাগানওয়ালাদের দিয়ে ওদের মাথা ফাটানো যাবে।"

ঠিক মহানন্দার ধার ঘেঁষে বাগানটা। রকমারী আমগাছে ভর্ত্তি, বেশীর ভাগই ফজ্‌লী। ঘন গাছের ছায়ায় জায়গাটা ঠাণ্ডা, মনোরম হয়ে আছে।

সেই বাগানেরই গোড়ার দিকে নন্তুরা বীরুদের খুঁজে পেল।

পা টিপে টিপে, পাঁচজনে বিশহাত দূরে দূরে থেকে, একলাইনে বাগানের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছিল, গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিক পর্য্যবেক্ষণ করছিল। এমনিভাবে এগোতে এগোতে হঠাৎ ওরা থমকে দাঁড়াল। প্রায় দু'শো গজ দূরে, নদীর ধার ঘেঁষে একটা মস্ত বড় ফজ্‌লী গাছের ওপরে দুই বন্ধু বসে আছে আর একটা দুটো করে আম ছিঁড়ে কোঁচড়ে রাখছে। আগে আরো কিছু আম পেড়ে তারা নীচে জমা করে রেখেছে। আনন্দে ফুর্ত্তিতে তাদের চোখমুখ উজ্জ্বল। নন্তু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সবার দিকে তাকাল, ফিরে যেতে নির্দ্দেশ দিল।

চুপচাপ কিছুদূরে ফিরে গিয়ে জমা হল সবাই।

নন্তু বলল, "তোরা পাঁচজনে এখানে পাহারা দে, আমি পাঁচমিনিটে আসছি—বাগানওয়ালাকে খবর দিয়ে"—

পাঁচু বলল, "আচ্ছা।"

"দেখিস্ যেন চলে না যায়, যে ভাবেই হোক ধরতে হবে ওদের"—

"নিশ্চয়"—পাঁচু মাথা নাড়ল।

সেখান থেকে দৌড় মারল নন্তু। যত জোরে ছুটতে জানে তত জোরেই সে দৌড়োল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সে বাগানের ভেতর দিকে গিয়ে হাজির হল। সেখানে পশ্চিমা বাগানওয়ালা অযোধ্যাপ্রসাদ তেওয়ারী তার আটদশজন চাকরবাকর নিয়ে তাদের খড়ের ছাউনী দেওয়া ঘরের মধ্যে গল্পগুজব করছিল। দশ হাজার টাকায় বাগান কিনছে সে, সর্ব্বদা যক্ষের মত বাগান আগ্‌লায়।

নগুর পায়ের শব্দে অযোধ্যাপ্রসাদ ফিরে তাকাল, জমিদার-পুত্রকে চিনতে পেরে হেসে বলল, "কি খবর খোঁখাবাবু, এ সময়ে হঠাৎ আসিয়েছেন যে! কুছু লিবেন নাকি?"

নগু বলল, "সর্ব্বনাশ হয়ে গেল তেওয়ারীজী"—

অযোধ্যাপ্রসাদ উঠে দাঁড়াল, "সর্ব্বনাশ হইল! কি বল্‌তে-সেন খোঁখাবাবু?"

"হাঁ—আমাদের ক্লাসের দুটো ছেলে এসে তোমার আম পাড়ছে আমরা তাদের ধরতে এসেছি, তোমরাও এসো"—

"হাঁ? এ্যায়সা বাৎ? চলো তো গঙ্গাশরণ, রামলাল, চলো সব্ কোই জী।"

সবাই উঠে দাঁড়াল, দু'একজন হাতে লাঠিও নিল।

ছুটতে ছুটতে নগু বলল, "চারদিক থেকে ঘেরাও কর্ত্তে হবে, বুঝলে তেওয়ারীজী?"

"হাঁ হাঁ—ঘেরতে হোবে—ঠিক বাৎ"—

"তারপর একচোট মার দিতে হবে, কেমন?"

"জরুর, মারকে হালুয়া বানাবো খোঁখাবাবু"—

"চল—জলদি চল"—বীরুদের ভবিষ্যৎ কল্পনা করে পরম তৃপ্তিতে নগুর মন ভরে উঠল।

"এ শিউনাথ, জল্‌দী চল্ রে বউয়া"—

আসল জায়গায় ফিরে এল তারা। নগুর কথামত বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে চারদিক থেকে বেষ্টন করল বীরুদের। যখন তারা গাছটা থেকে প্রায় একশ'হাত দূরে তখন বীরুদের নজর পড়ল অভিযানকারীদের ওপর।

পল্টুই প্রথমে দেখতে পেল, সে চেঁচিয়ে বলল, "নগুরা খোট্টাদের নিয়ে আমাদের ধরতে এয়েছে রে বীরু"—

"এঁ্যা!" বীরু চম্‌কে উঠল।

"হাঁ।"

বীরু তাকাল। তাইত! সমূহ বিপদ উপস্থিত। এবার?

"কি করবি পল্টু?"

"আবার কি করব—প্রথমে আম ছুঁড়ে মারব—পরে নদীতে লাফ দেব"—

"লাফ দেব—হাত পা ভাঙ্গবে না?"

"লাফ না দিলেও ওরা ভাঙ্গবে। নণ্ড আজ শোধ নেবার সুযোগ পেয়েছে যে"—

"হুঁ"—

অযোধ্যাপ্রসাদ এবার গর্জ্জন করে ডাকল, "এই—শুন্‌তেছ? লামিয়া আস—জল্‌দি"—

নণ্ড বত্রিশপাটি দাঁত বের করে বলল, "নেমে আয় পল্টু, হেড-মাষ্টার মশাই তোদের ধরে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন।"

পল্টু মুখ ভেংচাল, "ওরে আমার কালেক্টার সাহেব রে—যা যা, আমরা যাব না।"

অযোধ্যাপ্রসাদ তার গলার আওয়াজকে আরো চড়াল, হাতের লাঠিটাকে আস্ফালন করে বলল, "হামার গাছের আম চুরিযেছ—তোমাদের আমি মজা চিখাব—লামিয়া আস"—

বীরু চেঁচিয়ে বলল, "তোমরা ফিরে যাও—তবে নামব আমরা"—

অযোধ্যাপ্রসাদ সবাইকে নিয়ে গাছের নীচে গিয়ে পৌছোল, ওপরের দিকে তাকিয়ে শেষবারের মত বলল, "ভালো চাও তো লামিয়া আস বান্দর ছেলিয়ারা"—

বীরু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "আমাদের বাঁদর বলো না—খবরদার"—

অযোধ্যাপ্রসাদ মাটি থেকে প্রায় একহাত লাফিয়ে উঠে বলল, "বুলবই তো—হাজারবার বুলব"—

"তাহলে তুমি হনুমান"—

"কি বুললে! হনুমান! আঁয়?" অযোধ্যাপ্রসাদের দুটো চোখ ঠিক্‌রে বেরোবার উপক্রম করল।

"হাঁ—আর তোমার সঙ্গীরা সব জাম্বুবান।"

নন্তু চীৎকার করে বলল, "গাছে চড়ে পড় তেওয়ারীজী—ধর ওদের"—

অযোধ্যাপ্রসাদ তার লোকদের হুকুম দিল সঙ্গে সঙ্গে, "ঠিক—পাক্‌ড়ো জী বদ্‌মাস্‌লোগ্‌কো"—

দু'জন লোক গাছে চড়তে যাচ্ছিল এমনি সময় থান ইঁটের মত দুটো আম এসে তাদের গায়ে পড়ল। 'আয় বাপ্‌' বলে লোকগুলো নীচে নেমে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নন্তুরা মাটি থেকে ঢিল পাটকেল যা পেল তাই ছুঁড়ে মারতে লাগল। কিন্তু আমের কাছে কোথায় লাগে তা। আমের ঘায়ে জর্জ্জর হয়ে উঠল সবাই আর অযোধ্যাপ্রসাদের রক্তেও ততই আগুন জ্বলে উঠতে লাগল। কান-ফাটানো চীৎকার করে এদিক ওদিক পায়চারীই করতে লাগল সে, আর কিছুই করতে পারল না। কিন্তু কত আম ছুঁড়বে বীরু পল্টু? তাদের কোঁচরের আম প্রায় ফুরিয়ে এল, মাত্র তিন চারটে বাকী তখন, বাধ্য হয়ে থামতে হল তাদের।

বীরু ভাব্‌নায় পড়ল। জলে লাফাতে হবে বটে তার আগে এদের একটু ছত্রভঙ্গ করে দিতে হবে। কিন্তু কি করে? হঠাৎ তার কি একটা জিনিষ মনে পড়ল। সে তাকাল। ঠিক সামনের গাছের ওপরকার ডালে একটা প্রকাণ্ড বড় মৌমাছির চাক দেখছিল সে

খানিক আগে, সেটারই ওপর তার নজর গিয়ে থামল। অব্যর্থ লক্ষ্যে সে দুটো আম ছুঁড়ে মারল তার ওপর। মুহূর্তে বন্—বন্—ভোঁ—ভোঁ—শব্দ উঠল আর দম্‌কা হাওয়ার মত সবেগে ছুটে এল সমস্ত মৌমাছিরা, কামড়াতে আরম্ভ করল নীচের বীরপুরুষদের।

পল্টু হেসে উঠল, বলল, "সাবাস্—সাবাস্ বীরু"—

বীরু বলল, "আর কথা নয়, লাফ দে ভাই"—

"দে লাফ"—

একটু নীচের ডাল ধরে ঝুলে পড়ে তারা জলের ওপর লাফ দিয়ে পড়ল। প্রায় বারোচোদ্দ হাত উঁচু থেকে। ঝপাং করে একটা শব্দ হল। সবেগে জলের নীচে গিয়ে কাদামিশ্রিত বালুর মধ্যে তাদের পা ডুবে গেল। জলের ওপর বুদ্বুদ উঠল। তারপরে একবার কুমীরের মত ভেসে উঠে দম নিয়ে ডুবসাঁতার কাটতে আরম্ভ করল ওরা। সেই মুহূর্তকালের জন্য দম নেবার সময় তারা শুনতে পেল যে নণ্ডুর দল আর অযোধ্যাপ্রসাদের দল 'বাপ্ বাপ্' ডাক ছাড়ছে আর পালাতে পালাতে বলছে 'ভাগ্—ভাগ্ যা ভাই'—। জলের নীচে তো মুখ খুলে হাহা করে হাসা যায় না তাই মনে মনে হাসতে হাসতে ডুবসাঁতার কেটে চলল ওরা। কিছুদূর গিয়ে আবার উঠল ভেসে, দেখল যে কেউ অনুসরণ করে নি। ধীরে সুস্থে নদী পার হয়ে ওরা ওপারে উঠল। অন্য কোনো এক সময়ে তারা আবার সাঁৎরে কিংবা খেয়াপারের নৌকোয় চড়ে নদী পার হয়ে বাড়ী ফিরবে।

"এবার ?" পল্টু প্রশ্ন করল হাঁপাতে হাঁপাতে।

"হুঁ"—চিন্তিতমুখে বীরু বলল, "ইস্কুলে ফেরা হল না, ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে গেল—কাল হয়ত বেত খেতে হবে।"

পল্টু বন্ধুর দিকে তাকাল, তাকে উৎসাহ দেবার জন্য বেপরোয়ার

মত বলল,"খেতে হবে তো খাব না হয়—ক'টা মারবে ? বড় জোর পাঁচটা—দশটা ? যা হবার হয়ে গেছে, ভেবে কি হবে ? শালারা আমাদের অমনভাবে ধরতে এসেছিল কেন ?"

বীরু মাথা নাড়ল, "ঠিক—যা বলেছিস্। চল্, জঙ্গলের মধ্যে যাই, খরগোশ ধরার চেষ্টা করিগে, কেমন ?" পল্‌টুর দিকে মুখ ফিরিয়ে খুশীর সুরে আবার বলল সে, "বেশ হবে—না ?"

পলটু সজোরে মাথা ঝাঁকাল, বলল, "হ্যাঁ, বেশ হবে। জানিস্, খরগোশের মাংস নাকি খেতে খুব ভালো। এমনি পাঁঠার মাংস কতদিন খাই না—একটা খরগোশ পেলে বেশ হয় কিন্তু"—

তার ছোট চোখ দুটো আরো ছোট হয়ে এল আর তার লোভী মুখের দিকে তাকিয়ে বীরু মমতার হাসি হাসল। আহা, বেচারা !

নণ্ড দলবল নিয়ে স্কুলে ফিরে গেল।

ধনঞ্জয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন,"নণ্ড কৈ ?"

নণ্ড এগিয়ে বলল, "কেন, এইতো আমি"—

ধনঞ্জয়বাবু অবাক হয়ে গেলেন, নণ্ড আর অন্যান্য ছেলেদের যে চিনতেই পারা যাচ্ছে না। কপাল ফুলে গেছে কারো, কারো গাল, কারো থুঁৎনি। আর নণ্ডর তো কথাই নেই। তার নাকটা ফুলে মোটা হয়ে গেছে, বাঁদিকের গালটাও তেমনি, চোখদুটো যেন ছোট হয়ে গেছে।

"ব্যাপার কি ? তোমাদের চেহারার এমন ছিরী হল কেন, কি হয়েছে, এ্যাঁ ?"

হঠাৎ নণ্ড কেঁদে ফেলল। জমিদারের আদুরে ছেলে, একসঙ্গে পাঁচ ছ'টা মৌমাছির কামড় কি করে সহ্য করবে ?

ধনঞ্জয়বাবু থতমত খেয়ে গেলেন, "কি হল নণ্ড ? এঁ্যা ? ওরা তোমাদের বুঝি মেরে পালিয়েছে ?"

"হ্যাঁ"—নণ্ড মাথা নাড়ল। তার চোখ ফেটে আবার জল এল—এমন নির্য্যাতণ সে আর কোনোদিন ভোগ করেনি।

"বটে !" ধনঞ্জয়বাবু দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, "সব খুলে বল তো এবার—শিগগীর"—

নণ্ড আর হাঁদু সব খুলে বলল। শুনে ধনঞ্জয়বাবু মত্ত হাতীর মত কাঁপতে লাগলেন, বললেন, "চল সবাই, হেড মাষ্টার মশায়ের কাছে। ঐ খুনে দুটোকে আমি রাসটিকেট করিয়ে ছাড়ব—হ্যাঁ"—

হেড মাষ্টার মশাইও সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন, একটু ভেবে বললেন, "ওদের দুজনকে দশটা করে বেত মারবেন কাল আর দু'টাকা করে ফাইন করে রোজ টিফিন পিরিয়ডে হলঘরে একপায়ে দাঁড় করিয়ে রাখবেন তিনদিন। তাছাড়া ওদের বাপদেরও খবর পাঠান।"

সবাই তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ধনঞ্জয়বাবু হেড মাষ্টার মশাইয়ের বিচারে খুব খুশি হলেন না। মাত্র দশ বেত মারা হবে—হুঃ। অন্ততঃ পঞ্চাশটা করে বেত মারা উচিত ছিল পাষণ্ড দু'জনকে। আর ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় ভারী একটা খট্‌কা লাগল ধনঞ্জয়বাবুর মনে। হেড মাষ্টারমশাইয়ের ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম একটা ব্যঙ্গের হাসি যেন ঝিক্‌মিক্ করে উঠল ! কেন ? ব্যাপার কি ?

খরগোশ খুঁজতে খুঁজতে গায়ের কাপড়জামা গায়েই শুকিয়েছিল, সূর্য্যদেব পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছিলেন। সন্ধ্যে হয়ে আসছে দেখে ওরা আশ্বস্ত হল। এবার বাড়ী ফেরা যেতে পারে। বইগুলো তো মণ্টু নিয়ে যাবেই। বাড়ীতে দেরীর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলা

যাবে যে একটা ম্যাচ খেলার জন্য স্কুল থেকেই খেলার মাঠে চলে যেতে হয়েছিল।

পল্টুকে ছেড়ে বীরু বাড়ী ফিরল।

তখন মালতী তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দেখিয়ে প্রণাম করছিল। ভাইকে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল, চোখ বড় বড় করে বলল, "এসেছিস্! উঃ তোর কপালে আজ অনেক দুঃখু আছে—"

"কেন দিদি ?" বীরুর গলা শুকিয়ে গেল।

মাথা নেড়ে মালতী বলল, "হুঁ—আজ ইস্কুল পালিয়ে যা কাণ্ড করেছ তার খবর বাবার কাছে এসে পৌছেচে। ধনজঞ্জয়বাবু নগুদের নিয়ে এসেছিল, দেখ্ না কি মার খাস্ আজ—"

"বাঃ—আমি ইয়ে"—বীরু বলবার মত কোন কথাই আর খুঁজে পায় না। সে ভাবতে লাগল এখন কি করা যায় ? সেদিনকার মত কি পালাবে ?

"দিদি"—সে কাতরকণ্ঠে ডাকল।

"কি ?"

"কি করি ভাই ?"

"লুকিয়ে থাকগে কোথাও"—

"কোথায় ?"

মালতী একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সে থেমে গেল অনন্তের গলা শুনে।

"কে—কে বাইরে ?" অনন্ত হেঁকে জিজ্ঞেস করলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর খড়মের শব্দ শোনা গেল।

বীরু পালাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল কিন্তু বাপের ডাকের সঙ্গেই তার পা অবশ হয়ে এল, পাথরের মত স্থির হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল

যেখানে ছিল। ঘর থেকে অনন্ত বেরিয়ে এলেন, পেছনে নির্ব্বাক সুমতি।

"কে? বীরু? হুঁ"—

আবার খড়মের শব্দ শোনা গেল। মূর্ত্তিমান অনর্থের মত, থমথমে মুখ নিয়ে অনন্ত বীরুর দিকে এগিয়ে এলেন, কাছে এসে দাঁড়ালেন, তারপরে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, "আজ ইস্কুল থেকে ফিরতে দেরী হল যে?"

বীরু জবাব দিল না। কি হবে জবাব দিয়ে?

"বল, চুপ করে থাকা আমার পছন্দ হয় না, জবাব দাও"—

তাহলে কিছু একটা বলতেই হয়।

বীরু টেনে টেনে বলল, "ইয়ে—সোজা খেলার মাঠে গিয়েছিলাম"—

"হুঁ"—ছেলের আপাদমস্তক তীক্ষ্ণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে অনন্ত আবার প্রশ্ন করলেন, "আজ ইস্কুল থেকে পালিয়েছিলে?"

"না তো"—হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথা দুটো।

"পালাওনি?"

বীরু নির্ব্বাক রইল।

"পালিয়ে আম চুরী করতে গিয়েছিলে, সঙ্গে সেই বখাটে ছোঁড়া পলটুও ছিল।"

বীরু এবারও চুপ করে রইল।

অনন্তের গলার পর্দ্দা ক্রমেই চড়তে লাগল, "তারপরে তোমাদের ধরে আনবার জন্য নগুদের পাঠানো হলে তাদের গুণ্ডা বদ্‌মায়েসের মত আম দিয়ে মাথা ফাটিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। কেমন?"

বীরু এবার ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল, "বাঃ—আমরা তো ইয়ে—আমাদের কোনো দোষ নেই"—

হঠাৎ অনন্তের চেহারা বদলে গেল। যে লোককে কোনোদিন ভয়ানক রাগ করতে দেখা যায়নি তিনি আজ যেন ক্ষেপে গেলেন। লাফিয়ে আরো কাছে এসে ছেলের চুলের ঝুঁটি ধরে তিনি কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে বললেন, "তোর দুঃসাহস তো কম নয়! সব জানবার পরেও তুই আমার কাছে মিথ্যে কথা বলবি, নিজের দোষকে ঢাকবার চেষ্টা করবি! বটে!"

সুমতি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কোনো শব্দ করলেন না তিনি, একটু প্রতিবাদও নয়। অনন্ত আজ তাঁকে সাংঘাতিক একটা দিব্যি দিয়ে দুর্ব্বল করে রেখেছেন, কিছু বলার বা করার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। মালতীর দুটো মমতাভরা চোখের মাঝে বাষ্প ঘনিয়ে এল, সেও কিছু বলার সাহস পেল না।

ক্ষেপে গেছেন অনন্ত, ছেলের চুলের ঝুঁটি ধরে প্রচণ্ড টান মেরে তিনি বীরুর পিঠে দুমদাম্ কিলচড় মারতে আরম্ভ করলেন।

"পাজী, হতভাগা, বদ্মায়েস্—তোকে আমি কতদিন ছেড়ে দিয়েছি, কত বুঝিয়েছি—তাতেও হুঁস্ হয় না তোর! গরীবের ছেলে হয়ে বড় হবার চেষ্টা না করে শুধু বাউণ্ডুলে ডাকাতের মত ঘুরে বেড়াবি—দস্যিপনা করবি? কেন, কেন আম চুরী করতে গিয়েছিলি—এঁ্যা?"

বীরুর সমস্ত দেহই অনন্তের হাতের নির্য্যাতণ ভোগ করল। এমন কাণ্ড আর কোনোদিন হয়নি, কোনোদিন বাবা গায়ে হাত তোলেন নি, অথচ আজ সেই অঘটন ঘটল। বীরু হক্‌চকিয়ে গেল, প্রচণ্ড আঘাত পেল তার মন, কান্নার সমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠল তার বুকে, তার গলায়, কিন্তু কাঁদল না সে, দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশব্দে সে বাবার নির্য্যাতণকে সহ্য করতে লাগল।

"তুই চোর! এঁ্যা! অনাহারে থাকি, কোনোদিন পরের জিনিষের ওপর লোভ করেনি—আর আমার ছেলে হয়ে তুই পরের বাগানে চুরী করতে গিয়েছিলি? তাও ইস্কুল পালিয়ে! তারপরে মারামারি! বড় হয়ে তুই তাহলে তো মানুষ খুন করবি। তোর ওপর আমার কত আশা অথচ তুই এমনি কাণ্ড করবি?"

পাগলের মত বীরুকে তিনি মেরে চললেন। শেষে হাতের তালু তার জ্বলতে লাগল, আর বীরু হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটির ওপর। তখন অনন্ত থামলেন, ছেলের দিকে নিঃশব্দে ক্ষণকাল জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন, পরে সুমতির দিকে তাকিয়ে বজ্রকঠোর সুরে বললেন, "আজ তোমার ছেলের খাওয়া বন্ধ রইল, খাওয়ালে আমার রক্ত খাওয়ানো হবে কিন্তু"—

খড়মের শব্দ তুলে তিনি ঘরের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সুমতি বললেন, "নে, ওঠ্ এখান থেকে"—

বীরু মায়ের দিকে জল আর আগুন ভরা চোখদুটো ফিরিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, "না—তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও—" অভিমান হল তার, রাগ হল। মা এখন দরদ দেখাতে এসেছে —ইস্! আর যখন বাবা মারছিল তখন ভিজে বেড়ালটির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল! চায় না, চায় না সে এমন মাকে।

সুমতি জ্বলে উঠলেন ছেলের কথায়, বললেন, "এত মার খেয়েও তোর তেজ কমল না! যা, থাকগে পড়ে ওখানে"—

রাগ করে তিনি দ্রুতপদে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

মালতী গায়ে হাত দিল, সস্নেহে বলল, "খুব লেগেছে, না ভাই?"

কান্নার সুরে বীরু ফোঁস্ করে উঠল, "না, লাগবে কেন, আরাম লাগবে মার খেলে।"

মালতী মৃদু হাসল, "রাগ করিস্ না ভাই। সত্যি, বাবার এতটা মারা উচিত হয়নি। কিন্তু তুই দুষ্টুমী করলে লোকেরা যখন নিন্দে করে তখন যে বাবার মাথা খারাপ হয়ে যায়"—

"খারাপ না হাতী—যত্ত সব"—অবরুদ্ধ কান্নার বেগে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বীরু।

"হয়েছে—এবার ওঠ্। যেমন কাজ করেছ তার তেমনি ফল পেলে—এতে যেন শিক্ষা হয় তোমার।" মালতী একটু ভারিক্কী চালে কথাগুলো বলল।

ষড়যন্ত্র! সবাই বীরুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।

বাবা, মা, দিদি, হেড্মাষ্টার, ধনঞ্জয় মাষ্টার, জমিদার, নণ্ডু আর অযোধ্যাপ্রসাদ—সবাই একজোট হয়ে তাকে নির্য্যাতিত করার মৎলব এঁটেছে। রাগ হল বীরুর, খুব অভিমান আর দুঃখ হল। সে উঠে দাঁড়াল।

মালতী প্রশ্ন করল, "কোথায় যাচ্ছিস্ আবার?"

"বাইরে—ইয়ে"—বলে বেরিয়ে গেল বীরু।

খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে সে দাঁড়াল। কি ঠিক করা যায়? বাবা তাকে মারলেন! কোনোদিন তিনি গায়ে হাত দেন নি—আজ দিলেন! আর কি মারটাই না মারলেন! মাও বাধা দিলেন না, একটা মিষ্টি কথাও বললেন না, একটু গায়ে হাতও বুলোলেন না! কি হোত তা করলে? দিদিও মোড়লের মত উপদেশ দিল! না, এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল! আর যদি বেঁচেই থাকে সে, তবে কাল স্কুলে গেলে হেড মাষ্টারমশাই আর ধনঞ্জয় মাষ্টার ছেড়ে দেবে না। ক'ঘা বেত মারবে, কি শাস্তি দেবে কে জানে। তার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। কিন্তু মরার আগে একবার পল্টুর

সঙ্গে দেখা করা উচিত। হাজার হোক, বাবা যতই 'বখাটে' বলুন, পলটুর চেয়ে বড় বন্ধু তার এ পৃথিবীতে কি আছে?

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে চলল বীরু।

মাঝপথে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে, সামনের দিক থেকে কে যেন আসছে। অনেকটা পল্‌টুর মত হাঁটছে।

"কে?" বীরু জিজ্ঞেস করল।

"আমি—ওকি বীরু নাকি?" পল্‌টু কাছে এগিয়ে এল।

"হ্যাঁ—তুই কোথায় যাচ্ছিস্?" বীরু জিজ্ঞেস করল।

"তোর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম"—

"আমিও তো তোর কাছে যাচ্ছিলাম।"

"কেন?"

বীরু চুপ করে রইল।

"খুব মার খেয়েছিস্ বুঝি?

"হুঁ"—

"আমার কাছে কেন যাচ্ছিলি?"

বীরু এবারও জবাব দিল না।

পল্‌টু আবার প্রশ্ন করল, "কি হল—বল্, কেন যাচ্ছিলি?"

"দেখা করতে যাচ্ছিলাম—" গলার স্বরটা একটু নীচু করে বীরু বলল, "আমায় কেউ ভালবাসে না বাড়ীতে, কি হবে বেঁচে থেকে? তাই তোর সঙ্গে শেষবারের জন্য দেখা করতে ইচ্ছে হল।"

পল্‌টু হেসে উঠল, "তুই কি পাগল নাকি রে? মার খেয়েছিস বলে মরে যাবি? দূর গাধা"—একটু থেমে সে আবার বলল, "আমিও মার খেয়েছি আজ, খু-ব, গায়ে হাত দিয়ে দেখ্ কেমন ফুলে গেছে, যদি আলো থাকত তবে দেখতিস্ কেমন কাল্‌সিটে

দাগ পড়েছে। আমিও তোর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম এইজন্যেই”—

পল্টুর গায়ে হাত বুলোল বীরু। দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া হয়ে ফুলে গেছে বহু জায়গায়।

“কি দিয়ে মেরেছে রে?”

“চেলাকাঠ দিয়ে—ভাগ্যি ভালো যে বাবা মাথা ফাটায় নি।” পল্টু সহাস্যে বলল।

“হুঁ—পল্টু”—

“কি?”

“আমি মরবই”—

“কেন রে বোকা?”

“বাবা আমায় মারলেন কেন, মা কেন বাঁচালেন না—না মারলে ওদের শিক্ষা দেওয়া হবে না।”

“দূর্‌”—

“তুইও তো মার খেয়েছিস্‌—তোকেও তো দিনরাত হেনস্তা করে, চল্‌, দুজনেই একসঙ্গে মরিগে।”

আবার হাসতে লাগল পল্টু।

“দূর্‌—তুই কিরে বীরু—হিহিহি—তুই একটা ইয়ে, দূর্‌”—

“বাঃ, হাসছিস্‌ যে?”

“হাসব না কেন? বাবা দু’ঘা মেরেছে বলেই এমন দামী প্রাণটাকে নষ্ট করব? আরে বোকা, একবার মরলে তো আর বাঁচা যাবে না।”

বীরু বোধ হয় একটু লজ্জা পেল, মাথা নেড়ে বলল, “তা ঠিক। কিন্তু তাহলে কি করা যায়?”

পল্টু বলল, "বলছি। আমি তোর সঙ্গে কেন দেখা করতে যাচ্ছিলাম জানিস্? আমি আজ এখান থেকে চলে যাব—ফিরে আসতেও পারি, নাও পারি। তোর যদি ইচ্ছে হয় আমার সঙ্গে আসতে পারিস্?"

"বাঃ—বাবা মা যে ভাববেন।"

"মরলেও তো ভাববেন।"

"তা তো ঠিকই—কিন্তু—ইয়ে"—

"ওদের জব্দ করতে চাস্ তো এর চেয়ে ভালো উপায় আর কিছু নেই। কয়েকদিন বাইরে বেশ ঘোরাও যাবে আর এদিকে সবাই কেঁদে কেটে, চোখের জল ফেলে অস্থির হয়ে টিট্ হয়ে যাবে। বেশ কয়েকদিন বেড়িয়ে একদিন যখন ফিরবি তখন দেখবি যে সব ঠিক হয়ে গেছে। যাবি?"

মুহূর্ত্তকাল ভাবল বীরু। সত্যি তো। সে যদি মরতে পারে তবে সে গৃহত্যাগও করতে পারে। তাছাড়া চিরকালের জন্য তো আর করতে হবে না। বেশ হবে কিন্তু। তার বিরহে মা কাঁদছেন, দিদি কাঁদছে, এমন যে বাবা তিনিও কাঁদছেন—এই ছবিটা কল্পনা করে তার মনে একটা অদ্ভুত আনন্দ হল। বেশ হবে—ওদের কাঁদানোই উচিত। তার গায়ের জ্বালা, অনন্তের অস্বাভাবিক রাগ, মায়ের নির্ব্বিকার ভঙ্গী আর দিদির মোড়লীর কথা মনে আসতেই শরীরটা তার জ্বলে উঠল, মুহূর্ত্তে সে মনস্থির করে ফেলল।

"পল্টু"—

"কি?"

"যাব।"

"যাবি? বেশ, তবে চল্ এখুনি"—পল্টু খুব খুশী হয়ে উঠল, তার গলায় তার রেশ ধ্বনিত হল।

"এখুনি !" বীরু আশ্চর্য্য হল, "বাঃ, বিছানাপত্তর, জামা কাপড় নিতে হবে না ?"

"ওসব নিতে গেলে কি আর বেরোতে পারবি ?" পল্টু মাথা নাড়ল, "তাছাড়া কি হবে ওসব বোঝা বাড়িয়ে, আমরা কোথায় থাকব, কোথায় ঘুরব কে জানে। না, ওসব নেওয়া টেওয়া হবে না।"

"কিন্তু ক্ষিদে পেয়েছে যে রে—চাট্টি খেয়ে নিবি না ?" বীরু আর একটা সমস্যার কথা না বলে পারল না।

"তা খাওয়া যাবে—মণ্টুর কাছ থেকে চাট্টি চিড়ে চেয়ে এনেছি আমি, কোঁচড়ে আছে তা। আর অত খেতে চাইলে কি বাইরে যাওয়া যায়, কত না খেয়ে থাকতে হবে দেখিস্।"

তবু ভাবতে লাগল বীরু। চলে তো যাবেই সে, কিন্তু জানিয়ে যেতে হবে তো ? জানিয়ে গেলে বেশ মজা হবে কিন্তু। সে লিখবে মাকে—'শ্রীচরণেষু, মা, আমি তোমার অধম সন্তান, তোমাদের কেবল দুঃখই দিয়াছি। কিন্তু আজ হইতে আর দুঃখ দেব না, আমি আজ চিরকালের জন্য তোমাদের ছাড়িয়া গেলাম, নিষ্কৃতি দিয়ে গেলাম। তোমরা আমার জন্য ভেবো না, আমাকে ভুলিয়া যাইও। বিদায়। ইতি হতভাগ্য বীরু।' কথাগুলো মনে মনে আউরে অদ্ভুত একটা তৃপ্তি পেল সে, কিন্তু তবুও বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, দু'চোখ ছাপিয়ে জল আসতে চাইল, মনটা হু হু করে উঠল।

"কি ভাবছিস বীরু ? তাড়াতাড়ি চল্—পঞ্চাননপুরে গিয়ে ট্রেণ ধরতে হবে, অনেকটা পথ যে"—

"একটা চিঠি রেখে যাব না মণ্টুর কাছে ? মায়ের নামে ?"

"তুই একটা বেহদ্দ পাগল বীরু। কি হবে চিঠি লিখে, মায়া বাড়িয়ে ? ভাবুক না ওরা একটু, ফিরে তো আসবিই।"

সত্যি, কি হবে মায়া বাড়িয়ে ? অত ভেবে চিন্তে কেউ বাড়ী ছেড়ে বেরোয় না। বরঞ্চ ভাবুক ওরা, খু-ব ভাবুক, কাঁদুক, আপ্‌শোষ করুক, তাকে মেরেছিল বলে অনুতাপে আর আত্মধিক্কারে কষ্ট পাক্। তাই তো চাই। না মরে সে তো তাঁদের চিরকালের দুঃখ থেকে বাঁচাল, আর কি চাই ?

"চল্ পল্টু—চল্"—সে এবার পা বাড়াল।

"চল্"—পল্টু আগে আগে চলতে শুরু করল।

সত্যি গৃহত্যাগ করল বীরু। হন্‌হন্ করে এগিয়ে চলল তারা, ক্রমে সব পিছিয়ে পড়ল, গ্রামটা পেছনে পড়ে গেল। খোলামাঠের মাঝখানে, আলের ওপর দিয়ে চলতে লাগল ওরা। ওপরে চন্দ্রহীন আকাশ, পেছনে, সামনের দিগন্তে, গাছপালা আর গ্রামের বাড়ী গুলোর ঘনীভূত ছায়া জমাট অন্ধকারের মত স্থির হয়ে আছে। ক্ষীণ ঝিল্লীরব ভেসে আসছে চারদিক থেকে—মাটির নিঃশ্বাসের মত হাল্‌কা হাওয়া বইছে ঝিরঝির করে! অগণন নক্ষত্র-শোভিত আকাশটা যেন একটা চুমকী-বসানো কালো রংয়ের বেনারসী শাড়ী। দূরে, ডানদিকে, পাঁচশো, ছ'শো বছর আগেকার সেই গড়টাতে এখন হয়ত মরা মানুষেরা বেঁচে উঠেছে, নাচছে, হাসছে, গাইছে। এই তাদের কাঞ্চনপুর গ্রাম। রূপকথার রূপনগরের মত সুন্দর, স্বপ্নময়। আজ বীরু তা ছেড়ে চলেছে। চৌধুরীদের মজা পুকুর, বোঁচার ট্যাঁক, বুড়ো শিবতলা, কাঞ্চনপুরের ঝক্‌ঝকে মাটি আর ঢেউ-খেলানো মাঠ, তার অসংখ্য গাছপালা আর লতাপাতা, খরস্রোতা মহানন্দা, তার ওপরকার জঙ্গলের বহুবিচিত্র সূর্য্যাস্তকে পেছনে ফেলে বীরু আজ চলে-যাচ্ছে। ছেড়ে যাচ্ছে তার বাবা, মা আর দিদিকে। বিদায় কাঞ্চনপুর, বীরু তোমার অধম সন্তান, মা, বাবা, দিদি,

বিদায় বিদায়। বীরু তোমাদের কেবল দুঃখই দিয়েছে কিন্তু আজ থেকে সে তোমাদের আর জ্বালাবে না, আজ থেকে সে তোমাদের নিষ্কৃতি দিয়ে গেল, তোমাদের দুশ্চিন্তাকে সমাধিস্থ করে গেল।

হু হু করে উঠল মনটা। রাতের আকাশ, রাতের অন্ধকার যেন চোখের সামনে আরো অন্ধকার হয়ে এলো, পায়ের নীচেকার মাটি যেন দুলতে লাগল। কাঞ্চনপুর যেন ডাকছে। ডাকছে তার সব কিছু, মা, বাবা আর দিদির ডাক, কাঞ্চনপুরের ডাক যেন নিঃশব্দ স্রোতের মত ভেসে আসছে। ঝড়ের মুখে কচিপাতা যেমন কাঁপে তেমনিভাবে কেঁপে উঠল বীরু, সমস্ত হৃদয়টা ফুলে ফেঁপে যেন গলার মধ্যে এসে আটকে গেল আর ভোগবতী ধারার মত গরম জলের ধারা সবেগে বেরিয়ে এল দুটো স্তিমিত চোখের মাঝখান থেকে। ক্ষীণ একটা কান্নার শব্দ ছিট্‌কে বেরিয়ে এল তার চেপে-ধরা দাঁতের ফাঁক থেকে, সামলাতে পারল না সে।

পল্টু চমকে থামল, সে বুঝতে পারল যে বীরু কাঁদছে, তার কষ্ট হল, মৃদুকণ্ঠে সে বলল, "বাড়ী ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি? তা হয়ই ভাই। যদি খুব কষ্ট হয় তবে তুই ফিরে যা বীরু, বুঝলি? আমার তাতে একটুও দুঃখ হবে না, একটুও রাগব না আমি।"

বীরুর কাঁধে হাত রাখল পল্টু। যেন স্পর্শ করে সান্ত্বনা দিতে চাইল সে।

বীরু ধীরে ধীরে মুখ তুলল, ক্ষণকাল নিঃশব্দ থেকে বলল, "ও কিছু না—চল্—এগিয়ে চল্"—

চলতে চলতে কাপড়ের খুঁট দিয়ে সে চোখের জল মুছে ফেলল। তবু প্রাণটা কেমন যেন করে। রক্তের সঙ্গে কাঞ্চনপুরের

মাটির কেমন যেন একটা দুশ্ছেদ্য বন্ধন আছে, তাই কাঞ্চনপুরকে ছেড়ে যাওয়ায় আজ সেই রক্তের মধ্যে ঝড় উঠেছে, কান্নার তরঙ্গ মাথা খুঁড়ে মরছে।

ঘণ্টা খানেক পর পঞ্চাননপুরের ষ্টেশনে পৌছুল ওরা। আসতে আসতে মাথার ওপরকার আকাশ মেঘে মেঘে আরো অন্ধকার হয়ে উঠেছিল, জ্বল্‌জ্বলে তারার দল অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তারি মাঝে পথ ঠাহর করে আস্‌তে একটু অসুবিধে হয়েছিল বটে, ট্রেন আসার প্রায় মিনিট পনেরো আগেই ওরা ষ্টেশনে পৌছুল।

রাত প্রায় আটটা তখন। ছোট্ট ষ্টেশনটার চোখে তখনি ঘুম এসেছে। সারাদিনে মাত্র চারটে প্যাসেঞ্জার ট্রেন আর দুটো মালগাড়ী যাতায়াত করে এই লাইন দিয়ে। এইটেই রাতের শেষ ট্রেন। কিন্তু লোকজনের ভীড় বেশী নেই, মাত্র ত্রিশ চল্লিশজন লোক শেডের নীচে, সিমেণ্ট-বাঁধানো আসনে বসে গল্পগুজব করছে। এককোণে অবস্থিত ছোট্ট চায়ের দোকানটাতে একটা মিট্‌মিটে হ্যারিকেন জ্বলছে আর তার তোলা উনুনটাতে জল ফুটছে টগ্‌বগ্‌ করে। কয়েকজন লোক ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে টিকিট-ঘরের বন্ধ-জানালার কাছে। একটিমাত্র অফিস-ঘরে ষ্টেশনমাষ্টার ও আর একজন কর্ম্মচারী কাজ করছে। বারান্দায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে একটা দেশী কুকুর, তার পাশে পয়েণ্ট্‌স্‌ম্যান রামধারীসিং বিড়ি টানছে। ষ্টেশনের একটিমাত্র ল্যাম্প-পোষ্টে বিবর্ণ একটা বাতি জ্বলছে, তারই অস্পষ্ট

আলোতে মসৃণ রেললাইন দুটো একটু চক্‌চক্‌ করছে, আর দূরে ডিস্‌ট্যাণ্ট্‌ সিগ্‌নালের সবুজ বাতিটা জল্‌জ্বল্‌ করছে, সিগ্‌নাল ডাউন হয়ে আছে।

টিকিট ঘরের সামনে যাত্রীরা তখন কোলাহল করছিল।

"ঘণ্টা পড়ি গিছে, তবু টিকিট দিছে না কেনে জী ?"

"মাষ্টারবাবুর হিচ্ছা জী—তুম্‌রা বুঝ্‌বা কি ?"

"ও মাষ্টারবাবু—মাষ্টারবাবু—টিকিট দেন না গো—আজসাহী'র টিকিট দুটা"—

বীরু পল্‌টুর দিকে তাকাল, "আমাদের তো টিকিট থাকবে না—ধরবে না তাহলে ?"

পল্‌টু হাসল, "ঘাব্‌ড়াচ্ছিস্‌ কেন ? আমি কতবার বিনা টিকিটে ঘুরে এলাম, এবারেও ঠিক বেরিয়ে যাব। আর যদি ধরেই বা, কি আর হবে, ফাঁসি তো আর দেবে না ?"

বীরু চুপ করে রইল। মন্দ লাগছিল না তার ষ্টেশনে এসে, মনটা এখন শান্ত হয়েছে। দুঃখ নয়, এখন তার রাগই হচ্ছিল বাবা মায়ের কথা ভেবে। বেশ হয়েছে, ভাবুক ওরা, ভাবুক।

একটু বাদে টিকিট বিক্রি আরম্ভ হল আর তার কিছুক্ষণ পরেই দূরে একটা উজ্জ্বল আলো দেখা গেল, রেললাইনের ধমনী বেয়ে একটা শব্দ ভেসে এল—ঝক্‌ ঝক্‌ ঝক্‌ ঝক্‌। যাত্রীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল, মুহূর্ত্তে ছোট ষ্টেশনটা যেন কলরব করে উঠল, তার চোখের ঘুমের রেশ কেটে গেল আর বীরুর বুকের মধ্যে তোলপাড় আরম্ভ হল।

উজ্জ্বল চোখ মেলে অতিকায় একটা দানবের মত রেলগাড়ীটা এসে ষ্টেশনে থামল। কয়েকজন লোক নামল, কয়েকটি মেয়েও।

হাঁকাহাঁকি, চেঁচামেচি শুরু হল। বারান্দার দেশী কুকুরটাও এবার গা ঝাড়া দিয়ে ট্রেনের কাছে এসে দাঁড়াল। গার্ডসাহেব তার লণ্ঠন হাতে এসে ষ্টেশন-মাষ্টারের ঘরে ঢুকল, কি সব কথা বলতে লাগল।

পল্টু বলল, "চল্"—

বীরুর তখন রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে, একটু বিভ্রান্তভাবে সে বলল, "কোথায় ?"

"রেলে চড়বি না ? বাঃ"—

একটা লোক-ভর্ত্তি থার্ডক্লাশ কাম্‌রার কাছে গিয়ে দাঁড়াল পল্টু।

"এখানে দাঁড়া—ট্রেনটা চলতে আরম্ভ করলে চড়ব।"

"কেন ? এখন নয় কেন ?" বীরু বুঝতে পারল না।

"চেকার ওঠে কিনা তা দেখে উঠতে হবে তো"—

"ওঃ"—

মিনিট পাঁচেক বাদেই ট্রেণ ছাড়ল। তীক্ষ্ণ একটা বংশীধ্বনি করে ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করল তা।

পল্টু বলল, "চড়্ শিগ্‌গীর"—

দুজনে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল কামরার মধ্যে।

"কোথায় আসছ হে ছোকরারা—জায়গা নেই"—কে একজন গর্জন করে বলল।

কিন্তু কে কাণ দেয় তাতে, ঠেলে ঢুকে পড়ল তারা ভেতরে। কাম্‌রার ভেতর আলো নেই, জানালা দিয়ে বাইরের ফাঁকা জায়গার যে ক্ষীণ আলো আসছিল তাতে ছায়ার মত মনে হয় সব যাত্রীদের। তারি মাঝে ঠেলে ঠেলে এগোল ওরা, তারপরে এক জায়গায়, দু'দিকের সীটের মাঝখানে বসে পড়ল।

পল্টু বীরুর কাণের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "বেঞ্চির নীচে ঢুকে পড়বি, বুঝলি? একটু জোরে চলুক গাড়ী—তখন।"

"আচ্ছা।"

কাম্‌রার ভেতরে আর তিলধারণেরও স্থান নেই, ঠাসাঠাসি করে একেবারে নিরেট দে'য়ালের মত করে ফেলেছে তা। হট্টগোল আরম্ভ করেছে সবাই তাই নিয়ে। যারা বসে আছে তারা আরো ভালোভাবে বসতে চায় বলে পাশের ও দণ্ডায়মান লোকদের সঙ্গে ঝগড়া করছে আর যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা বসবার উচ্চাকাঙ্খায় শান্‌-দেওয়া যুক্তি দিয়ে তর্ক করছে।

ট্রেণের গতি বাড়ল। পল্টু বীরুকে একটু খোঁচা দিতেই বীরু বেঞ্চির নীচে সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল, পেছন পেছন পল্টুও ঢুকল। তারপরে লম্বালম্বি হয়ে তারা একটা পাকা ব্যবস্থা করে ফেলল। তবে একটু অসুবিধেও হল। ছোট ছোট পোঁটলা-পুঁটলী রাখা ছিল বেঞ্চির তলায়, তার ওপর দিয়েই পা চালাতে হল। আর একটা বেজায় মুস্কিল হল। বীরুর মাথার সামনে একজন লোকের পা ঝুলছিল, জুতোপরা পা। মাঝে মাঝে লোকটি পা ভেতর দিকে ঠেলে দিচ্ছিল আর বীরুর মুখে লাগছিল তা। বিশ্রী ব্যাপার. বীরু অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

"পল্টু—এলোকটার পা দুটো তো ভারী জ্বালচ্ছে"—ফিস্‌ ফিস করে বলল বীরু।

পল্টু পরামর্শ দিল, "চিম্‌টি কেটে দে জোরে"—

"যা বলেছিস্‌"—

ঠিক তাই করল বীরু। পা দুটো আবার ভেতরের দিকে এলে একটা চিম্‌টি কেটে দিল সে খুব জোরে। লোকটা 'উঃ' শব্দ করে ত্বরিৎগতিতে পা দুটোকে বাইরে টেনে নিল।

"ইস্! কিসে যেন কামড়াইল জী"—লোকটি তাঁর সঙ্গীকে বলল, "বড় জ্বইলছে ভাই।"

সঙ্গী সান্ত্বনার সুরে বলল, "পিপড়া কামড়াইছে নিশ্চয়, পা তুইলা বস্।"

পা দুটো অদৃশ্য হল, অর্থাৎ ওপরে উঠল। বাঁচা গেল। বেঞ্চির নীচে মুখে হাতচাপা দিয়ে হাসল দুই বন্ধু।

ট্রেণের গতি আরো বাড়ল। মাঝে মাঝে ষ্টেশন আসে, গাড়ী থামে, আবার চলতে থাকে। ক্রমে চোখে একটু তন্দ্রার ভাব এল, কিন্তু ঠিক ঘুম আসে না। ক্ষিদের জ্বালাটা বেজায় কষ্ট দিতে থাকে।

"পল্টু"—

"কি ?"

"দে চাট্টি চিড়ে, আর পারছি না।"

শুয়ে শুয়েই শুক্‌নো চিড়ে গুড় দিয়ে চিবোতে লাগল বীরু। ট্রেণের চাকার গর্জ্জন ভেদ করে এবার মেঘের গুরু গুরু ডাক ভেসে এল আর নীলাভ বিদ্যুতের আলো মুহূর্ত্তের জন্য অন্ধকার কাম্‌রাটাকে আলোকিত করে তুলল। হঠাৎ কেমন যেন জ্বালাবোধ করতে লাগল বীরু, কেমন যেন বুকটা ফেটে যাবার উপক্রম হল। বাড়ী, কাঞ্চনপুরের কথা মনে পড়ছে তার। কেন সে বাড়ী ছেড়ে এল ? কোথায় যাচ্ছে সে—কেন ?

"আমরা কোথায় যাব রে পল্টু ?"

"কোথায় ? চল্ কলকাতা যাই"—

কলকাতা! মুহূর্ত্তে অনেক সোনালী স্বপ্ন ঘনিয়ে এল চোখের সামনে। কলকাতা! কতদিন, কতলোকের মুখে সে এই মহানগরীর কথা শুনেছে, কাহিনীর মত অত্যাশ্চর্য্য মনে হয়েছে সে সব কথা, মনে রোমাঞ্চ জাগিয়েছে। সেই কলকাতা! তাহলে বীরুর কোনো দুঃখ নেই।

ঠিক সেই সময়েই ট্রেণের গতি মন্দ হয়ে এল, ক্রমে ট্রেণ থামল। আবার কিছু যাত্রী নামল, উঠল, কোলাহল ধ্বনিত হল। মিনিট তিনেক পরে আবার চলতে আরম্ভ করল তা।

আর সঙ্গে সঙ্গেই চলতি গাড়ীর দরজা খুলে যে লোকটি কাম্‌রায় ঢুকল তাকে দেখে মৃদু গুঞ্জন তুলল যাত্রীরা।

"চেকার—টিকিট চেকার জী"—

বীরুর রক্ত ভয়ে জল হয়ে এল। টিকিট চেকার! এবারেই বুঝি সব ভেস্তে গেল। নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে সে পল্‌টুর গায়ে ঠেলা দিল।

পল্‌টু কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, "টুঁ শব্দটিও করিস্‌নি, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

টিকিট-চেকারের হাতে টর্চ্চ ছিল, তাই জ্বেলে সে টিকিট দেখতে আরম্ভ করল।

"দেখি—টিকিট দেখি। হুঁ। তোমাদের—ক'জন তোমরা? চারজন? কে কে? হুঁ"—

এমনিভাবে এগোতে লাগল সে। এদিকে বাইরে হুড়মুড় করে করে বৃষ্টি নামল, সঙ্গে উদ্দাম হাওয়া। ডানদিকের জানালাগুলো পটাপট্‌ বন্ধ করে দিল যাত্রীরা। বেজায় গরমে দম আট্‌কে আসতে চাইল বেঞ্চির নীচে। তবু নড়ল না দুই বন্ধু, পাছে টিকিট-চেকারের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

একটা গোলমাল শোনা গেল কামরার ভেতর। টিকিট-চেকার একজন বিনা টিকিটের যাত্রীকে ধরেছে।

"টিকিট কোথায় তোমার—এঁ্যা? বুঝতে পারছ না—টিকিট, টিকিট চাইছি।"

ক্লান্ত, করুণকণ্ঠে কে একজন বলল, "টিকিট তো নাই বাবুজী"—

টিকিট-চেকারের গর্জ্জন ধ্বনিত হল, "নেই! কেন নেই?"

"বড় গরীব বাবা?"

"গরীব তা আমি কি করব? যাবে কোথায়?"

যাব বাবা—সেখানে আমার ছেলের টাইফয়েড হয়েছে—মরমর অবস্থা"—লোকটা যেন কেঁদে কেঁদে কথাগুলো বলতে লাগল।

টিকিট চেকার একটুও বিচলিত হল না, গলল না, সমান বিরক্তির সঙ্গেই সে বলল, "ওসব আমি বুঝি না। তিনটাকা দু'আনা টিকিটের দাম—তা দাও"—

মিনতিভরা কণ্ঠে লোকটি বলল, "আমি বড় গরীব বাবা—আমার যে কিচ্ছু নেই"—

"কিচ্ছু নেই তো নেমে যেতে হবে আগের স্টেশনে—রেল-কোম্পানীর আমি বাবা নই যে আমার ছেড়ে দেবার এক্তিয়ার থাকবে। ভালো চাও তো মাশুল দাও"—

"একটা পয়সাও সঙ্গে নেই বাবু—আমি বড় গরীব। দয়া করে আমায় মাফ্ করে দিন—দোহাই আপনার।"

"না না—ওসব কথা আমি শুনব না—শুনব না। মাশুল না দিলে আগের স্টেশনে নামিয়ে দেব আমি, না নামলে পুলিশে দেব, ব্যস্"—

টিকিট-চেকার তার শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিল।

খানিকবাদেই ট্রেন থামল। কে একজন স্টেশনের নামটা উচ্চারণ করল কিন্তু কোলাহলের মধ্যে তা ডুবে গেল।

কাম্রার ভেতর টিকিট-চেকারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "কই হে, ওঠ, এই লোকটা—নামো, নামো"—

"দোহাই চেকারবাবু—দয়া করুন—আমার ছেলে মর মর"—

"ওসব বুঝি না আমি, সাফ্ কথা।" সুর নীচু করে চেকার বলল, "আর যদি যেতেই চাও তবে কিছু খসাও, বুঝলে ?"

"আপনার পায়ে ধরছি বাবু—দোহাই"—লোকটার কণ্ঠে করুণ মিনতি।

"না—না, নামো—নামো বলছি"—টিকিট-চেকার হুঙ্কার করে ধাক্কা দিল লোকটাকে, নামিয়ে নিয়ে গেল কাম্‌রা থেকে।

ট্রেণ আবার ছাড়ল। বাইরে তেমনি বৃষ্টি পড়ছে, এলোমেলো পাগ্‌লা হাওয়া বইছে। এমনি করে এগিয়ে চলল ট্রেণ। বেঞ্চির নীচে শুয়ে বীরুর মনটা হঠাৎ কেমন যেন করে উঠল। কে সেই লোকটা যার ছেলে পোড়াদহে মরমর তা সে জানেনা। কি রকম চেহারা তার তাও দেখতে পায়নি সে। তবু মনটা তার বিষণ্ণ হয়ে উঠল। গরীব মানুষ, আধাবুড়ো হবে হয়ত, ছেলের ভয়ানক অসুখের খবর পেয়ে বিনাটিকিটেই রওনা হয়েছিল কিন্তু টিকিট-চেকার তাকে নামিয়ে দিল। অজানা স্টেশনের অন্ধকারে, মুষলধারা বর্ষণ আর উদ্দাম হাওয়ার মাঝে, বিদ্যুৎ-দীর্ণ আকাশের তলায় তাকে নামিয়ে দিয়ে ট্রেণটা এগিয়ে চলল, একটুও ভাবল না লোকটার কথা। কেন ? গভীর বেদনায় মুচ্‌ড়ে উঠল বীরুর বুক। গরীব, বড় গরীব লোকটা। গুপ্তধন-পর্ব্বের পর যে কথাটা একটু চাপা পড়ে যাচ্ছিল তা আজ আবার মাথা চাড়া দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

ট্রেণ চলল। রাতের অন্ধকারে ঝড় বৃষ্টির মাঝে কত স্টেশন এল, কত অপরিচিত লোকের কত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কত স্টেশনের কুলীর হট্টগোল ধ্বনিত হল। নদ, নদী, খাল, বিল, মাঠ, ঘাট পার হয়ে ট্রেণ ছুটে চলল। ভৈরব-রাগে গান গেয়ে, বিরাট

শব্দ তুলে, মাটি কাঁপিয়ে, ঝক্-ঝক্ ঝন্ ঝন্ শব্দে ট্রেণ ছুটে চলল। কাঞ্চনপুর অনেক, অ-নে-ক পেছনে পড়ে গেল, গতির দোলায় মনটা অপরূপ একটা আনন্দরসে ক্রমশঃ ভরে উঠতে লাগল। ট্রেণে চড়ার, অপরিচিত গ্রাম ও সহরের মাঝখান দিয়ে সবেগে ছুটে যাওয়ার রোমাঞ্চকর আনন্দানুভূতি মা, বাবা ও দিদিকে ছেড়ে আসার দুঃখকে ফিকে করে তুলল। কেবল মাঝে মাঝে একজন আধাবুড়ো লোকের কথা মনে পড়তে লাগল। অজানা স্টেশনের অন্ধকারে, ঝড় বৃষ্টি বাজ বিদ্যুতের মাঝে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে, সে হয়ত পোড়াদহের কোনো এক ভাঙ্গা ঘরে শায়িত তার মুমূর্ষু ছেলের কথা ভেবে ভেবে দু'চোখের জল ফেলছে।

পাঁচ

একটু তন্দ্রা এসেছিল। বৃষ্টির তেমন জোর ছিল না বলে যাত্রীরা আবার জানালাগুলো খুলে দিয়েছিল, হু হু করে জোলো হাওয়া এসে কাম্‌রাটাকে ঠাণ্ডা করে তুলেছিল। বেঞ্চির নীচে মশায় কাম্‌ড়াচ্ছিল তবু চোখ দুটো বুজে এসেছিল। মাথার ভেতর ট্রেণের ঝাঁকুনীর চোটে সব যেন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ পল্‌টুর ধাক্কায় বীরুর তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল।

"বীরু—অ' বীরু—এই"—

"এঁ্যা ?"

"শিগ্‌গীর নাম্‌—কলকাতায় এসেছি"—

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ। কথা না বলে নাব এবার, আয় এদিকে"—

যে প্ল্যাটফর্ম্মে গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল তাতে নামল না ওরা, উল্‌টো দিক দিয়ে নেমে অন্য একটা প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়ে উঠল। কিন্তু সেখানকার ফটক বন্ধ। অথচ আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে যদি ধরে! এককোণে একটু অন্ধকার ছিল সেখানে গিয়ে বসল দুজনে।

"বস্‌লি যে—বেরোবি না ?" বীরু প্রশ্ন করল।

পলটু মাথা নাড়ল, "বেরোতে গেলে নির্ঘাৎ ধরা পড়ে যাব, দেখছিস্‌ না টিকিট-চেকারে গিজগিজ করছে সমস্ত প্ল্যাটফার্ম্মটা! ভীড় কমে গেলে এক ফাঁকে বেরিয়ে যাব আমরা।"

বীরু অবাক হয়ে তাকাল চারদিকে। মস্ত বড় প্ল্যাটফর্ম্ম, একটা নয়, অনেকগুলো। কতগুলো গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, কত লোকজন, কত দোকান!

"এই কলকাতা—এঁ্যা !" সে বলল বিড়বিড় করে।

পলটু হেসে বলল, "হ্যাঁরে। কলকাতার দুটো স্টেশন কিন্তু এটার নাম শেয়ালদা—আর একটা উদিকে আছে, তার নাম হাওড়া। বুঝলি ?"

"হুঁ"—

কিন্তু বরাত খারাপ।

একটা কুলী যেতে যেতে থম্‌কে দাঁড়াল, তাদের দিকে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, "ইঁহা ক্যা করতা হ্যায় খোঁখালোগ্, আঁয় ?"

পলটু একটু মেজাজীভাব দেখিয়ে জবাব দিল, "বৈঠকে হ্যায়, তুমার কি ?"

"হাঁ ?" কুলীটা চটে গেল, "এ্যায়সা বাৎ ? টিকস্‌ হ্যায় তুম্‌লোগ্‌কা পাস্‌ ?"

"তুম্‌ কে হ্যায় যে টিকিট চাতা হ্যায় বাবা, এঁ্যা ?" পলটু সমান ভাবেই প্রশ্ন করল।

"ওঃ—টিকস্‌ নেহি হ্যায়—আচ্ছা"—

দূরে একজন টিকিট-চেকার হেঁটে যাচ্ছিল ফটকের দিকে, তাকে ডাক দিল কুলীটা।

"হুজুর—এ হুজুর"—

"কি বলছিস্‌ রে ?" চেকারবাবু ফিরে তাকাল।

"দেখিয়ে না বাবু—বিনা টিকস্‌কো আয়া হ্যায় অওর আঁখ দিখ্‌লাতা হ্যায়"—

"তাই নাকি রে ?" চেকারবাবু দ্রুতপদে কাছে এগিয়ে এল, বীরুদের আপদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করে প্রশ্ন করল, "কোথেকে আসছ হে ছোকরারা, এঁ্যা ?"

বীরুর মুখে কথা জোগাল না, পলটুই বলল, "আমরা এখানকারই ছেলে।"

"এখানকার ছেলে তবে এখানে কি করছ?"

"এই একটু বেড়াতে এসেছি।"

"বেড়াতে এয়েছ! ইয়ার্কি করার আর জায়গা পাওনি বুঝি? এই রাত বারোটার সময় বুঝি বেড়াবার সময়?"

পল্টু মাথা নাড়ল, "আজ্ঞে হ্যাঁ—এই সময়টাতেই বেড়াই আমরা, এই সময়ে বেড়ালে নাকি স্বাস্থ্য ভাল হয়।"

"বটে!" চেকারবাবু ভুঁরু কুঁচকোলেন, "তোমাদের পাকামো কম নয় তো"—

কুলীটি এবার উত্তেজিতকণ্ঠে বলল, "পাজী লড়্‌কা হ্যায় বাবু, বিনা টিকস্‌কো ঘর সে ভাগ্‌কে আয়া হ্যায়, পাক্‌ড়িয়ে"—

"হুঁ-বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছ! টিকিট দাও"—

"বাঃ—পালাব কেন? টিকিটই বা দেব কেন?" উচ্চকণ্ঠে পল্টু প্রতিবাদ জানাল।

বীরু তখন ভয়ে কুঁকড়ে গেছে, একটা কথাও আসছে না তার মুখে।

"চল—চল আমার সঙ্গে"—চেকারবাবু আদেশ করল।

"বাঃ—কোথায় যাব?"

"না গেলে পুলিশে দেব তোমাদের"—

ল্টুর চেহারা বদ্‌লাল, নিরুপায় ভঙ্গীতে সে বলল, "বেশ, চলুনতবে"

চেকারবাবু তাদের একটা ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটা বোধ হয় চেকারদের বিশ্রামাগার। মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল ছিল, তার চারিদিকে কয়েকটা চেয়ার। ফ্যান খুলে দিয়ে টেবিলটার ওপর কোট খুলে শুয়ে পড়ল চেকারবাবু।

বীরুদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সে, "সত্যি কথা যদি বল তাহলে ছেড়ে দেব—বুঝলে ?"

পল্টু মাথা নাড়ল, "কি বলব বলুন ?"

"বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছ ?"

"হ্যাঁ"—

"হুঁ—এটি কে ?" বীরুকে দেখাল চেকারবাবু।

"আমার ছোট ভাই।"

"কোথায় যাবে এখানে ?"

"আমার দিদির কাছে।"

"ওঃ—আচ্ছা একটা কাজ কর।"

"কি ?"

"পাটা টিপে দাও তো ছোক্রা—বড় টন্‌টন্ করছে।"

পল্টু সবেগে মাথা নাড়ল, "না।"

"না! কেন ?"

"আমি বামুনের ছেলে।"

"বামুন!—পৈতে কৈ ?"

পল্টু বীরুর দিকে তাকাল, "পৈতেটা দেখাতো বীরু"—

বীরু পৈতেটা বের করে দেখাল।

চেকারবাবু রাগতস্বরে বলল, "খুব বাম্‌নাই ফলানো হচ্ছে—আচ্ছা। ভোর হোক্, তখন পুলিশে দেব তোমাদের"—

এই বলে চোখ বুজল চেকারবাবু। বীরু অসহায়, কাতর দৃষ্টি মেলে তাকাল বন্ধুর দিকে। পল্টুর মুখও গম্ভীর দেখাল, সেও খুব ভাবনায় পড়েছে মনে হল।

কিন্তু তাদের হতাশা কেটে গেল। মিনিট কয়েক বাদেই

চেকারবাবুর নাক ডাকতে আরম্ভ করল। আর সে কি নাক ডাকা! বাপ্!

বীরু চোখ টিপে ইসারা করল, "চল্—পালাই"—

"চল্"—

পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরোল তারা। বেরোবার সময় বুকটা বেজায় টিপ্ টিপ্ করছিল। এই বুঝি চেকারবাবু দেখতে পেল! কিন্তু নির্বিঘ্নেই বেরিয়ে এল তারা, তারপর চোঁচাঁ দৌড় বাইরের দিকে।

তখন আব্ছা আব্ছা ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে। হয়ত এরি মধ্যে আরো আলো হোত যদি না আকাশ মেঘে ঘোলাটে থাকত। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল তখন। সেই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট আলোর মাঝখানে কলকাতাকে দেখতে পেল বীরু। চোখের পরদায় বিস্ময় ঘনীভূত হল, একটা বিস্ময়কে আবিষ্কারের আনন্দে বুকটা দুলে উঠল তার। কলকাতা! তার বড় বড় সৌধাবলী সগর্বে আকাশের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে। বিস্তৃত, ঝক্‌ঝকে রাজপথে এই অতি প্রত্যূষেই লোক-চলাচল শুরু হয়েছে, ইলেক্‌ট্রিক আর টেলিগ্রাফের পোষ্টের ওপর বসে কাকেরা কর্কশকণ্ঠে ডাকছে, মেথরেরা রাস্তায় ঝাঁট দিচ্ছে, ঘোড়ার গাড়ী, ট্যাক্সি আর রিক্‌সা যাতায়াত করছে। কাঞ্চনপুরের কথা মনে পড়ল বীরুর। স্মৃতির কোঠায় কাঞ্চনপুরকে হঠাৎ কেমন যেন ঝাপ্‌সা মনে হল, কলকাতার এই বিরাট আভিজাত্য-মণ্ডিত আকৃতির কাছে কাঞ্চনপুরকে যেন একটা জংলা দেশ বলে মনে হল। প্রথম দর্শনেই কলকাতাকে ভালবেসে ফেলল বীরু।

"কলকাতায় তো এলি—থাকবি কোথায়, খাবি কি?" বীরু একটু ভেবে প্রশ্ন করল।

"যেভাবেই হোক জোটাতে হবে। দু'তিন দিন বেড়িয়ে রাণাঘাটে যাবখ'ন আমার দাদামশাইয়ের ওখানে, বুঝলি? দাদা-মশাই মানে আমার মায়ের কাকা"—

"ওঃ—আচ্ছা"—

সোজা রাস্তা ধরে এগোল তারা। এগোতেই বৃষ্টির বেগ বাড়ল। ভিজে যাবার ভয়ে একটা বাড়ীর গাড়ীবারান্দার নীচে দাঁড়াল দুজনে। মস্ত বড় বাড়ী, চারতলা। বাড়ীটার সিঁড়ির ওপর উঠে বসল তারা।

"বিষ্টি থামলে এগোব আমরা, কেমন?" পল্টু বলল।

"আচ্ছা, উঃ, আজ খুব বেঁচে গেলাম, না?" বাঁরু জিজ্ঞেস করল।

"ইষ্টিশানে তো? হ্যাঁ, খুব বেঁচেছি বাবা।" পল্টু স্বীকৃতি জানাল।

এমনি সময় সিঁড়ির সামনেকার দরজাটা খুলে গেল এবং একজন মাড়োয়ারী নিদ্রাজড়িত চোখে বেরিয়ে এল।

তাদের দেখে মাড়োয়ারীটি প্রশ্ন করল, "তোমরা কে গো? এখানে কি করছ?" পরিষ্কার বাংলায় কথা বলল লোকটি।

পল্টু অত্যন্ত করুণ ভঙ্গীতে বলল, "আমাদের মা বাপ নেই, আমরা বড় দুঃখী, এখানে এসেছি আমাদের দিদির কাছে। বিষ্টি পড়ছে বলে এখানে দাঁড়িয়েছি।"

মাড়োয়ারীটির চোখে মুখে বিশ্বাসের ছায়া দেখা গেল না, সে ভুঁরু কুচ্‌কে হেসে বলল, "বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছ?"

পল্টু সবেগে মাথা নাড়ল, "নানা, তা কেন, বাঃ।"

"হুঁ—মুখচোখ শুক্‌নো দেখছি—কিছু খাওয়া হয়েছে?"

"না—দু'দিন ধরে কিচ্ছু খাইনি।"

"হুঁ—আচ্ছা বোস, কিছু খাবার আনিয়ে দিচ্ছি, খেয়ে দিদির বাড়ী যাও। দিদির বাড়ী চেন তো—কোথায় তা ?"

এবার মহা মুস্কিল হল, কি বলবে পল্টু ? বুদ্ধিতে এবার আর কুলোল না।

সে আম্‌তা আম্‌তা করে বলল, "ঠিক নাম জানি না জায়গাটার তবে একটু আগে, বাড়ী দেখালে চিনতে পারব।"

"ওঃ"—মাড়োয়ারীটি বিশ্বাস করল না এবারও, হাসল।

সে ঘরের ভেতর গেল, একটা দাঁতন আর এক ঘটি জল নিয়ে বেরিয়ে এসে দাঁত মাজতে লাগল। এদিকে রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল বেড়ে চলল। একটু বাদে বৃষ্টি কমল, সূর্য্যের আলো বড় বড় বাড়ীর ছাদগুলোকে স্পর্শ করল আর রাস্তা দিয়ে ট্রাম বাস চলাচল বাড়তে আরম্ভ করল।

হঠাৎ ট্রাম দেখে অবাক হয়ে বীরু প্রশ্ন করল—"এগুলো কি পল্টু ?"

"ট্রাম রে"—

"ট্রাম ! এই ! ওঃ"—দুচোখের তারায় পরম বিস্ময় জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে লাগল বীরুর।

কিন্তু খেতে পাওয়ার কথা শুনে ক্ষিদেটা বেজায় চাড়া দিয়ে উঠল। আর পারা যায় না। অথচ মাড়োয়ারীর মুখ ধোওয়া আর শেষ হচ্ছে না, দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজছে তো মাজছেই।

পল্টুর কোনো লজ্জা নেই, সে আর না পেরে বলল, "শুনুন"—

"কি ?" মাড়োয়ারীটি মুখ তুলে তাকাল।

"ইয়ে"—

"কি ?"

"বড় দেরী হচ্ছে। আমাদের কিছু পয়সা দিয়ে দিন—বাজারে খেয়ে নেব।"

"খুব ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি ? আচ্ছা, নাও এই আধুলিটা"—পকেট থেকে একটা আট আনি বের করে সে পল্টুর দিকে এগিয়ে দিল।

পল্টু একেবারে নাক কাণ কাটা, সে বলল, "মাত্তর আট আনা ! আর কিছু দিন্ না—এতে কি পেট ভরবে ?"

মাড়োয়ারীটি মাথা নাড়ল, "আর আমি পারব না বাপু। দিদির বাড়ী গিয়ে বাকী পেট ভরিও।"

"আচ্ছা তাই সই। নমস্কার।"

মাড়োয়ারী হেসে বলল, "নমস্কার। আর শোন, দিদির বাড়ী থেকে যত তাড়াতাড়ি পারো বাড়ী ফিরে যেও—বুঝলে ?"

"আচ্ছা"—বলে পল্টু বীরুকে টেনে নিয়ে রাস্তায় নামল।

খানিকটা এগিয়ে গেলে বীরু হেসে বলল, "আচ্ছা তোর লজ্জা করল নারে—এঁ্যা ?"

পল্টু তরলকণ্ঠে বলল, "লজ্জা আবার কি ? ঐ সব মাড়োয়ারীরা কোটী কোটী টাকার মালিক—অথচ কি রকম কিপ্টে দেখছিস্, মাত্তর আট আনা দিল মাইরি !"

"কোটী কোটী টাকার মালিক !" বীরু বিড়বিড় করে বলল, "অথচ গরীবদের কিছু দেয় না ওরা ?"

"দেয় বৈকি—নামের জন্য তা। আর দিলেই বা কি হবে ? কিচ্ছু না। পৃথিবীর সব টাকাকড়ি, খাবার দাবার সমানভাবে সবাইকে বেঁটে দিলে না বুঝি ? এঁ্যা ?"

"হ্যাঁ—ঠিক, ঠিক।" বীরুর কথাটা মনে ধরল।

"ওসব কথা থাক্—চল্ খাই তো।" পল্টু তাড়া দিল। আধুলীটাকে বুড়ো আঙুল দিয়ে বাজিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে আবার লুফে নিয়ে সে তার ছোট ছোট চোখ মেলে হাসল।

আট-আনি ভাঙ্গিয়ে ছ'আনার খাবার খেল দু'জনে। আর বাকী দু'আনা ভবিষ্যতের জন্য রাখল। বীরুর মনে হল সাংঘাতিক একটা কাজ করছে তারা। এই স্বেচ্ছাকৃত দুঃখ যেন তার কাছে একটা পরম গৌরবের জিনিষ বলে মনে হল। কলকাতায় এসেছে সে। তার বয়সী আর কারো কি এত সাহস হত! কত কাণ্ড করে সে কলকাতা এসেছে, উঃ। আত্মপ্রসাদে মনটা ভরে উঠল তার। আর প্রাণের বন্ধুটি সত্যি একটি রত্ন। কি ধারালো বুদ্ধি পল্টুর, বাস্ রে! সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে সে বন্ধুর দিকে তাকতে লাগল মাঝে মাঝে।

সারাদিন ঘুরল তারা। ক্ষ্যাপার মত, যাযাবরের মত। অনাথের মত। বিনা পয়সায় ট্রামে চড়ল, কন্ডাক্টর নামিয়ে দিল মাঝপথে, আবার অন্য আর একটাতে চড়ল। ট্রামের স্বচ্ছন্দ গতি, তার ঢন্ ঢন্ আওয়াজ ওদের উত্তেজিত করে তুলল।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল বীরু। আকাশকে ছুঁয়ে ফেলেছে শহরের বড় বড় বাড়ীগুলো। বিদ্যুৎ বেগে মোটর বাস্ ট্যাক্সি ছুটছে। ছুটছে ব্যস্তসমস্ত জনতার স্রোত। চারদিকে ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি। সাজানো গোছানো বড় বড় দোকান যেন অমরাবতীর সৌন্দর্য্যের পসরা খুলে বসেছে। সুদৃশ্য পোষাক-পরা মেয়েপুরুষেরা। ছবির মত পার্কগুলো। খেলাধুলায় মত্ত তাদের বয়সী, সুখী ছেলে-মেয়েরা। কাঞ্চনপুরকে অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ মনে হল বীরুর। মনে হল যে সে পৃথিবীর সেরা জায়গায় এসে পড়েছে। এর কাছে

কাঞ্চনপুর একটা জংলা দেশ মাত্র। কাঞ্চনপুরের মানুষেরা কত দীন, কত দরিদ্র, কত হতভাগা এখানকার লোকদের তুলনায়! তার লজ্জা হল, দুঃখ হল। কেন সে এই শহরে থাকতে পারে না? এই হাসি, গান, কোলাহল, আনন্দ আর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কি তার স্থান হতে পারে না? পল্টুকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল যে টাকা না থাকলে এখানে থাকা যায় না। আবার সেই একই কথা ঘুরে ফিরে আসে, মনে জ্বালা ধরায়। গরীবের কাছে কাঞ্চনপুর আর কলকাতা সবই সমান। কলকাতা দেখার রোমাঞ্চ হাওয়া হয়ে উড়ে যায় এই ভেবে যে সমস্ত ভারতবর্ষটা কলকাতা নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে শহর মাত্র কয়েকটা কিন্তু গ্রাম আছে লক্ষ লক্ষ। আর প্রায় গ্রামই কাঞ্চনপুরের মতই। তাহলে? কারা থাকে এখানে? লক্ষ লক্ষ গ্রামের কোটী কোটী হতভাগ্যদের চেয়ে এরা কেন বেশী আনন্দ আর ঐশ্বর্য্য ভোগ করছে? কেন? হঠাৎ কাঞ্চনপুরের ওপর বড় মমতা হল বীরুর। না, তাদের কাঞ্চনপুর ফেল্না নয়। কাঞ্চনপুর আর কাঞ্চনপুরের মত লক্ষ লক্ষ গ্রাম আছে বলেই তো কলকাতা আছে। কাঞ্চনপুর না থাকলে কলকাতাও থাকত না।

পেটে টান ধরলে কিন্তু কিছুই ভালো লাগে না। বিকেলের দিকে সঞ্চিত দু'আনা কর্পূরের মত উড়ে গেল তবু ক্ষিদে বেড়েই চলল। রাস্তার কল থেকে ওরা জল খেল দু'বার কিন্তু ক্ষিদের আগুন একটুও নিভল না তাতে। দুপাশের অসংখ্য বৈচিত্র্য আর কোলাহল, জনতা আর যানবাহন ক্ষিদের জ্বালাকে ভুলিয়ে তাদের দৃষ্টিকে কিছুতেই আর আকৃষ্ট করতে পারল না।

"পল্টু—আর তো পারছি না ভাই"—কাঁদ কাঁদ স্বরে বীরু বলল।

"হুঁ"—চিন্তিতমুখে, শুষ্ককণ্ঠে পল্টু বলল, "ভাবছি কি করা যায়।"

বীরুর হঠাৎ বাড়ীর কথা মনে পড়ল। খিদে পেলে মা আর দিদি কত যত্ন করে খাওয়াত তা মনে পড়ল। খাবারের থালায় হয়ত শুধু ডাল ভাত আর একটা শাক চচ্চড়ি থাকত, তবু কত মিষ্টি মনে হত সে খাবার। হঠাৎ চোখটা তার জ্বালা করে উঠল। আজো হয়ত মা তার জন্য ভাত বেড়ে বসেছিলেন, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছিলেন। দিদি হয়ত তখন করাতগাছের পাশে দাঁড়িয়ে আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য পথটার দিকে তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টে। হঠাৎ দুর্নিবার একটা বিরাগ জন্মাল তার কলকাতার ওপর। কলকাতা কাঞ্চনপুরের মত মমতাময়ী নয়, কলকাতা উদাসীন, স্বার্থপর, কে খেতে পেল না পেল তা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই।

"বীরু, শোন্"—

"কি ?"

"আমি যা বলি তাই কর, বুঝলি ?"

"আচ্ছা"—

পল্টুর কথামত বীরু ফুটপাথের একটু জনবিরল জায়গায় শুয়ে পড়ল, তারপরে কোঁচার খুঁট খুলে গলা পর্য্যন্ত ঢেকে নিয়ে কাঁপতে আরম্ভ করল।

তখন পল্টু কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে রাস্তার লোকদের বলতে লাগল, "দয়া করুন, আমার ছোট ভাই সাত আটদিন ধরে জ্বরে ভুগছে, চারদিন ধরে সে কিছু খায়নি—মা বাপ নেই আমাদের, আমরা বড় গরীব। দয়া করুন, ঐদিকে তাকিয়ে দেখুন আমার ভাই কেমন কষ্ট পাচ্ছে।"

এক ঘণ্টা ধরে এমনি বলে বলে সে প্রত্যেকের কাছে হাত পাতল। এক ঘণ্টা ধরে গলা পর্য্যন্ত ঢেকে, চোখ বুজে পড়ে থেকে শরীর কাঁপাতে লাগল বীরু। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল সে। পথচারীরা

কেউ শুনল, কেউ শুনল না পল্টুর কথা। কেউ তার কথা শুনে হয়ত বীরুর দিকে একবার তাকিয়েই সরে পড়ল, আবার দু'একজন এক আনা দু'পয়সা দিয়েও গেল।

পল্টু গুনল হাতের পয়সা। মোট চোদ্দ আনা এক পয়সা পাওয়া গেছে। এতেই আপাততঃ হবে।

সে একপাশে দাঁড়াল। যখন ভীড় একটু কমে এল তখন সে এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "তাড়াতাড়ি উঠে চলতে থাক্ বীরু—ওঠ্—ওঠ্"—বাঁচল বীরু। কে বলবে যে সে আটদিন ধরে জ্বরে ভুগছে, চারদিন ধরে খায়নি? তড়াক্ করে একলাফ দিয়ে উঠে সে সবেগে চলতে আরম্ভ করে দিল।

পল্টু পাশে আসতেই জিজ্ঞেস করল সে, "কত পেলি ভাই?"

"চোদ্দ আনা এক পয়সা"—সগর্ব্বে জবাব দিল পল্টু।

"উঃ—এমন বিচ্ছিরী লাগছিল যে কি বলব"—

"কি করবি বল্, তুই তো আর আমার মতো কথা বলতে পারতিস্ না"—

"তা ঠিক। কিন্তু পল্টু, আমরা শেষে ভিক্ষে চাইলাম!"

"আমরা তো আর সারাজীবন ভিক্ষে চাইব না। এতো এমনি—না খেয়ে থাকব কেন রে?"

কথা বলতে বলতে দু'জনে থমকে দাঁড়াল। কে যেন ডাকছে!

"ওহে ছোক্‌রারা—শোন—শোন—"

ফিরে তাকাল দু'জনে। একজন লোক হাত নেড়ে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে এল। কে রে বাবা লোকটা? বীরু খুব ঘাবড়ে গেল।

লোকটির চেহারা দেখলে কেমন যেন অস্বস্তিবোধ হয়। লম্বা

দোহারা গড়ন তার, বেশ মোটা গোঁফ আছে। চোখের নীচে গভীর কালো ছায়া, ডান ভুঁরুর ওপরে একটা দাগ, মাথার চুলগুলি কদমের মত ছাঁটাই করা। পরণে পাৎলা ধুতি, হাতকাটা গেঞ্জীর ওপর ফিন্‌ফিনে মল্‌মলের পাঞ্জাবী, পায়ে কাবলী চপ্পল। ভদ্রলোকের মতই দেখতে লোকটি তবু তাকে দেখে কেমন যেন অস্বস্তিকর একটা অনু-ভূতি বীরুর গায়ের ভেতর শর্‌শর্‌ করে উঠল।

লোকটি পল্টুর পিঠে মৃদু একটা চাপড় দিয়ে, বীরুর দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বলল, "সাবাস্‌, তোমাদের বাহাদুরি আছে বাবা! বেড়ে এ্যাক্টো করলে! চমৎকার!"

"কি বলছেন আপনি?" হতভম্বের মত প্রশ্ন করল পল্টু।

"যা বলছি তা কি বোঝনি চাঁদ? তোমরা ডালে ডালে বেড়াও, আমি যে বেড়াই পাতায় পাতায়। না, তোমাদের ইলম্‌ আছে মাইরি— তোমরা কাজের ছেলে"—

"আপনার কথা বুঝতে পারছি না—কি বলছেন?"

"আমার কথা! হায় হায় হায়"—লোকটি হাসল, তার হাসি গ্যাঁজাখোরদের গলার মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা, সে বলল, "বেশ, বলছি। তোমাদের কি কেউ আছে?"

"না, আমাদের মা বাপ নেই, আমরা গরীব।" পল্টু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল।

"তা বুঝেছি বলেই তো ডাকছি। বলি কাজকর্ম্ম পেলে কর্ব্বে? না খেয়ে তো আর থাকতে পারবে না"—

"হ্যাঁ—করব।"

"বেশ, তবে এসো আমার সঙ্গে, আমি কাজ দেব। তার আগে চল খেয়েদেয়ে নেবে।"

পল্টু বীরুর দিকে তাকাল, বীরুও তাকাল তার দিকে। কি করবে তারা বুঝে উঠতে পারল না।

লোকটি আবার হেসে বলল, "ভয় হচ্ছে নাকি, এঁ্যা? ভয়ের কিছু নেই মাইরি—সত্যি বলছি। এসো"—

"চলুন"—হঠাৎ বীরু বলে ফেলল। তার কেমন যেন কৌতূহল বোধ হল। কাজ করে টাকা পয়সা পাবে একথাটা ভাবতে কেমন যেন ভালো লাগল। দেখাই যাক্ না কি রকম কাজ করতে দেয় লোকটা।

বড় রাস্তা ছেড়ে একটা গলিতে পড়ল তারা। এঁকে বেঁকে, নানা গলি বেয়ে, শেষে যে বাড়ীটার সামনে এসে লোকটা থামল সেখানকার চেহারা দেখে বিতৃষ্ণায় ওদের মন ভরে উঠল। নোংরা, স্যাঁতসেঁতে গলি, দু'জন মানুষ কায়ক্লেশে চলতে পারে এমনি সংকীর্ণতা! এখানে ওখানে উনুনের ছাই আর তরকারীর খোসা পড়ে আছে। আর দু'পাশে যেসব বাড়ীগুলো সূর্য্যের আলোকে আড়াল করে অন্ধকার ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে তাদের গায়ে পলেস্তরার কোনো বালাই নেই, দেখেই বোঝা যায় যে বহুদিনের পুরোনো বাড়ী সেগুলো, জরা-জীর্ণ বুড়োদের মত তাদের হাড় গোড় সব বেরিয়ে এসেছে, নড়বড়ে হয়ে এসেছে সমস্ত ইঁটের গ্রন্থি।

বাড়ীটার দরজায় তিনবার টোকা মারল লোকটি। ভেতর থেকে একটি ছেলের গলা ভেসে এল 'যাই'। কয়েক সেকেণ্ড্ পরেই দরজাটা খুলে গেল।

"সর্দ্দার!" একটা লম্বা চুলওয়ালা পনেরো যোলো বছরের ছেলের মুখ দরজার পাশে দেখা গেল।

"এরা তোদের নতুন সঙ্গী—বুঝলি বংশী"—লোকটি গোঁফ চুমরে বলল।

"ওঃ—তা বেশ তো। এসো ভাই—ভেতরে এসো।" একগাল হেসে বলল বংশী।

কিন্তু বংশীর এই হাসি আর সাদর অভ্যর্থনা দেখেও ভরসা পেল না বীরু। ছেলেটার চোখে মুখে কেমন যেন পাকামোর ভাব, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি আছে মনে হল।

ভেতরে ঢুকল সবাই। বংশী দরজা বন্ধ করে দিল।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "বঙ্কারা সব বুঝি বাইরে ?"

"হ্যাঁ"—বংশী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

"শোন্ বংশী—ও বেলার ভাত কিছু আছে তো বঙ্কাদের জন্য—তা থেকে এদের দু'জনকে চাট্টি খেতে দে। যাও হে ছোকরারা—হ্যাঁ—তোমাদের নাম তো জানা উচিত আমাদের"—

পল্টু বলল, "আমার নাম পল্টু আর ওর নাম বীরু"—

"বেশ। তাহলে তোমরা খেয়ে নাও, তারপর কাজের কথা হবে।"

একটা ঝুলকালি ভর্ত্তি নোংরা রান্নাঘরের ভেতর বংশী বীরুদের নিয়ে গেল, বলল, "আসন আর জল নিয়ে বোস্ তোরা—আমি ভাত বেড়ে দিচ্ছি"—তারপরে ভাত বাড়তে বাড়তে মুচ্‌কি হেসে বলল, "সর্দ্দারের হাতে কি করে পড়লি রে, এঁ্যা ?"

পল্টু ছোট চোখগুলোকে আরো ছোট করে প্রশ্ন করল, "কেন তাতে হয়েছে কি ? তোমাদের মতই আমরা পড়েছি ওর হাতে"—

"হুঁ—দেখ্ ধোপে টিঁকতে পারিস্ কিনা।"

পেটে ভাত পড়তেই সমস্ত রক্ত যেন চঞ্চল হয়ে উঠল, শিথিল দেহটা আবার শক্ত হয়ে উঠল, গোগ্রাসে ভাত গিলতে গিলতে

বীরু আজ সর্ব্বপ্রথম অনুভব করল যে পৃথিবীতে যারা খুব গরীব, যারা দিনান্তে একবারও খেতে পায় না, যারা একদিন অন্তর ভাত খায়, তাদের কি অবস্থা, কি অসহনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করে তারা, কি ব্যর্থ তাদের মনুষ্য-জীবন।

বংশীর কথাগুলো কেমন যেন ভাসা ভাসা, তা বুঝতে পারল না বীরু। খেতে খেতে সে বংশীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "তোমাদের কেউ নেই ?"

বংশী পান-খাওয়া দাঁত মেলে হাসল, "কেউ থাক্‌লে কি এখানে আসি ?" জল দিয়ে হাতটা ধুয়ে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরিয়ে সে ধোঁয়া ছাড়ল, বলল, "নাঃ, কেউ নেই। সব শালা মরে হেজে গেছে। আর তোদের—তোদের কি আছে কেউ ?"

বীরু মাথা নাড়ল। বাপ মা রয়েছে, থাকতেও পল্টুর মত অত ঘন ঘন 'নেই' বলতে বাধল তার।

"হুঁ—তাই"—বংশী মাথা নাড়ল, "তা নইলে এখানে কেউ মরতে আসে।"

পল্টু ভ্রূ কুঁচ্‌কে বলল, "কেন—এখানে কি দোষ ভাই ?"

বংশী এবার নড়ে বসল, যেন ধমক দিয়ে বলল, "নে নে, খেয়ে নে তো— ওসব সময় হলেই জানবি।"

খাওয়া দাওয়ার পর পাশের ঘরটাতে গিয়ে পল্টু সরাসরি লোকটিকে বলল, "এবার বলুন দেখি কি কাজ ?"

লোকটি গোঁফে চুমড়ি দিয়ে ভাঙ্গা গলায় হেসে উঠল, "হাঃ হাঃ হাঃ—খুবই যে ঘাবড়ে গেছিস্ দেখছি। আরে ভয় কি ? সে কথা যাক্, খেয়েছিস্ ? পেট ভরেছে ?"

"ভরেছে, কিন্তু এবার বলুন কি কাজ"—পল্টু উদ্ধতভাবে আবার বলল।

লোকটি এবার চোখ পাকাল, "ভারী বেয়াড়া তো! অমন জেদ্ করলে গলা টিপে শেষ করে দেব কিন্তু, বলছি তো বলব'খন, ভয়ের কিছু নেই। অন্যান্য ছেলেরা ফিরে আসুক—তখন বলব।"

বীরু পল্টুর দিকে তাকাল। প্রাণের বন্ধুর মুখ কালো হয়ে উঠেছে। তার নিজের মুখও কম কালো হয়নি, ভয়ে শুকিয়ে গেল তা লোকটির কথা শুনে। ব্যাপার কি? লোকটা যে এখন চেহারা পালটে ফেলল, তুই মুই করে কথা বলছে, চোখ পাকাচ্ছে, গলা টিপে মেরে ফেলার কথা বলছে। যদি মেরে ফেলে তাদের? এই অপরিচিত মহানগরীর অজানা, অচেনা গলির পুরোণো বাড়ার অন্ধকারে, ঐ গুঁফো লোকটা যদি হঠাৎ তাদের গলা টিপে ধরে তাহলে তাদের অন্তিম চীৎকার কি শত শত মাইল ডিঙ্গিয়ে, কাঞ্চনপুরে, তাদের মা বাবার কানে গিয়ে পৌছুবে? ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল বীরু, তার বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। বোঁচার টঁ্যাকেও যে ভয় পায়নি সে আজ মানুষ দেখে ভয় পেল, অনুভব করল যে ভূত প্রেতের চেয়েও মানুষ বেশী মারাত্মক।

ওরা আর কথা বলল না।

সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের দরজায় আবার টোকা শোনা গেল। তিনটে টোকা। বংশী গিয়ে দরজা খুলে দিতেই কলরব করে ঢুকল পাঁচটি ছেলে। তারা বীরু আর পল্টুকে দেখে থম্‌কে দাঁড়াল, নিঃশব্দ হয়ে গেল।

লোকটি হেসে বলল, "এদের দেখে ঘাব্ড়াস্ না, এরা দলের

নতুন লোক—খুব ওস্তাদ ছেলে, তবে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। আয়, আয, কি এনেছিস্ দেখি।"

পাঁচজন ছেলে তাদের বয়স চোদ্দ থেকে আঠারো পর্য্যন্ত হবে। প্রত্যেকেরই মুখে চোখে বংশীর মতই পাকামো আর বজ্জাতি। তাদের নাম বঙ্কু, ফণি, কানাই, বেচু, জগু।

প্রত্যেকেই নিজের নিজের ট্যাঁক থেকে নানা জিনিষ বের করে রাখল লোকটির কাছে। ঘড়ি, মণিব্যাগ, খুচরো টাকা পয়সা, ফাউন্টেনপেন—এমনি নানান্ জিনিষ। প্রত্যেকেই পাঁচ থেকে ত্রিশ চল্লিশ টাকার মাল বা টাকা বের করল, কেবল জগু বের করল মাত্র দু'টাকা তিন আনা।

লোকটি জগুকে ধম্‌কে উঠল, "এত কম এনেছিস্ ক্যান রে ?

জগু কাচুমাচু হযে বলল, "আজ আর পেলাম না—দু'দুটো শিকার বাজে বেরিয়ে গেল।"

লোকটি গর্জ্জন করে উঠল, বাধা দিযে বলল, "ফের কথা বলবি তো চড়িয়ে মুখ ভোঁতা করে দেব রে শুযোরের বাচ্চা। বাজে শিকার! মালদার শিকার চিনতে শিখিস্‌নি এখনো—এঁ্যা ? আচ্ছা, শিখিয়ে দিচ্ছি তোকে। এই বংশী"—

"কি ?"

"আজ জগার খাওযা বন্ধ। এবার দেখিস্, কাল ও ঠিক রোজগার করবে, পেটে চড়া পড়লেই দেখ্‌বি আর ভুল হবে না।"

বীরু সব দেখে শুনে ঘেমে উঠল। কি ব্যাপার ? এরা কোত্থেকে আনল এত জিনিষ ? কি করে এসব দিয়ে ? কম আনায জগু বলে ছেলেটাকে কেন ধমকাচ্ছে লোকটা ? না, ব্যাপার সুবিধের নয।

লোকটি এবার পল্টুর দিকে তাকাল, "কি কাজ জানতে চাইছিলি না? যে কাজ করতে হবে তোদের তাতে এইসব জিনিস পাওয়া যায়। কি করে পাওয়া যায় তা বংশী তোদের দেখিয়ে দেবে। বংশী"—

"কি?"

"এদের নিয়ে তুই এবার বেরো, একটু দেখিয়ে দে কি কাজ, তারপর রাতের বেলা থেকে আমি ওদের শেখাতে আরম্ভ করব। যারে পল্টু, বীরুকে নিয়ে বংশীর সঙ্গে যা"—

"চল্"—বংশী ডাক দিল।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বীরু। উঃ, বাঁচা গেল। বংশী আগে আগে চলছিল। দু'পা গিয়ে থেমে গেল বীরু, পল্টুও থামল। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, গলির এককোণে একটা গ্যাসের ল্যাম্প মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে।

ফিস্‌ফিস্ করে বীরু বলল, "ব্যাপার সুবিধের নয়, রাস্তায় বেরিয়েই পালিয়ে যাব কি বলিস?"

পল্টু বলল, "সে যেতে আর কি, তবে ব্যাপারটা দেখিনা সব। আরে, মারবে বললেই কি মারা যায়—গবরমেণ্টের রাজ্য না এটা? ঘাব্‌ড়াস্ না"—

বীরুর রাগ হল। পল্টুর যত মোড়লী। রাগ করে একটা কিছু বলতে যেতেই বাধা পেল সে।

বংশী পেছন ফিরে তাদের দিকে তাকিয়ে কর্কশকণ্ঠে বলল, "কি সব ফুসুর ফাসুর করছিস্ রে? পালাবার মৎলব আঁটছিস্ বুঝি? হুঁ হুঁ বাওয়া, আমায় অত বোকা ভাবিস্ না, আমার ঘাড়ে দুটো চোখ বেশী আছে, বুঝলি?"

পল্টু দাঁত মেলে হাসল, "ধ্যেৎ, কি যে বলছ বংশীদা"—

"ইস্! আবার 'দাদা' বলছিস্ যে রে—হাত করার চেষ্টা করছিস্ বুঝি?"

"না না, তা কেন, বাঃ। তুমি তো বয়েসে বড় আমাদের চেয়ে"—

"আচ্ছা বেশ, চল্ এবার।"

খানিকটা চলার পরেই বড় রাস্তা পড়ল। তখন রাস্তা দোকানপাট আর বাড়ীঘরের আলো জ্বলে উঠেছে। ঝকমক্ করছে সব কিছু। রাস্তায় ভীড় বেড়েছে। গাড়ী ঘোড়া ট্রাম বাসের সংখ্যাও বেড়েছে। মাঝে মাঝে মস্ত বড় বড় মিলিটারী লরী আর ট্রাক রাস্তাঘাট কাঁপিয়ে হাওয়ার মত ছুটে যাচ্ছে। আর সুন্দর সুন্দর পোষাক-পরা মানুষ চলেছে। বেড়াতে বেরিয়েছে সবাই। মহানগরীর বাতাসে এখন পাউডার আর এসেন্সের সুরভি, হাসি আর গান।

বংশী বলল, "দাঁড়া এখানে"—গলার স্বরটা খুব নামিয়ে সে বলল, "তোরা এই গলির মুখেই থাক্, আমি কি করি দেখ্। যেই আমি ফিরে আসতে থাকব তখন আমার দিকে না তাকিয়েই গলির ভেতর দিয়ে চলতে আরম্ভ করবি। বুঝলি তো? খবরদার, একটুও গোলমাল করিস্ না কিন্তু—তাহলে নির্ঘাৎ জেল খাটতে হবে"—

"আচ্ছা"—শুষ্ককণ্ঠে পল্টু আর বীরু বলল।

বংশী এগিয়ে গেল, একপাশে দাঁড়িয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে লাগল। যেন ছিপ ফেলে ফাৎনার দিকে দেখছে সে। হঠাৎ তার চোখ দুটো চকমকির মত জ্বলে উঠল। কয়েক পা এগিয়ে ডানহাতি একটা পানের দোকান। সেখানে খরিদ্দারদের খুব ভীড় জমেছে। নানাশ্রেণীর লোক আছে সেখানে। তাদেরই মধ্যে একজনকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল বংশী। ভদ্রলোক সাদা

পাম্পস্ আর সোণার বোতামওলা সাদা সিল্কের পাঞ্জাবী পরে ছিল, তার হাতে ছিল সোনার ব্যাণ্ড-যুক্ত সুন্দর একটা ঘড়ি আর ডান-হাতের দু'টো আঙ্গুলে ছিল দামী পাথর বসানো দুটো সোনার আংটী। দোকানদারের কাছে এক টিন সিগারেট চেয়ে পকেট থেকে মণিব্যাগ বের করল ভদ্রলোক। ব্যাগটা বেশ মোটা ছিল, নোট ভর্ত্তি মনে হল। তা থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে দোকানদারকে দিল সে।

বীরু আর পল্টু একদৃষ্টে বংশীর দিকে তাকিয়ে ছিল। উত্তেজনা আর কৌতূহলে দম্ ওদের আট্‌কে আসছিল।

বীরু বলল, "কিরে, পালাবি নাকি ?"

পল্টু মাথা নাড়ল, "মনে নেই যে বংশী আমাদের ওপর নজর রেখেছে—ওর ঘাড়ে দুটো চোখ আছে ?"

"ইঃ—চোখ না হাতী"—

"দাঁড়া না—দেখি কি করে ছোঁড়া"—

বংশী তখন পানের দোকানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক ভদ্র-লোকটির সামনে। দোকানদারকে পয়সা দিয়ে এক বাণ্ডিল বিড়ি কিনল সে। দোকানদারটি তাকে বিড়ি দিয়েই ভদ্রলোককে তার বাকী টাকা ফেরৎ দিল। ভদ্রলোকটি তা গুনে তার ব্যাগে রাখল, রেখে আয়নার দিকে তাকিয়ে পকেটের রুমাল বের করে মুখ মুছল। ঠিক সেই সময়েই ঘুরে দাঁড়াল বংশী। পেছনে যে লোক ছিল তা যেন সে জানে না এমনি ভাণ করে সবেগে চলতে গিয়েই সে ভদ্রলোকটির সঙ্গে ধাক্কা খেল, টাল সামলাতে গিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরল। ভদ্রলোকটি চটে মটে কি যেন বলে ঠেলে দিল বংশীকে। তার হাতের রুমালটা ছিট্‌কে মাটীতে পড়ে

গিয়েছিল তা কুড়োবার জন্য ঝুঁকে পড়ল সে। আর সেই অবসরে বংশী হন্‌হন্‌ করে গলির দিকে আসতে লাগল।

"চল্‌ শিগ্‌গীর"—পলটু বীরুকে ঠেলা দিল।

বীরুর চমক ভাঙ্গল। দ্রুতপদে গলির মধ্যে ঢুকে গেল তারা। পরমুহূর্ত্তেই বংশী এসে পড়ল।

দ্রুতকণ্ঠে সে বলল, "আমার পেছন পেছন দৌড় মার, সোজা নয়, এই ডানদিকে আয়"—

ঠিক সেই সময়েই রাস্তা থেকে কোলাহল ভেসে এল 'পকেটমার, পকেটমার—ধরো, ধরো'—বংশী দৌড় মারল, পেছনে বীরু আর পলটুও দৌড়োল।

"খুব জোরে দৌড়ো"—বংশী বলল।

দৌড়—দৌড়—সাপের মত এঁকেবেঁকে তারা সেই বাড়ীর সামনে গিয়ে থামল।

বংশী দাঁড়িয়ে হাসল, পকেট থেকে একটা নোংরা রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছে বলল, "দেখলি তোদের কি কাজ করতে হবে? এ্যাঁ?"

পলটু নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

বীরু অর্দ্ধস্ফুটকণ্ঠে বলল, "পকেট মারতে হবে? চুরী!"

তরলকণ্ঠে হেসে উঠল বংশী, "ঘাবড়াচ্ছিস্‌ যে! ও কিছু না—সব শিখিয়ে দেবে সর্দার"—

বীরু আর চলতে পারল না, তার অন্তরের ভয় মুখে ফুটে উঠল, সে বলল, "বংশীদা"—

"কি রে?"

"আমরা তো পারব না এ কাজ"—

"সত্যি পারব না বংশীদা—দোহাই"—পলটু যোগ দিল বীরুর সঙ্গে।

বংশী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল ওদের দিকে, বলল, "পারবি না? ভেবে দেখ্"—

ওরা একসঙ্গে মাথা নাড়ল, "না, পারব না।"

"তাহলে খাবি কি? তোদের কেউ নেই যে"—

বীরু বলল, "আমরা মিথ্যে কথা বলেছি। বাড়ী থেকে রাগ করে পালিয়ে এসেছি আমরা—আমাদের মা বাপ সবাই আছে"—

"তাই বল্"—বংশী মাথা নেড়ে পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরাল, "হুঁ—তাই। আচ্ছা শোন্—তোদের ফিরে যাবার ব্যবস্থা করব আমি, ভয় পাস্ না। এখন কেন ছেড়ে দিলাম না জানিস? এখন ছেড়ে দিলে আমার ওপর জুলুম করত সর্দ্দারটা। চুপ্‌চাপ্ ভেতরে চ', এমন ভাণ দেখা যে এই কাজ খুব পছন্দ হয়েছে তোদের, যখন সর্দ্দার তোদের হাতসাফাই শেখাবে তখন খুব মন দিয়ে শিখ্‌তে চেষ্টা করবি, বুঝলি? তারপর রাত হলে আমি সব ব্যবস্থা করে দেব, কেমন?"

বীরুর চোখেমুখে আবার রক্ত ফিরে এল, "আচ্ছা, আচ্ছা বংশীদা—তাহলে আমরা তোমার কাছে কেনা হয়ে থাকব।"

"আরে চুপ কর, ওসব বলতে হবে না। দাঁড়া"—বলেই চুরী করা ব্যাগটা খুলে দেখে, দুটো নোট বের করে ট্যাঁকে গুঁজে ফেলল, তারপর বলল, "খোদার ওপর খোদ্‌কারী করতে হয়, বুঝলি? না করলে পোষাবে কেন বাবা?"

"আচ্ছা বংশীদা"—পল্টু বলল, "তুমিও চল না কেন পালিয়ে? কেন থাকো তুমি এদের সঙ্গে?"

বংশী ম্লানভাবে হাসল, "নারে, আমার আর পালাবার উপায় নেই।

দশ বছর বয়েস থেকে এই সব করছি, একেবারে গোল্লায় গেছি, আর বদ্‌লাব না আমি। তাছাড়া কে আছে আমার যে ভাল হব আমি? না, আমি পালাব না, তোরাই চলে যাস্। যাক্, এখন ওসব কথা থাক্, এবার ভেতরে চ' "—

দরজায় টোকা দিল সে। তিনবার।

বেচু দরজা খুলে দিল।

"হয়ে গেল কাজ—এরি মধ্যে?" সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল। বংশী তাকে একটা ঠেলা দিল, "তবে? আমায় কি ভেবেছিস্ রে শালা? আনাড়ী নাকি আমি?"

ভেতরে যেতেই সেই গুম্ফবান লোকটা প্রশ্ন করল, "কি রে বংশী, কি পেলি?"

বংশী মনিব্যাগটা লোকটির হাতে দিয়ে বলল, "দেখুন—গুনিনি।"

লোকটি সাগ্রহে ব্যাগ খুলে ভেতরকার টাকাপয়সা গুনল, মুখে হাসি ফুটল তার মোটা গোঁফের আড়ালে, বলল, "বাইশ টাকা চার আনা—সাবাস্ বেটা!" বীরুদের দিকে তাকিয়ে সে চোখ নাচাল, "কিরে, তোরা দেখলি তো?"

বীরু সহাস্যে মাথা নাড়ল, "হঁ্যা"—বংশীর উপদেশ সে একটিও ভোলেনি।

"তাহলে এ কাজ তোদের পছন্দ হয়েছে, না?"

পল্টু বলল, "হঁ্যা—খু-ব"—

লোকটি হেসে উঠল, "বটে! লাভের গন্ধ পেয়েই লোভ হয়েছে! বেশ, ভালো কথা। আচ্ছা, তবে এখন থেকেই তোদের ট্রেনিং দিতে আরম্ভ করি, কি বলিস্? এমন হাতের কাজ শেখাব তোদের যে সবাই বলবে, হঁ্যা হিরু সর্দ্দারের সাগ্‌রেদ বটে"—

এই বলে সে পকেটমারার করাসাজি দেখাতে আরম্ভ করল।

"দেখছিস্ তো আমার হাতে কিছু নেই? বেশ। ধর বংশী এমনি করে দাঁড়িয়ে আছে, তার বুকপকেটে এই ব্যাগটা—রাস্তার দিকে তাকিয়ে বিড়ি টানছে সে, কেমন? এই মনে কর আমিও যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে, হঠাৎ বংশীকে দেখে মনে হল যে বেশ মালদার সে, তখন আমি এমনি করে এগিয়ে যাব, এমনি করে টক্কর খাব, আর সেই অবসরে আমার হাতটা—ভালো করে দেখ্"—

গভীর সাগ্রহে লোকটির হাতের দিকে তাকিয়ে পল্টু ও বীরু বলল, "দেখছি—সর্দ্দার"—

লোকটি হেসে বলল, "হুঁ—তোরা আমার উপযুক্ত সাগ্রেদ হবি বলেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা—এবার দেখ্"—

একটু পরেই আকাশের বুক কাঁপিয়ে লোহার রোলারের মত মেঘের ডাক গড়িয়ে যেতে লাগল, মেঘে মেঘে অবলুপ্ত আকাশের কালো যবনিকাকে ছিন্নভিন্ন করে বিদ্যুতের আগুন জ্বলে উঠতে লাগল আর এমনিভাবে কিছুক্ষণ কাটবার পর বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। দুপুরের পর বৃষ্টি থেমেছিল, আবার আরম্ভ হল এখন। একটানা বর্ষণের শব্দের মধ্যে ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ মিলিয়ে গেল, তার কাঁটা ঘুরে চলল। ছোট্ট, সংকীর্ণ গলির মাঝে লোক চলাচল থেমে গেল, গ্যাসের আলোটা ম্লানভাবে একা জ্বলতে লাগল আর বৃষ্টির জল ছোট্ট ঝরণার মত কল্‌কল্ শব্দে দু'পাশের বাড়ীর নোনাধরা দেয়ালের পাশে সঞ্চিত ছাই আর তরকারীর খোসাকে ধুয়ে মুছে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ক্রমে রাত হল। পাড়াটা নিঃশব্দ হয়ে গেল। কেবল আকাশের বাঁধ ভেঙ্গে অজস্র ধারায় জল পড়তে লাগল ঝম্‌ঝম্ করে, ছাদের নালি দিয়ে, পাইপ থেকে, স্ফীত

ধারায় গলির ওপর আছ্ড়ে পড়তে লাগল তা। আরো রাত হল। ঘরের ভেতর সর্দ্দার, বঙ্কু, বেচু, জগু, কানাই আর ফণি ঘুমিয়ে পড়ল। কেবল জেগে রইল বংশী, বীরু আর পল্টু।

ঘরের ভেতর ভাঙ্গা জাপানী দেয়াল ঘড়িটায় ঢং ঢং আওয়াজ হল। ক'টা? কান পাতল সবাই। বারোটা। মধ্যরাত্রির ঘোষণা জানিয়ে আবার ঘড়িটা থেমে গেল।

বংশী বীরুকে ঠেলা দিল, ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "জেগে আছিস্ তো?"

বীরু সাড়া দিল, "হ্যাঁ"—

"আর পল্টু?"

পল্টু, বলল, "আছি"—

"এবার যাবি তোরা?"

বীরু বলল, "হ্যাঁ"—

"কিন্তু বেজায় বিষ্টি পড়ছে যে!"

"পড়ুক গে—তবু যাব।"

পল্টু প্রশ্ন করল, "নীচের দরজা খোলা আছে তো?"

বংশী বলল, "হ্যাঁ। তাহলে এবার তোরা ওঠ্—চুপচাপ দরজা খুলে বেরিয়ে যা"—

বীরু উঠে বসল, বলল, "আমি আগে যাচ্ছি—দরজা খুললে পল্টু আসিস্, কেমন?"

পল্টু মাথা নাড়ল।

ঘরের এক কোণে হ্যারিকেনটা কমানো ছিল, কোনো অসুবিধা হল না। তবু উঠবার আগে বারকয়েক কাশল বীরু। কেউ জেগে নেই তো? না, সবাই ঘুমিয়ে আছে। নিঃশ্বাসের ওঠা নামার

সঙ্গে সঙ্গে হিরু সর্দ্দারের মোটা গোঁফজোড়া থরথর করে কাঁপছে। সব ঠিক আছে।

বীরু উঠল, বেড়ালের মত পা টিপে টিপে এগোল দরজার দিকে। বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল তার। আর একটু—তারপরে দরজাটা খুলতে পারলেই, ব্যস্। এই নরক থেকে মুক্তি পাবে তারা।

দরজার হুড়কোটা একটু আঁট হয়ে বন্ধ ছিল। সেটাকে জোরে টানতে গিয়েই একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটল, হঠাৎ আল্‌গা হয়ে পেছনে গিয়ে তা ধাক্কা খেল এবং বেজায় জোর শব্দ হল।

"কে?—এঁ্যা—কে?" সর্দ্দারের ঘুম ভেঙ্গে গেল, নিদ্রাজড়িত চোখের ঝাপ্‌সা দৃষ্টি মেলে সে সচকিত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল।

বীরু একেবারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সেরেছে! আর আর রক্ষে নেই—এবার চিরকালের জন্য তাকে এই দলে বন্দী হয়ে থাকতে হবে—চিরকাল—

"কে? কে ওখানে?" সর্দ্দার আবার প্রশ্ন করল।

হঠাৎ বংশী এবার ধড়মড় করে উঠে বসল, নিজের আশেপাশে তাকিয়ে দ্রুতকণ্ঠে বলল, "বীরু! বীরু কৈ—এঁ্যা?" সে দু'চোখ কচ্‌লে উঠে বসল, তাকাল দরজার দিকে, অস্ফুট শব্দ করে বলল, "দেখেছ, ঘুমের ঘোরেই দরজা খুলতে গেছে—ইস্!" বলেই সে তাড়াতাড়ি এগোল।

"কি বলছিস্ তুই বংশী? ও ছোঁড়া ওখানে কেন রে? ওকি পালাবার ফিকিরে আছে নাকি?"

পল্টু বিছানায় শুয়ে তখন ঘামছে। বীরু নিরাশা আর দুঃখে মূর্চ্ছা গেল বলে। ইস্, সে-ই মাটি করল সব।

বংশী বলল, "ব্যাপার কি জানেন ? বীরু ছোঁড়া আমায় ঘুমোবার আগে বলেছিল যে ঘুমের ঘোরে প্রায়ই ও হেঁটে ঘর থেকে বেরোবার চেষ্টা করে—এটা নাকি ওর একটা রোগ—আমায় ও একটু নজর রাখতে বলেছিল। ঘুমটা আমার গাঢ় হয়েছিল বলে টের পাইনি—যাক্, ভাগ্যিস্ আপনি চেঁচিয়েছিলেন"—

"ওঃ—তাই। হ্যাঁ—এ রকম রোগের কথা আমি শুনেছি বটে।"

বীরু শুনেই চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। উঃ, বংশী আজ খুব বাঁচাল, চমৎকার ছেলেটা।

বংশী গিয়ে তাকে ঝাঁকুনী দিয়ে ডাকল, "এই বীরু—বীরু"—

যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠছে বীরু এমনিভাবে চোখ মেলে সাড়া দিল—"এ্যাঁ ? কে ? কি—কি হয়েছে ?"

"কি আবার হবে, ঘুমের ঘোরে যে উঠে এসেছিস্"—

"ওঃ"—চারদিকে অবাক হয়ে যেন তাকাল বীরু, তারপরে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সর্দ্দার ঘুমন্ত গলায় একটু হাসল, "বেড়ে রোগ বাবা—হুঃ—ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। বাদ্লার রাত, বেশ ঘুম এসেছিল, অথচ—ওরে বংশী, চেপে ধরে থাকিস বাবা, নইলে মারা পড়লে দায়ী হবে কে ?"

"আচ্ছা—ধরে থাকব।" বংশী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে রইল সবাই। বাইরে তখন অশ্রান্তভাবে বৃষ্টি পড়ছে, একটানা শব্দ তুলে। মাঝরাতের গাঢ় ঘুম সহরের চোখে। ঘরের ভেতরও আবার স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল।

সর্দ্দারের ঘুমও বেশ জমে এল, তার পরিপুষ্ট গোঁফ জোড়া আবার নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফড়ফড় করে উড়তে লাগল।

"এবার ?" বীরু বংশীর গায়ে ঠেলা দিল।

"হ্যাঁ—এবার যা তোরা"—বংশী বলল।

"দরজা খোলাই পড়ে থাকবে ?" পল্টু প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, তা নইলে তো আমাকেই ধরবে রে"—

"আচ্ছা, তাহলে আমরা আসি বংশীদা"—বীরু বলল।

"আয়—বাড়ী পৌছে আমাকে একটা চিঠি লিখিস তোরা। ৯এ হৃদয় পণ্ডিত লেন—এই ঠিকানায়, বুঝলি ?"

"আচ্ছা"—

আবার কয়েকবার কেশে যাচাই করে নিল বীরু—সর্দ্দার জেগে আছে কিনা। ভয়ের কিছু নেই উপলব্ধি করে ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে বেরোল তখন। খুব সন্তর্পণে আবার দরজাটা খুলে ফেলল, বাইরে বেরোল। পেছন পেছন এল পল্টু। তারপরে বাইরের দরজাটা খুলে জলে ডোবা গলির মধ্যে। ব্যস্। মুক্তি। বৃষ্টি পড়ছে, মাথার ওপরকার মেঘান্ধকার আকাশে লোহার রোলারের মত মেঘের ডাক গড়িয়ে যাচ্ছে। সাপের জিভের মত লক্‌লকে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে, দিগন্ত পর্য্যন্ত লেহন করে নিচ্ছে। অপরিচিত মহানগরীর বুকে, মাঝরাতে, ঝড় বাদ্‌লার মাঝে, ভিজে একসা হয়ে, আব্‌ছা আলোকিত গলির মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে গাটা ছম্‌ছম্ করে, বিশ্রী লাগে। কিন্তু উপায় কি ? পকেটমারদের দলে থেকে মানুষের পকেট মেরে, চুরী করে বেঁচে থাকার চেয়ে এই মুক্তি ঢের ভালো। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল দুই বন্ধু। যেন একটা দুর্দ্দান্ত দৈত্যের প্রস্তর-দুর্গ থেকে অতি কষ্টে পালিয়ে এসেছে তারা। আঃ—

তারা বেঁচেছে, তারা মুক্তি পেয়েছে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবার পথে আবার পা দিয়েছে।

ছয়

সারারাত বৃষ্টি পড়ে ভোরের দিকে থামল একটু। সারারাত ওরা একটা বাড়ীর বারান্দায় বসে কাটিয়েছিল, জলে, শীতে কাঁপুনী ধরে গিয়েছিল তাদের। কিন্তু উপায় কি আর? ভোর হতে একটা দোকানে গিয়ে গরম চা খেল দু'জনে, কিছু খাবার খেল। গতকাল বিকেলে ভিক্ষে করে পাওয়া চোদ্দ আনা এক পয়সা থেকে আট আনা খরচ করে বাকী পয়সা তারা হাতে রাখল। তারপরে আর একদফা ভ্রমণ-পর্ব্ব শুরু হল তাদের।

কলকাতায় এসে ঐশ্বর্য্য আর আনন্দ, আলো আর হাসির সমারোহ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল বীরু। তা দেখে নিজের দারিদ্র্য সম্বন্ধে আরো সচেতন হয়ে উঠেছিল সে, তীক্ষ্ণ একটা সূচীমুখ বেদনা অনুভব করছিল।

উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল দু'জন। এমনি ঘুরতে ঘুরতে ওরা হঠাৎ একটা গরীবদের বস্তীর সামনে গিয়ে হাজির হল। বড় বড় অট্টালিকার আড়ালে ছিল বলে তা সদর রাস্তা থেকে দেখা যায়নি, তার সীমানায় পৌঁছে তারা অবাক হয়ে গেল। হঠাৎ বীরু আবিষ্কার করল যে কলকাতাটা একটা সাজানো গোছানো ব্যাপার, মলম দিয়ে ঘা ঢেকে রাখার মত বড় বড় বাড়ী আর বাঁধানো সড়ক দিয়ে ধনীরা গরীবদের আড়াল করে রেখেছে। অথচ ওরা আছে—এই অভ্রভেদী অট্টালিকাশ্রেণী আর ঐশ্বর্য্যের মিছিলের পেছনে ওরা আছে, হাজার হাজার গরীব দুঃখী তাদের অনন্ত দুঃখের পাহাড়-প্রমাণ বোঝা নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তাহলে? সর্ব্বত্র সেই একই ইতিহাস।

"পল্টু"—

"উঁ ?"

"এখানেও গরীব আছে রে"—

"থাকবেই তো, ওরা না থাকলে বড়লোকদের চিনবে কে ?"

"দূর—ইয়ে"—

দুপুর হয়ে এল। চারপয়সার মুড়ি কিনে ওরা একটা পার্কে গিয়ে বসল। পামগাছের ছায়া ভারী ঠাণ্ডা আর সামনের পুকুরে ছেলেরা চান করছে, সাঁতার কাটছে। জলের মধ্যে নানাভঙ্গী করে লাফা-লাফি করছে। সকাল থেকে বৃষ্টি আর পড়েনি কিন্তু আবার তা আসন্ন বলে মনে হচ্ছে। একটা পীড়াদায়ক ও শ্বাসরোধকারী গুমটের ভাব বাতাসে থমথম করছে। তেলতেলে ঘামে জামা কাপড় ভিজে যাচ্ছে।

তারপরে আবার এগিয়ে চল, হাটো।

তারের গায়ে বিদ্যুতের আগুন জ্বলিয়ে ট্রাম চলে। বাস চলে। তীরের মত পাশ দিয়ে যায় মোটর আর ট্যাক্সি। সুন্দর, সুখী মানুষেরা তাকায় তার ভেতর থেকে। তাকায় পাচতলা বাড়ীরা ওপর থেকে।

সিনেমা হাউস আর থিয়েটার, সুসজ্জিত হোটেল আর রেষ্টুরেণ্ট। ধনী এবং সুখী মানুষদের কোলাহল ও হাসি ভেসে আসে।

এমনিভাবে চলতে চলতে একটা চায়ের দোকানের পাশে গিয়ে তারা আটকে পড়ল। একটা বিরাট কোলাহল ভেসে এল রাস্তার পূর্ব্ব-প্রান্ত থেকে।

"বন্দে মাতরম্"—

"ইনকিলাব জিন্দাবাদ"—

বীরু উত্তেজিতকণ্ঠে বলল, "দেখ্ পল্টু—মিছিল !"

"হাঁ, তাইতো রে"—

"কি বলছে ওরা—কি চাইছে?"

"কি আবার—স্বাধীনতা। তা পেলেই তো আমাদের দুঃখ দূর হবে"—

"হুঁ"—

বীরুর শরীরটা হঠাৎ যেন গরম হয়ে উঠল, টগ'বগ করতে লাগাল তার রক্তস্রোত। পেটে মুড়ি ছাড়া আজ আর বিশেষ কিছুই পড়েনি, তবু দুর্ব্বল মনে হল না, উত্তেজনায় দেহ কঠিন হয়ে উঠল।

মিছিলটা ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগল, ক্রমে কাছে এল তা। হাজার হাজার লোকের মিছিল। তার মধ্যে অধিকাংশই যুবক, ছাত্র। সবিস্ময়ে বীরু দেখল যে তার মত, তার চেয়েও অল্পবয়স্ক অনেক ছেলেই আছে তাতে। তাদের অনেকেরই হাতে ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা। আর তারা চীৎকার করছে। পায়ের নীচেকার মাটি যেন থরথর করে কাঁপছে তাদের উত্তেজিত, দৃপ্ত পদক্ষেপে, তাদের পাহাড়-কাঁপানো সম্মিলিত কণ্ঠের ধ্বনিতে যেন আকাশ পর্য্যন্ত চমকে উঠছে, মাথার ওপরকার সূর্য্য জ্বলছে তাদের চোখে।

"বন্দে মাতরম্"—

"সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক্"—

"ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ"—

হঠাৎ রাস্তার পশ্চিমদিক থেকে সবেগে ছুটে এল কয়েকটা পুলিশ ভ্যান ও ট্রাক, জিপ্ ও মোটরগাড়ী, তা থেকে লাফ দিয়ে নামল বহু রাইফেলধারা পুলিস। তারা মুহূর্ত্তে একটা লাইন করে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল। একজন হোম্‌ড়া চোমড়া অফিসার-মত লোক কয়েকজন পুলিস নিয়ে মিছিলের মুখোমুখী

গিয়ে দাঁড়াল। তাদের দেখে জনতা যেন ক্ষেপে গেল, কোলাহলটা বেড়ে গেল।

কৌতূহলী ও নিষ্ক্রিয় দর্শকেরা কানাকাণি করে বলতে লাগল, "ব্যাপার সুবিধের নয়"—

"হাঁ, গুলি চলবে"—

"সরে পড়ো বাবা—সরে পড়ো"—

অনেকে পালিয়েও গেল।

কিন্তু বীরু আর পল্টু নড়ল না সেখান থেকে। ওরা যেন জীবনে আজই প্রথম হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ো দেখল, ওরা যেন আজই একটা বিক্ষুব্ধ নীল সমুদ্রকে দেখল। সম্মোহিতের মত ওরা তাকিয়ে রইল, দেখতে লাগল কি হয়।

দেখা গেল যে সেই হোমড়া চোমড়া অফিসারটি গর্জ্জন করে কি সব বলছে। মিছিলের সম্মুখভাগে অবস্থিত কয়েকটি লোকও যেন প্রত্যুত্তরে কি সব বলল। তখন অফিসারটি পিছিয়ে পড়ল, মিছিলটা বাঁধভাঙ্গা জলের মত সবেগে সামনের দিকে ছুটে এল।

অফিসারটির গর্জ্জন শোনা গেল, "ফা-য়া-র"—

গর্জ্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল। চার পাঁচজন লোক রাস্তার পড়ে গেল, লাল রক্তের ধারায় তাদের জামাকাপড়কে ভিজে উঠতে দেখল বীরুরা।

ফুটপাথে দণ্ডায়মান লোকেরা পালাতে আরম্ভ করল।

"পালাও—পালাও"—

"গুলি করছে"—

"মানুষ মরেছে"—

"ইস—কত রক্ত!"

পল্টু হাত ধরে টান দিল, "চল্ বীরু"—

বীরু মাথা নাড়ল, "না"—তার শরীর যেন তখন লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছে।

সে দেখল যে দর্শকেরা পালাচ্ছে বটে কিন্তু যাদের ওপর গুলি চলছে তারা পালাচ্ছে না। কোথা থেকে যেন সিংহের সাহস বুকে দুর্জয় হয়ে উঠেছে, ওদের চোখে ধ্বক ধ্বক্ করছে মধ্যাহ্ন-সূর্যের জ্বালা, ওদেয় ললাটে দেখা দিয়েছে কঠিন শপথ। যারা গুলি খেয়ে পড়ে গেল তাদের জায়গায় আবার অন্য লোক এসে দাঁড়ালো, রক্তবীজের মতই যেন ওরা ধ্বংসহীন। বীরু দেখল যে একজন ছোক্‌রা—তার থেকে বড়জোর তিন চার বছরের বড় হবে—গুলি খেয়েও তার হাতের পতাকাটিকে ফেলে দিল না বরং আরো দৃঢ়করে সেটাকে চেপে ধরল, খাড়া রাখবার চেষ্টা করল।

"চল্ বীরু—চল্"—

"না।"

"তবে আয় একটু পিছিয়ে—"পল্টু বীরুকে হিড়হিড় করে একেবারে চায়ের দোকানটার দরজার সামনে নিয়ে গেল।

তাদের পেছনে হাফ-প্যাণ্ট, পরিহিত একটি ছোকরা দাঁড়িয়েছিল, বীরুর বয়সীই মনে হল তাকে। বোধ হয় সে চায়ের দোকানের বয়।

সেই ছেলেটি যেন নিজের মনেই বলল, "কুত্তার বাচ্চা—ওরা সব কুত্তার বাচ্চা"—

বীরু তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, "ঠিক—ঠিক বলেছ"—

মিছিল একটুও নড়েনি তখন। সমানে সেই সব নিরস্ত্র যোদ্ধারা তখনো চীৎকার করছে—'বন্দে মাতরম্'—'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক'—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'।

"ফা—য়া—র"—

আবার আওয়াজ হল। গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম...

হঠাৎ বীরুর পেছনকার সেই ছেলেটি দৌড়ে গেল, তার হাতে একটা সোডার বোতল। সেটাকে সবেগে ছুঁড়ে মারল সেই আদেশকারী অফিসারটির দিকে।

বীরু আর পল্টু তখন উত্তেজনায় কাঁপছে।

অফিসারটির পিঠে গিয়ে লাগল বোতলটা, ধপ্ করে একটা শব্দ হল তারপর সেটা রাস্তায় পড়ে ভেঙ্গে ছড়িয়ে গেল। অস্ফুট যন্ত্রণার শব্দ করে অফিসারটি রিভলবার হাতে ঘুরে দাড়াল। কিন্তু ততক্ষণে বিদ্যুতের মত সেই ছেলেটি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম—

এবার গুলির লক্ষ্য ফুটপাথের দিকটা।

"পালাও—পালাও"—

"বাপ্! গেলাম্"—

"বন্দেমাতরম্"—

"ইনকিলাব"—

হঠাৎ পল্টু বীরুর হাত ধরে হেঁচ্কা টান দিল, "চল্ শিগীর—নইলে মেরে ফেলব তোকে"—

"না"—বীরু যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। মিছিলের লোকদের অদ্ভুত সাহস, সেই ছেলেটির আশ্চর্য্য কাণ্ড তাকে যেন এই বিচিত্র, মহান সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। মৃত্যু? কি যায় আসে? মরলেই কি মানুষ মরে?

কিন্তু পল্টু শুনল না, পাগলের মত সে তাকে প্রায় শূন্যে তুলেই একটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গেল।

বীরু বলল, "না—আমায় দেখতে দে ভাই—দোহাই"—

"না, কোনো দরকার নেই। কি লাভ? আগে তৈরী হ'—তারপর"—

কথাটা এমনি বলতে হয় বলেই সে বলল, আসলে তার অবস্থাও প্রায় বীরুর মতই। কিন্তু তবু একটু দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল সে, হঠাৎ এই ঘর-পালানো বিবাগী ছেলেটার মানসচক্ষে তার বাড়ীর কথা ভেসে উঠেছিল, মনে পড়েছিল নিজের ও বীরুর মা বাবাকে, বুকটা ফুলে উঠেছিল। বিশেষ করে বীরুর রকম দেখে সে একটু ঘাবড়ে গেল। যদি একটা কিছু হয় তাহলে বীরুর মা বাপতো চিরকাল বলবে যে পল্টুর জন্যই বীরু গেছে।

"চল্—এখানে দাঁড়িয়ে আর কাজ নেই"—

"পালাও—পালাও—টিয়ার গ্যাস ছেড়েছে"—লোকজনেরা হৈহৈ করতে করতে সেদিকেই আসছে দেখে পল্টু আর বীরু এগিয়ে চলল দ্রুতপদে।

খানিকক্ষণ পরে তারা যখন একটা নিরাপদ এলাকায় গিয়ে পৌছোল, তখন তাদের ধমনীতে প্রশান্তি ফিরে এল, আবার সুস্থ হল তারা।

চুপচাপ চলতে লাগল দুজনে।

ক্ষীণ গুলির শব্দ আবার ভেসে এল, বীরু চম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল একবার, চোয়ালটা শক্ত করে ছলছলে চোখ মেলে সে একবার তাকাল বন্ধুর দিকে তারপর আবার চলতে আরম্ভ করল। কোনো কথা বলল না দুজনে অনেকক্ষণ। কি-ইবা বলবে? মাথার মধ্যে মিছিলটার কথা তখনো ঘুরছে, চোখের সামনে তখনো ভাসছে রক্ত আর সেই ছেলেটার কথা। যুদ্ধ। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করার রীতি তবে এই! স্বাধীনতার জন্য, ন্যায় ও সত্যের জন্য তবে এমনিভাবে লড়াই করতে হয়।

দরকার হলে প্রাণও দিতে হয়! এমনিভাবে লড়াই করেই তাহলে দেশকে স্বাধীন করতে হবে আর দেশকে স্বাধীন করলেই গরীবের দুঃখ দূর করা যাবে! বীরুর মাথায় নানা ভাব্না টগবগ করতে থাকে। কথা খুঁজে পায় না, তা বলতে ইচ্ছেও করেনা তার।

"বীরু"—পল্টু ডাকল।

"হুঁ"—

"বাড়ীর কথা মনে পড়ছে, না?"

"বাড়ী!" থেমে গেল বীরু। এই কলকাতা। চারদিকের এইসব বড় বড় বাড়ী আর জনতা সব অদৃশ্য হয়ে গেল। কাঞ্চনপুরের হাট মাঠ ঘাট তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। বিন্নাঘাস আর খড়ের ছাউনী দেওয়া তাদের ছোট্ট বাড়ীটা, তার কর্ম্মব্যস্ত মা, শাস্ত্রাধ্যয়ন-রত বাবা আর পুকুর থেকে জলাহরণ-রতা দিদিকে সে যেন পরিষ্কার দেখতে পেল। হঠাৎ পায়ে কাঁটা বিঁধলে যেমন সারা দেহমন যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায় তেমনিভাবে কাতর হয়ে পড়ল বীরু। সত্য। কি দোষ করেছে বাপ মা? কেন সে পালিয়ে এল? আসলে দোষ তো তাদের ছিল। আজ এই মিছিল দেখে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে দেখে কেমন যেন একটা বিচিত্র আবেগ তার বুকের ভেতর বন্যার জলের মত ফুলে উঠল। উপযুক্ত হতে হবে, বড় হতে হবে, দেশ ও দেশের গরীব লোকদের জন্য একটা এমন কিছু করতে হবে যে সবাই বলে, হ্যাঁ, বীরু একটা ছেলে বটে।

"বীরু" ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল পল্টু—"বাড়ীর জন্য খুব খারাপ লাগছে, না?"

বীরু ধীরে ধীরে একবার মাথা নাড়ল, মৃদুকণ্ঠে বলল, "বাড়ী! তা—না—হুঁ"—

আবার চুপচাপ চলতে লাগল তারা। হঠাৎ দুজনেরি বাড়ী ফিরে যাবার ইচ্ছে হল, প্রতিমুহূর্ত্তেই তা যেন ম্যালেরিয়া জ্বরের মত বাড়ছে কিন্তু কেউ কাউকে বলতে সাহস পায় না, লজ্জা বোধ হয়। বাড়ী থেকে বড়াই করে পালিয়ে এসে কি কেউ আবার বাড়ী ফেরার ইচ্ছে দেখাতে পারে? যে পল্টু পলাতক অবস্থায় আটদশ দিন পর্য্যন্ত বাইরে থাকত, সে আজ দু'দিনবাদেই হঠাৎ একমুহূর্ত্তে বাড়ীর জন্য উতলা হয়ে উঠল। কিন্তু কে আগে বলবে?

এমনিভাবে আরো কয়েক মিনিট কাটল।

হঠাৎ বীরুই ডাকল, "পল্টু"—

পল্টুও ডাকল "বীরু"—

বীরু বিড়বিড় করল, "আজই বাড়ী চল্ পল্টু"—

পল্টু তার নেপালীদের মত ছোট ছোট চোখ দুটোকে প্রায় বুজিয়ে সহাস্যে বলল, "আজ নয় রে গাধা—এখ্খুনি"—

হু হু করে চলছিল ট্রেণটা। হাওয়াই তীরের মত সাঁ সাঁ করে, বাতাস কেটে।

কিন্তু সময় যেন হঠাৎ ভারী হয়ে গেছে, মন্থর হয়ে গেছে। বীরুর মনে হল যে শুধু ট্রেণটাই চলছে কিন্তু সময় থেমে গেছে। এক মুহূর্ত্তেই বাড়ী পৌছোবার জন্য তার মনটা কেমন যেন আকুলি বিকুলি করতে লাগল। যাক্, তবু মন্দের ভালো, ট্রেণে তো চড়েছে তারা, রাতের বেলা গিয়ে নামবেই পঞ্চাননপুরে।

কি করে শেয়ালদায় ঢুকে তারা ট্রেণে চড়ল সে কথা বলে লাভ নেই।

পল্টুর সে বিদ্যে জানা আছে। চড়েই সটান তারা বেঞ্চির নীচে ঢুকে পড়ল। যাদের পাগুলো তাদের মাথার কাছাকাছি ঝুলছিল তারা একজন বুড়ো মত ভদ্রলোক আর তার নাতি। নাতিটির বয়েস তেরো চোদ্দ বছর হবে, তার নাকটা বোঁচা, মুখে বসন্তের দাগ, দাঁতগুলো পোকায় খাওয়া। ছেলেটিকে বীরুর ভালো লাগেনি। মাঝে মাঝে ছেলেটা ইচ্ছে করে ভেতর দিকে পা ঠুকে দিচ্ছিল।

পল্টু একবার চটে উঠল, বলল, "দেব নাকি শুয়ারটার পা কামড়ে?"

"ধ্যেৎ"—

একটু চুপ করে থেকে পল্টু আস্তে আস্তে বলল, "ইস্, ভারী খিদে পেয়েছে মাইরি"—

"হুঁ"—বলে বীরু চুপ করে রইল। সান্ত্বনা দেবার মত কী-ই বা আছে—তার অবস্থাও তো সমান।

হঠাৎ কাম্‌রার ভেতর একটা গলা শোনা গেল, "আপনার টিকিট দেখি"—

বীরু পল্টুকে সভয়ে ঠেলা দিল, "টিকিট-চেকার!"—

"চুপ্!"

নিঃসাড় হয়ে, গুটি সুটি হয়ে রইল তারা। কিন্তু সেই টিকিট-চেকারের গলা আর পায়ের আওয়াজ শেষে এসে তাদের কাছাকাছিই থামল।

"টিকিট দেখি"—

"এই যে"—বুড়ো মত লোকটির গলা শোনা গেল। তার সঙ্গে সঙ্গেই আবার নাতি ছোকরার গলাও শুনতে পেল বীরুরা, সে বলল, "জানেন টিকিট-চেকার মশাই"—

"কি?" টিকিট চেকারকে বলতে শোনা গেল।

সেই ছোক্‌রা ফিক্‌ করে হেসে বলল, "নীচে দেখুন"—

"কি দেখব?" বলেই টিকিট চেকার ঝুঁকে পড়ল, বেঞ্চির তলা থেকে পলটু আর বীরুর পা ধরে টেনে বের করল।

"বটে!" রক্তচক্ষু করে বলল টি, টি, আই, "এই ব্যাপার! টিকিট আছে হে কত্তারা?"

পলটু মাথা নাড়ল, "আজ্ঞে না—আমরা অনাথ বালক"—

টিকিট-চেকার হাসল, "বটে! কিন্তু রেল কোম্পানী বা আমি তো আর অনাথ বালক নই যে তোমাদের ছেড়ে দেব। যাক্‌ সে কথা, এবার টাকা বের কর"—

"টাকা তো নেই—অনাথ, বড় গরীব আমরা"—

"নেই?"

"আজ্ঞে না"—

"তবে এর পরের স্টেশনে তোমাদের ঘাড় ধরে নামাব আর কি—ছেলেমানুষ বলে আর পুলিসে দেব না"—

সেই বুড়োর নাতি ফিক্‌ করে হেসে বলল, "না না, পুলিসেই দিন না চেকার মশাই"—

বীরু অগ্নিবর্ণা দৃষ্টি মেলে তাকাল ছেলেটার দিকে তারপরে ছলছল চোখে তাকাল বন্ধুর দিকে। একি ব্যাপার হল! কি হবে এখন? যদি পুলিসে দেয় বা নামিয়ে দেয় তাহলে যে কবে বাড়ী ফিরতে পাবে কে জানে! বুকটা তার বারংবার মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগল।

পল্‌টু নির্ব্বিকার হয়ে পড়েছে। যা হবার হবে, এখন ঘাবড়ে গেলে চলবে না।

সে টিকিট চেকারকে বলল, "দয়া করে আমাদের এবারটি মাফ্‌ করে দিন না চেকারবাবু—আর এমনটি করব না।"

"থামো—থামো"—

"এতে আপনার ভালো হবে—সত্যি বলছি"—

"আমার ভালো টালোর কোনো দরকার নেই বাপু—ডেঁপোমীটা বন্ধ করো দেখি। ভদ্দরলোকের ছেলে বলেই তো মনে হচ্ছে, নইলে এক চড়ে তোমাদের মুখ ট্যাড়া করে ছেড়ে দিতাম"—

ট্রেন থামল।

"নামো হে ডবলিউ টি'রা"—

পল্টু মিনতিভরা কণ্ঠে শেষবারের মত বলল, "এবারটির মত ছেড়ে—"

"চোপ্—নামো বলছি—নামো"—টিকিট-চেকার পল্টুকে একটা ধাক্কা দিল এবার। নামতেই হল।

বীরু এক কাণ্ড করল। নামবার আগে সেই বুড়োর বদ্মায়েস নাতির পাটা সে বেশ জোরে মাড়িয়ে দিয়ে এল।

ভঁ্যা করে কেঁদে ফেলল ছেলেটা।

বুড়ো কর্ণভেদী চীৎকার করে গাল দিতে লাগল, "শয়তানের বাচ্চা, অমুকের ব্যাটা—ইচ্ছে করে পাটা মাড়িয়ে দিয়ে গেল মশাই, হ্যাঁ—ইচ্ছে করেই ছেলেটার পা খোঁড়া করে দিল"—

আর গাল দিলে কি হবে? ততক্ষণে ওরা প্ল্যাটফর্মের আর এক প্রান্তে। ট্রেণটা ছাড়ল।

যখন ট্রেনটা তাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন বীরু আর পল্টু সেই বুড়ো আর তার নাতিকে দেখতে পেল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তারা তাকিয়ে আছে।

পল্টু সঙ্গে সঙ্গে দাঁত বের করে হাসল, চোখ দুটো প্রায় বুজে সে জিভ্ বের করে বুড়ো আর নাতিকে দেখাল।

"শয়তান, হনুমান, বাঁদর"—গালিগালাজ ভেসে এল।

বীরু সঙ্গে সঙ্গে সজোরে একটা ছড়া আউড়ে উঠল, তার কবি-প্রতিভা হঠাৎ আজ অনেকদিন পর বেরিয়ে এল। হাত নেড়ে নেড়ে সে ওস্তাদ সুদাম পালের মতই আবৃত্তি করল,

"ওরে বুড়ো,
ভ্যাড়ার মুড়ো
মারব তোকে হুড়ো,
আর চোখের মাঝে
যত্ন করে,
দেব লঙ্কা-গুঁড়ো।"

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যে হয়েছে, কিন্তু ঘুটঘুট্টি অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে এই স্টেশনটার চারদিকে। অন্ধকার আকাশকে একেবারে কালির মত কালো করে তুলেছে পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন কৃষ্ণ-মেঘ। হাওয়া পড়ে গেছে, মনে হচ্ছে পৃথিবীটা যেন একটা কিছুর প্রত্যাশায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে। আর একটু গরম বোধ হচ্ছে।

স্টেশনটার নাম শ্রীনাথপুর। ছোট্ট স্টেশন, তিনচার জন মাত্র কর্ম্মচারী এখানে আছে। খোলা প্ল্যাট্‌ফর্ম্মটার একপাশে ওরা দুজনে অনেকক্ষণ বসে রইল, পরে একজন লোকের কাছে খবর নিয়ে জানল যে তাদের ট্রেন আবার সেই কাল সকালে।

"তাহলে? কি করবি?" বীরু প্রশ্ন করল।

"তাইত ভাবছি"—পল্‌টু বলল, "এদিকে ক্ষিদে যা পেয়েছে তা আর কি বলব। আর কিছুক্ষণ না খেয়ে থাকলে হয়ত কেঁদেই ফেলব ভাই"—

বীরু মাথা নাড়ল, "তা কি হয়, একটা কিছু করতেই হয়"—

পল্টু উঠে দাঁড়াল, "চল্ বীরু, গাঁয়ের ভেতরে যাওয়া যাক্"—

"কি করবি ?"

"ভিক্ষে—আবার কি ? বলব যে আমরা বালক-সন্নিসী বুঝলি ?"

"ধ্যেৎ—এই জামা কাপড় কি হবে ?"

"ঠিক হবে—জামা আর গেঞ্জী দিয়ে একটা পোঁট্‌লা হবে, ধুতিগুলোকে বৈরিগীদের মত পরে গলায় বাঁধব আর মাটি গুলে তেলক কেটে নেব"—

"আর মাথায় যে চুল রয়েছে !"

"ও কিছু না—বলব যে আমরা অনেকদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি—মাথা মুড়োবার সময় পাই না"—

বীরু হাসল, "হয়েছে, এই অচেনা গাঁয়ে শেষে মার খাবো আরকি"—

পল্টু চটে উঠল, "তবে তুই থাকগে—আমি যাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখিস্, খাবার পেলে এক কণাও দেব না—হ্যাঁ"—

"আচ্ছা বাপু—চল্"—

পল্টু যা যা বলেছিল তাই করল দুজনে, তেমনিভাবেই পোষাকটা বদ্‌লে নিল। তারপর এগোল গায়ের ভেতরে। রাস্তা কাদায় ভর্ত্তি—অচেনা গাঁয়ের অচেনা পথ। তবু চলল তারা। বাড়ীর জন্য মনটা দুর্ব্বল, তবু কেমন যেন ভালো লাগল ব্যাপারটা। চারদিকে অন্ধকার রাত, আকাশ মেঘে মেঘে অন্ধকার, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, ডাকছে কোলাব্যাঙ। বিচিত্র একটি রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে চারদিকে।

একটা বাড়ী দেখা গেল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল দুজনে।

গুরু—গুরু—গুরু—বহুদূরবর্ত্তী কামান-গর্জনের মত মেঘের ডাক ভেসে এল এবার।

"ঝড়বিষ্টি আসছে রে"—

"হুঁ—সেরেছে এবার"—

"তাড়াতাড়ি চল্"—

কিন্তু বাড়ীটাতে পৌছুবার আগেই হঠাৎ চারদিককার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস চাপা ভাবটা যেন খান খান হয়ে গেল। দিগন্তের কোন্ এক কোণ থেকে যেন বিদ্যুদ্বেগে ছুটে এল ঝড়—হা হা হা শব্দ করে। মাঝরাতে, মস্ত বড় জমিদার বাড়ীতে, 'হারে-রে-রে'—শব্দ তুলে যেন একদল ডাকাত এসে পড়ল। গাছপালার ডালে, কুড়েঘরগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে একটা অন্ধ, হিংস্র জানোয়ারের মত গর্জাতে লাগল বাতাস। ঝড় এল।

শুক্নো পাতা এসে গায়ে লাগে, ধূলো এসে চোখে পড়ে, ডাল-পালার আর্ত্তনাদ শুনে মনে হয় তা বুঝিবা মাথার ওপরেই ভেঙ্গে পড়ল।

"চল্, চল্—তাড়াতাড়ি"—

বাড়ীটার দাওয়ার সামনে গিয়ে থামল তারা। যাক্, বাঁচা গেল বাবা। কোনোমতে রাতটা কাটিয়ে ভালোয় ভালোয় বাড়ী পৌছুলে হয়।

দাওয়ার ওপর কে একজন আধাবয়সী লোক বসে ছিল, সে হেঁকে উঠল। "কে হে তোমরা ?"—

পল্টু বলল, "গোপাল গোবিন্দ বল বাবা—রাধেমাধব বল"—

লোকটি বলল, "থামো, রাতবিরেত কেষ্টনাম শোনাতে এসেছে। বলি, কে তোমরা ?"—

"আমরা সাধু বাবা"—

"সাধু না হাতী—"লোকটি উঠে দাঁড়াল, কাছে এগিয়ে এসে তীক্ষ্নদৃষ্টি মেলে বলল, "হয়েছে—সাধু না ইয়ে, যা যা এখান থেকে"—

পল্টু গম্ভীরভাবে বলল, "রাগ করছ কেন বাবা—আমরা বৃন্দাবনের বালক-সন্নিসী বাবা—ভর সন্ধ্যেতে ফিরিয়ে দিও না"—

"কে রে?" ভেতর থেকে একজন মেয়েলোকের গলা শোনা গেল, "কে?"

সঙ্গে সঙ্গে একজন বুড়ী বাইরে এসে দাঁড়াল, তাকাল বৃন্দাবনের সাধুদের দিকে।

"গোপাল গোবিন্দ বল বুড়ীমা—হরে কৃষ্ণ বল"—

বুড়ী হাত জোড় করে কপালে ছোঁয়াল।

"না না মা—চোর ছ্যাচোড় হবে, বুঝলে না?" সেই লোকটি উত্তপ্ত কণ্ঠে বলল।

পল্টু জিভ্ কেটে কানে হাত দিল, "ছিঃ—অমন কথা বলোনা বাবা, অপরাধ হয়। আমরা বৃন্দাবনের বালক-সন্নিসী, ঝড় বাদলায় আশ্রয় চাইছি—ফিরিয়ে দিয়ে অকল্যাণ করো না"—

"হয়েছে হয়েছে রে ডেঁপো"—

বুড়ী ধমক দিল, "থাম্ তুই জগা, তুই চুপ কর দিকিনি। সত্যি তো, সন্ধ্যেবেলা এসে আশ্রয় চাইছে, বালক-সন্নিসী—গোপালের জাত, আমি ওদের ফিরিয়ে দিয়ে কি শেষে নরকে ডুবব! এসো বাবারা, বোসো এখানে, থাকো আজ রাতটা"—

পল্টু হাত নেড়ে বলল, "তোমার কল্যাণ হোক বুড়ীমা—মঙ্গল হোক"—

ওরা দাওয়ায় উঠে বসল। সেই লোকটা মায়ের ওপর সর্দারী করতে সাহস পেল না, গজরাতে গজরাতে ভেতরে চলে গেল।

বুড়ী বলল, "দাঁড়াও বাবা, কিছু মুড়ি এনে দি, খাও চাট্টি। বেন্দাবনের সাধু বলছ, সাঁঝবেলাতে এয়েছ, রাতের বেলা একমুঠ না দিলে কি গিলতে পারব ? অপরাধ হবে যে—পরে চাট্টি অন্ন ভোগও খেয়ো"—

পল্টু বলল, "বুড়ীমা তোমার একশো বছর পরমায়ু হোক্"—

বুড়ী আঁৎকে উঠল, "তোমার মুখে আগুন সন্নিসী—আমার পেন্নমায়ুতে দরকার নেই—তা নিয়ে তোমরা বেঁচে থাকো, সবার উপগার করো"—

মুড়ি খেয়ে ওরা যেন বাঁচল। আঃ।

হাহা হাওয়া বইছে। পাগলের মত। গুরু গুরু ডাকছে মেঘ। আকাশের কোথায় যেন একটা বিরাট প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়ছে।

এরি মাঝে হঠাৎ বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। চড় বড় চড় বড় শব্দে, বড় বড় ফোঁটায়। যেন ঝোড়ো হাওয়ায় গা মিশিয়ে, হাজার হাজার অদৃশ্য ঘোড়সোয়ার ঐ অনেক দূরের মাঠটা দিয়ে একটা অজানা রাজ্য জয় করতে যাচ্ছে। আর কড়্-কড়্—কড়াৎ শব্দে আকাশটা যেন ফেটে গেল, সেই আঁকাবাঁকা ফাটলের মাঝখান দিয়ে যেন দেখা গেল তার ও পিঠের একটা প্রাসাদের আলো। বিদ্যুৎ চমকাল। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধে হঠাৎ বুকের ভেতরটা যেন বেদনায় টনটন করে উঠল ওদের।

বাড়ীর সেই বুড়ী এসে কাছে বসল। মা দুর্গা বুড়ী হলে যেমন দেখাবে তেমনি দেখতে এই বুড়ী মা। বিধবা মানুষ এই যা—স্নেহ মায়া, মমতা দিয়ে গড়া তার দেহটি।

বুড়ী হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বাবারা, একটা কথা বলবে ?"

পল্টু মাথা নাড়ল, "বলব"—

"তোমরা কি সত্যি বেন্দাবনের সন্নিসী? সত্যি কথা বলবে কিন্তু"—

বীরুর ভেতরটা শুকিয়ে গেল। সেরেছে, আবার কিছু গণ্ডগোল না হয়।

পল্টু বীরুর দিকে তাকাল, বীরুও তাকাল তার দিকে। বুদ্ধি জোগাচ্ছে না। অন্য কেউ হলে হয়ত সরাসরি মিথ্যে কথা বলত তারা। কিন্তু বুড়ী মা দুর্গার মত মমতাময়ী এই বুড়ীর মুখের ওপর তারা কি করে মিথ্যে বলে?

পল্টু মাথা নাড়ল, "না বুড়ী মা"—

"মানে?"

"আমরা সন্নিসী নয়—বৃন্দাবনের ও নই"—

"তবে তোমাদের মা বাপ আছে?"

"আছে"—

একে একে বুড়ী সব কথা আদায় করে নিল তাদের কাছ থেকে। সব শুনে সে তাদের বুকের কাছে টেনে নিল, হেসে বলল, "তোরা তো আচ্ছা ক্ষ্যাপা ভাই—এ্যাঁ! আর কি দুষ্টু—মাগো"—

ভেতরে জায়গা নেই। বাইরে মাদুর বিছিয়ে দিল বুড়ী, ভাত খাইয়ে তাদের শুতে বলল।

সারারাত ধরে বৃষ্টি চলল। বাতাস বন্ধ হয়ে এল, শুধু নিরবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির শব্দ শোনা যেতে লাগল। মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা ছন্দোময় শব্দের ঝঙ্কারে গমগম করছে।

বীরুর ঘুম এলো না। মাঝে মাঝে খালি কান্না পেতে লাগল তার। মা, বাবা, দিদি—পৃথিবীতে আর কারা আছেন তাঁদের মত যাঁরা বীরুকে ভালোবাসে? আজ এখানে ঝোড়ো হাওয়া, একটানা বৃষ্টি।

কাঞ্চনপুরেও হয়ত তাই। তার চোখে ঘুম নেই আজ—তার মা, বাবা আর দিদি ও কি জেগে নেই ?

ভোর বেলায় গাড়ী। বুড়ী তা শুনেছিল। শেষরাতে উঠে সে দু'বন্ধুকে ডেকে তুলল।

"ও ভাইরা—ও আমার সোনাভাইয়েরা, ওঠো মানিক"—

ধড়মড় করে ওরা উঠে বসল।

বীরু আধো তন্দ্রাঘোরে বলল—"মা"—

বুড়ী সস্নেহে বলল, "আমি তোর বুড়ী মারে"—

যেন কতজন্মের চেনা লোক! মায়ের ছবির সঙ্গে এই বুড়ীমায়ের ছবিটিও আজ এই ভোরবেলার আলো আঁধারিতে মনের মাঝে জমা হয়ে গেল।

বুড়ী মুড়ি মুড়কি খেতে দিল ওদের, জল খাওয়াল, তারপর ওদের কাপড়ের খুঁটে চিড়ে গুড় বেঁধে দিল। তখন বৃষ্টি থামেনি, তবে ঝিরঝির করে পড়ছে।

যাবার সময় বুড়ী ওদের চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেল, মৃদু হেসে বলল, "বেঁচে থাকিস মাণিকেরা। আর শোন্, এবার আর পালিয়ে নয়, মা বাবার মত নিয়ে আসছে পূজোয় তোদের বুড়ীমার এখেনে বেড়িয়ে যাস্—কেমন ? আসবি কিন্তু—কেমন ?"

ওরা কথা বলতে পারল না, ছলছলে চোখ দুটো তুলে শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

কুয়াসার মত হাল্‌কা, ঝিরঝিরে বৃষ্টির মাঝে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল বুড়ী, ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল। ট্রেণে চড়ে যখন ওরা শ্রীনাথপুর থেকে অনেক দূরে চলে গেল তখনো কিন্তু ছবিটা তারা ভুলতে পারছিল না। কিছুতেই না।

বেঞ্চির নীচে শুয়ে শুয়ে বীরু মনে মনে বলল, "আসব, পূজোর সময় আসবই বুড়ীমা—দেখে নিও"—

প্রায় বেলা তিনটের সময় ওরা পঞ্চাননপুরে পৌছোল। সবে বেলা তিনটে, অথচ কার সাধ্য বোঝে তা, মেঘ্‌লা দিনের ম্লান আলোতে সময়টাকে সন্ধ্যে বলেই মনে হচ্ছিল। সেই শ্রীনাথপুরে যে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল, ট্রেণে আসতে আসতে এই দুশো মাইলের মধ্যেও তাকে থামতে দেখা যায়নি। সকালের দিকে যে বৃষ্টি একটু কম ছিল তা যেন নূতন উদ্যমের সঙ্গে, আবার নবোৎসাহে সজোরে পড়ছিল।

পঞ্চাননপুর।

এদিক ওদিক চোরের মত তাকাতে তাকাতে নামল দুজনে। তীরে এসে যেন তরী না ডোবে বাবা, তারা যেন আবার টীকিট-চেকারের খপ্পরে না পড়ে।

রাস্তায় পড়ে পল্টু বল্‌ল, "এসে গেছি"—

বীরু ঝাপ্‌সা চোখে তাকাল চারদিকে, হেসে বলল, "হ্যাঁ"—

"কিন্তু জোর বিষ্টি পড়ছে যে!"

বীরু ডোণ্ট্-কেয়ার ভাব দেখাল, "পড়ুকগে"—

তার আর তর সইছে না। বাড়ীর কাছাকাছি পৌছে, সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীতে হাজির হবার আকুলতা তাকে পেয়ে বসল। বৃষ্টি! কি যায় আসে, আজ তার ওপর প্রলয়ের জল এসে পড়লেও সে ভয় পাবে না।

পল্টু মাথা নাড়ল, "সত্যি তাই—চল্ তাড়াতাড়ি, বাড়ী গিয়ে জামা কাপড় বদ্‌লে ফেল্লেই সব ঠিক হয়ে যাবে"—

বীরু বলল, "ক্ষিদেও পেয়েছে—নারে?"

"হ্যাঁ, ভাগ্যিস্ বুড়ীমা চিড়ে গুড় দিয়েছিল, নইলে মরে যেতাম একেবারে"—

"হুঁ—ইয়ে—চল্ তাড়াতাড়ি।"

বাদ্‌লার দিন। রাস্তাঘাটে মাত্র এক আধটা লোকজনকে দেখা যায়। কুকুর বেড়ালেরাও আজ রাস্তায় নেই। হু হু করে জলো, ভিজে হাওয়া বইছে, জোরে বৃষ্টি পড়ছে, দূরের সব কিছুকে কুয়াশাবৃত ও ঝাপ্‌সা মনে হচ্ছে। হঠাৎ কেমন যেন নতুন মনে হয় সব কিছুকে। নিঃশব্দে, জলকাদার ভেতর দিয়ে তারা এগিয়ে চলল।

রাস্তার বাঁ দিক থেকে একজন লোক এল, ছেঁড়া ছাতা মাথায় দিয়ে।

"কুন্‌ঠে যাছ গো তুম্‌রা ?" সে ওদের প্রশ্ন করল।

পল্টু জবাব দিল, "উই কাঞ্চনপুরে"—

"ও—তা মাঝে যি জল হছে খুব"—

"তাই নাকি ?"

"হয়—তিনদিন ধরা যে পানি পইড়ছে। তা সাঝের আগেই পহুঁছাবা তুম্‌রা"—

লোকটা চলে গেল।

ওরা চলতে লাগল।

এবার গ্রাম পেরিয়ে ওরা ক্ষেতের মাঝখানে পড়ল। উঁচুনীচু ক্ষেত, কচি ধানে ভর্ত্তি। বৃষ্টিতে ভিজে নুয়ে পড়েছে সেই সব ধান, বিষণ্ণ একটা কোমলতায় ভারী নরম দেখাচ্ছে সেগুলোকে। ঘোলাটে, কাঁদুনে আকাশটা মাথার ওপর ঝুঁকে আছে, দিগন্তে এসে পৃথিবীর বুকে মাথা রেখে যেন একটু সান্ত্বনা পেতে চাইছে। জলো হাওয়ায় শীত শীত করে, বৃষ্টিতে ওদের জামা কাপড় ভিজে একসাই হয়ে যায়, কাদার ছিটে লেগে নোংরা হয়ে ওঠে তা। তবু ওরা এগিয়ে চলল। বাড়ী, বাড়ী পৌছুতে হবে।

ক্রোশ দেড়েক যাবার পর আধমাইলটাক ঢালু ক্ষেত—জলে থৈ থৈ

করছে তা। ধানের ডগাগুলো ইঞ্চিখানেক করে মাথা বের করে আছে শুধু, আর ভাসছে গুঁড়ি পানা।

পল্টু বলল, "খুব বৃষ্টি হয়েছে—আমরা যাবার দিন থেকেই হচ্ছে"—

"হুঁ—বানের মত জল"—

"হুঁ"—

"কাঞ্চনপুরেও কি এমনি জল হয়েছে?"

"কে জানে?"

"মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছে—নিশ্চয়ই"—বলল বীরু।

"হুঁ"—

"আর মহানন্দার জল যদি খুব বেড়ে থাকে, যদি কাঞ্চনপুর ডুবে গিয়ে থাকে!" নিজের মনেই বলল বীরু।

পল্টু হাসল, "ধ্যেৎ—তুই একটা কি রে! তিনদিনেই বুঝি সব একেবারে রসাতলে যাবে—দূর!"

জল ভেঙ্গে এগোতে লাগল তারা। হাঁটু জল, মাঝে মাঝে কোমর-জলও। কয়েকবার পা পিছ্‌লে জলে পড়ে গেল বীরু। পল্টু হাসতে লাগল। একটানা হাওয়ায় সঙ্গে একটানা বৃষ্টির শব্দ শোনা যায়। চারিদিকের বিস্তৃত ক্ষেতের মধ্যে কোথাও লোকজন দেখা যায় না। কেমন যেন ম্লান, বিষণ্ণ একটা কুয়াশাবৃত আলো। মনটা কেমন যেন করে, শরীরটা একটা অজ্ঞাত অনুভূতিতে শিউড়ে ওঠে। যেন তারা জলে-ডোবা তেপান্তরের মাঠ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চলতে লাগল তারা। বাড়ী, বাড়ী পৌঁছুতে হবে। আরো কিছুক্ষণ—আরো কিছুক্ষণ। হঠাৎ একসময়ে তারা সেই গড়টাকে দেখতে পেল—যেখানে একদিন গুপ্তধনের জন্য তারা হানা দিয়েছিল। কাঞ্চনপুর এসে গেছে।

বৃষ্টি থেমে গেছে।

এখান থেকে দু'জনের পথ দু'দিকে চলে গেছে।

পল্টু হেসে বলল, "এবার যা তবে"—

বীরুর হৃদ্‌পিণ্ডটা লাফাতে আরম্ভ করেছে, উত্তেজনায় কাঁপছে তার শরীর। মাথা নেড়ে সে বলল, "হ্যাঁ—যাই"—

পল্টু বলল, আমাদের কপালে কি আছে কে জানে ?"

"হুঁ"—

স্তব্ধতা।

বীরু প্রশ্ন করল, "যদি মারে—তাহলে ?"

পল্টু নির্লজ্জের মত হাসল, "মুখ বুজে সহ্য করবি তা, উপায় কি ? যা বৃষ্টিতে ভিজলাম তারপর শরীর সারতে বেশ কয়েকদিন লাগবে। করবি আবার কি ? খুব মিঠি সুরে কথা বলবি।—আচ্ছা, আমি যাই"—

"যা"—

পল্টু চলে গেল। ধীরে ধীরে, সংশয়াকুল মুখে।

বীরু এগোল। সেই চির-পরিচিত কাঞ্চনপুর, তবু যেন আবার নতুন করে পরিচয় হচ্ছে। কলকাতা! না, তা মারাত্মক কিছু নয়, কাঞ্চন-পুরের চেয়ে অনেক, অনেকগুণ ঐশ্বর্য্যশালী, সুসজ্জিত—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু কাঞ্চনপুরের চেয়ে কলকাতা বড় নয় মোটেই। এই বাঁশঝোপ, নিমজাম আম গাছের ভীড়, মাটির গন্ধ, অবারিত বিরাট আকাশ, সুরভিত বাতাস আর স্বপ্নে ভরা রাত তো কলকাতাতে নেই, নেই সেখানে মা, বাবা আর দিদি। না, কলকাতা রোমাঞ্চকর, মজার জায়গা—এটা ঠিক, কিন্তু তাই বলে তার কাঞ্চনপুরের চেয়ে বেশী মহৎ ও সুন্দর নয়। না, বাবা বকবেন! বয়ে গেছে। বড় বড় পা

ফেলে সে এগোল। এদিকে বৃষ্টি থেমে গেছে, হাওয়ার বেগ নিঃশেষিত, হাল্‌কা মেঘ এবার উড়ে চলছে, বিকেল-শেষের মৃদু ও রঙীন আলো এসে চক্‌চক্‌ করছে গাছের পাতায় পাতায়।

"ও কে যায়, এঁ্যা ?" কে একজন ভারী গলায় ডাকল।

বীরু যেন লাফ দিয়ে উঠল। সর্ব্বনাশ! ছাতা মাথায় সামনের দিক থেকে আসছেন স্বয়ং হেডমাষ্টার মশাই !

"বীরু !" তিনি কাছে এসে দাঁড়ালেন।

বীরু হাসবার চেষ্টা করে বলল, "আজ্ঞে নমস্কার"—

প্রশান্ত হাসিতে ভরে গেল হেড মাষ্টারমশায়ের মুখ, তিনি বললেন, "নমস্কার। তারপর, আজ ফিরলে ?"

বীরু মাথা নীচু করল, "আজ্ঞে হাঁ্যা"—

"কোথায় গিয়েছিলে ?"

"কলকাতা"—

"বটে !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"পল্টুও ছিল ?"

"হুঁ"—

"কেমন লাগল কলকাতা ?"

"ভালো—তবে—মানে, এখানকার মত না"—

সকৌতুকে হাসলেন হেডমাষ্টারমশাই, "বটে! বেশ, বেশ। তা এবার কি করবে ? এর পর ? ওঃ, বুঝলে না ?"

"না—স্যার"—

"মানে পড়াশোনা কি আর করবে, না এমনিভাবে পলায়ন-বিস্তার চর্চ্চা করবে ?"

স্তব্ধতা। ভয়, সংশয়, লজ্জা। না জানি বাবা কি করবেন!

"বল"—আদেশসূচক কণ্ঠ হেডমাষ্টার মশায়ের।

বীরু মাথা তুলতে পারল না, ধীরে ধীরে পরিষ্কার গলায় সে বলল, "না মাষ্টারমশাই, ইস্কুলে পড়ব"—

"হ্যাঁ?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ, তবে বাড়ী চল।"

"যাচ্ছি।"

"নাহে ছোকরা, আমার সঙ্গেই চল, নইলে হয়ত মারটার খাবে। ওকি! না না না, আমার ছাতার নীচে এসে মাথাটা গোঁজ"—

"আমি তো ভিজেই গেছি"—

"তাতেই বা কি—আরো ভেজার হাত থেকে তো বাঁচবে"—

চুপচাপ চলল বীরু। হেড মাষ্টারমশাইও চলেছেন। গম্ভীরমুখে। বীরু একটু কৃতজ্ঞতা বোধ করল। এই অদ্ভুত লোকটি তাকে মারলেন না, বাবার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন! বাঃ! না এঁকে খুশী করতেই হবে। কিন্তু কিভাবে?

"মাষ্টারমশাই"—

"কি?"

"ইয়ে"—

"কি? বল"—

"না—ইয়ে"—

হেডমাষ্টারমশাই তাকালেন বীরুর দিকে, মৃদুকণ্ঠে বললেন, "কি বলতে চাও? এখন থেকে বুঝি খুব পড়বে? পড়াশোনা তো করোই—তাছাড়া আর কি করবে?"

বীরু মাথা নাড়ল। তাতে 'হ্যাঁ', 'না', দুই-ই বোঝায়। কিন্তু আসলে যা বোঝাতে চাইল সে তা আর বলতে পারল না।

হেডমাষ্টারমশাই আর কিছু বললেন না। তিনি বুঝলেন যে এখন আর বেশী কিছু বলার মত সময় নয় এটা।

চুপচাপ চলল দু'জনে।

বুকের ভেতরটা ধড়াস্ করে উঠল। সেই বাড়ী। তার চালের ওপর নধর লাউগাছ। সেই আমগাছ, কলাগাছ, করাত আর শিউলি গাছ। সব ঠিক আছে।

"এসো—ভয় পেয়ো না"—হেডমাষ্টারমশাই বললেন।

বীরু হেডমাষ্টারমশাইয়ের পেছনে রইল।

"পণ্ডিতমশাই—অ' বাঁড়ুয্যে মশাই"—

মালতী বেরিয়ে এল। হ্যাঁ, দিদিই বটে। বীরুর চোখে জল এল। বয়ে গেছে। বাবা মারলেও সে সয়ে যাবে। এদের ছেড়ে চিরকালের জন্য কি বাইরে থাকা যায়! দূর!

মালতী হঠাৎ দেখতে পেল।

"বীরু!"

"দিদি!"—

"ওমা—দাঁড়া দাঁড়া"—

সে ছুটে ভেতরে গেল, "মা, ওমা—শিগ্গীর এসো—বীরু"—

সুমতির গলা শোনা গেল, "বীরু! এঁ্যা!"

"হ্যাঁ—আর বাবা—হেডমাষ্টারমশাই নিয়ে এসেছেন বীরুকে"—

"কে? কি বললি? কি বললি মালতী?"—অনন্তের গম্ভীর গলা ভেসে এল।

বীরু কেঁপে উঠল সেই গলা শুনে। বহুদূরের মেঘগর্জ্জনের মত সে

গলা। ভয় লাগে। তবে সাহস এইখানে যে সামনে পাহাড়ের মত আছেন হেডমাষ্টারমশাই। আশ্চর্য্য লোকটি, কোত্থেকে একটা আশ্চর্য্য ঘটনার মত এসে পড়লেন! হেডমাষ্টারমশাই ও সে দাওয়ার ওপর উঠে দাঁড়াল।

খড়মের শব্দ শোনা গেল।

মা আর মালতী বেরিয়ে এলেন। এসেই ঘোম্‌টা টেনে দিলেন সুমতি, মৃদুকণ্ঠে বললেন, "বীরু!"

"মা"—

"তুই—কোথায়—এসেছিস্!"

নিঃশব্দে মায়ের দিকে এগিয়ে গেল বীরু। মা তাকে বুকের দিকে টেনে নিলেন

"কি দুষ্টু—উঃ"—বলল মালতী, "আচ্ছা বীরু, তোর কি একটুও দুঃখ হল না"—

হেডমাষ্টার মশাই মৃদুমন্দ হাসতে লাগলেন।

খড়মের শব্দ বাইরে এসে থামল।

"এই যে—শ্রীমান এসেছেন!" ব্যঙ্গের সুরে অথচ গম্ভীরভাবে বললেন অনন্ত। ছেলের দিকে তাকিয়ে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন তারপর যুক্তকরে হেডমাষ্টার মশাইকে বললেন, "নমস্কার—নমস্কার মাষ্টারমশাই"—

"নমস্কার। আপনার ছেলেকে দিতে এলাম পণ্ডিতমশাই"—

"হুঁ"—অনন্ত মাথা নাড়লেন

বীরু আড়নয়নে তাকাল বাপের দিকে। সুমতি, মালতী তারি মত কথা হারিয়ে ফেলেছে। ওদিকে মেঘ উড়ে যাচ্ছে, রাঙা আলো আরো রাঙা হয়ে উঠেছে। উঠোনে জল জমেছে, দাওয়ার নীচে

দুর্ব্বোঘাস ঘন হয়ে উঠেছে, পিচ্ছিল পৈঠা'র পাশে শ্যাওলা জমেছে।

অনন্ত ছেলের দিকে এগোলেন। সুমতি বীরুকে সশঙ্কচিত্তে চেপে ধরল।

"বীরু"—অনন্ত ডাকলেন।

হেডমাষ্টারমশাই মৃদুহাস্যে বললেন, "আমার একটা অনুরোধ আছে পণ্ডিতমশাই"—

"বলুন"—

"বীরুকে আর মারবেন না।"

"কেন? কেন একথা বলছেন?"

"কারণ আছে। আমার সঙ্গে ওর ইতিমধ্যেই একটু চুক্তিমত হয়েছে—পাকা চুক্তি পরে হবে। সুতরাং সেই চুক্তিভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত ওকে ছেড়ে দিলে আমি খুশী হব"—

অনন্ত হেডমাষ্টারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, একটু ভেবে বললেন, "আপনাকে আমি খুশী করতে রাজী আছি মাষ্টারমশাই, কিন্তু আমারো একটা অনুরোধ আছে"—

"কি?"

"ওকে আমি নিজের হাতে আর শাস্তি দেব না—তবে ওকে নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ একটা জিনিষ করতেই হবে।"

"কি?"

"দেখুন তবে"—

অনন্ত ছেলের দিকে তাকালেন, ডাকলেন, "বীরু"—

"উঁ"—

"এদিকে এসো।—ভয় নেই, এসো"—

বীরু এসে দাঁড়াল কাছে।

অনন্ত বললেন, "বেশ, এবার মেপে মেপে চার হাত নাকে খৎ দাও—আর বল যে আপনাদের অবাধ্যতা আব কবব না"—

চুপ করে রইল বীরু।

মালতী ফিস্ ফিস্ করে বলল, "দেনা—দেনা ভাই"—

অনন্ত গলার সুর চড়ালেন, "কৈ, দাও নাকে খৎ"—

বীরু মাটিব দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, "এখানে জলকাদা আছে যে"—

"তা থাক্, তবু দাও"—

মেপে মেপে ঠিক চাবটি হাত নাকে খৎ দিল বীরু, বলল যে সে আর অবাধ্যতা করবে না।

হেডমাষ্টারমশাই সহাস্যে অনন্তকে বললেন, "বাঃ—চমৎকার পদ্ধতি তো—আমার স্কুলেও দেখছি আপনার এটিকে চালু করতে হবে।"

হেসে উঠলেন দুজনে।

বীরু বাপেব হাসি দেখে আশ্বস্ত হল, মাটি আব কাদা-মাখা নাক তুলে সেও মুচকি হাসল। আব তাব হাসি দেখে সুমতি হাসলেন, হাসল মালতী।

বাঃ! কোথায় যেন একটা পাখী কিচ্ মিচ্ করে উঠল।

মহানন্দার ধারে চুপ করে দাঁড়াল বীরু।

বিচিত্র এই জীবন। অপরূপ। যে কথাটা সে হেডমাষ্টারমশাইকে বলতে পারেনি তা সে এখন মনে মনে আওড়াল। কাঞ্চনপুর আর কলকাতা—তার দেখা পৃথিবীব সর্ব্বত্রই যে দারিদ্র্যকে দেখেছে তা সে দূর করার চেষ্টা করবে। আঃ—চমৎকার! পল্টুটা এখনো আসছে না কেন এদিকে? কি চমৎকার দেখাচ্ছে সব কিছুগ ফুলে-ফেঁপে

গাছপালা সব চকচক করছে। কলকাতার সেই দুঃসাহসী বীরদের মত সে-ও খালি হাতে খোলা বুক মেলে দাঁড়াবে কোনোদিন। রাঙা আলো কাঁপছে মহানন্দা'র জলের ওপর। নদীর জল বেড়েছে, পাড় ভাঙার শব্দ আসছে ঝপ ঝপ্ ঝপাং, তার প্রচণ্ড স্রোতের মুখে কচুরীপানার রাশি ভেসে যাচ্ছে— ভেসে যাচ্ছে জেলে ডিঙিগুলো।

কিন্তু তার আগে তৈরী হতে হবে। জ্ঞান-রাজ্যকে জয় করতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে, ভাবতে হবে। হাটের ঘাটে খান-কয়েক বড় বড় মহাজনী নৌকো দুলছে, দুলছে। কোথায় কে যেন গাইছে। মাথার ওপরে একটা রঙান পাখী—আনন্দে ডগমগ হৃদয়ের মত ডানা ঝাপ্টাচ্ছে। আঃ—চমৎকার!

নিঃশব্দতা। মৌন, গম্ভীর প্রশান্তি চারদিকে। মহানন্দা'র ওপারে, বনজঙ্গলের আড়ালে লাল সূর্য্যটা অস্ত যাচ্ছে— গাছপালার প্রাচীরান্তরালে একটা রক্তাক্ত আভা—যেন জঙ্গলে আগুন লেগেছে। অস্তগামী লাল সূর্য্যের টিপ-পরা ঐ দূর দিগন্ত থেকে যেন কারা ডাকছে, বীরুকে ডাকছে। সোজা হয়ে দাঁড়াল বীরু, তাকাল সেদিকে। তার চেহারাটা যেন হঠাৎ বদলে গেল। বারো বছরের ছেলেটাকে হঠাৎ যেন চব্বিশ বছরের জোয়ান বলে মনে হল। ঠোঁট দুটো তার থরথর করে কেঁপে উঠল, যেন সে বলল, 'শুনেছি সে ডাক—আমি আছি'—